

বিজ্ঞান চেতনা





বিজ্ঞান চেতনা ২

সম্পাদক
কুঞ্জবিহারী পাল

গাছপালার কথা

স্নেহাংশু সেন

●

জীববজন্তর কথা

বিশ্বনাথ মিত্র

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৭২
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
গণেশ বসু

ছেপেছেন
পিয়ারীরঞ্জন সাহু
দেশবাণী মুদ্রণিকা
১৪সি, ডি. এল. রায় স্ট্রীট
কলকাতা-৬

৪'০০

2271

সৃষ্টির সেই আদিম যুগের অবস্থাটা ভাবলে আজও অবাক হতে হয়। তখন মানুষ ছিল, যাকে বলে একেবারেই অসহায়, সহায়সম্বলহীন। তার দেহে না ছিল কোন আচ্ছাদন, ক্ষুধা মেটাবার জন্যে হাতের কাছে না ছিল কোন খাদ্য, আর নিজেকে রক্ষার জন্যে না ছিল একটু নিরাপদ আশ্রয়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মানুষ যতই অসহায় হোক না কেন, প্রকৃতির ভয়াল ভীষণ ভ্রূকুটিতে সে ভয় পায় নি। প্রকৃতির সেই বুক-কাঁপানো অবস্থার মধ্যেও মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে চেষ্টা করেছে আপ্রাণ। প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে হার স্বীকার করেনি সে।

প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষের এই যে জয়, এ সম্ভব হয়েছিল মানুষের ধারালো বুদ্ধি, অন্তরের জ্ঞান আর আশ্চর্য সৃজন-প্রতিভার জন্যেই।

সুতরাং প্রকৃতি-মানুষের সংগ্রামে মানুষের হাতেই আজ জয়-পতাকা। এই জয়-পতাকা বড় সহজে আসেনি। পদে পদে বাধা, ক্ষণে ক্ষণে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ তার বুদ্ধি বিবেচনা জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে, দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো দেবে।

এমনিভাবেই মানুষ নিজে জেনেছে প্রকৃতির রহস্যের কথা, সেই জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছে সকল মানুষের মধ্যে। বিজ্ঞানের নবজন্ম তো এইভাবেই সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানের জন্মলগ্নে প্রয়োজনের তাগিদ থাকলেও, মানুষ শুধু যে প্রয়োজনের দাস—এ কথা ভাবলে ভুল হবে। প্রয়োজনের সীমানা ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে সে এগিয়েছে অপ্রয়োজনের সীমাহীন উদার ক্ষেত্রে। জানার আনন্দে, জানার কৌতূহলে তার অভিযানের বিরাম নেই। তাই বিজ্ঞানের যাত্রা অশ্রান্ত, বিজ্ঞানীর সাধনা অতন্দ্র। নতুন নতুন আবিষ্কারে, নব-নব উদ্ভাবনে বিজ্ঞান-সাধকের দল আজও অনলস। আজও শ্রান্তিক্লান্তিহীন।

এবং সেই কারণেই জলে-স্থলে-নভোদেশে বিজ্ঞান আজ এঁকে দিয়েছে তার পদ-চিহ্ন। দূরকে সে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে দৃশ্যমান। মানুষ আজ আর তাই অসহায় নয়, ভীত নয়। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভার দীপ্তিমান উদাহরণ। এক কথায়, মানুষ এগিয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে, সৃষ্টি থেকে নতুন সৃষ্টিতে।

এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান তাই এ যুগে অপরিহার্য। স্কুলে বিজ্ঞান অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হিসেবে আজ স্বীকৃত।

আজ ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনের পদে পদে বিজ্ঞানের এত বেশি প্রয়োগ রয়েছে যে, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকার দরুন নিজেকে বড়ই অসহায় মনে হয়। যাঁরা বয়স্ক অথচ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না তাদেরও যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানা চলবে না এমন কোন কথা নেই। বরং আমরা মনে করি, বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলক জ্ঞান একান্তই আবশ্যিক ও সর্বজনীন হওয়া দরকার।

এ সব উদ্দেশ্য নিয়েই 'বিজ্ঞান চেতনা'র প্রকাশ। 'বিজ্ঞান চেতনা'র ভাষা যতটা সম্ভব সহজ এবং সরল করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ একেই তো বিজ্ঞানের তথ্যগুলো কঠিন বলে সাধারণের ধারণা, তার উপরে যদি ভাষা হয় কঠিন এবং আলঙ্কারিক তবে এ বিষয়ে আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণের সম্ভাবনাই বেশি। অনেক জায়গায় বোঝবার সুবিধের জন্যে ছবির প্রয়োজন হয়েছে; সে ব্যাপারেও কোন কার্পণ্য করা হয় নি।

পরিভাষা সম্বন্ধে এইটুকু আমাদের বক্তব্য যে, পুস্তকগুলিতে যেমন কষ্টকল্পিত বাংলা পরিভাষার উপর জোর দেওয়া হয়নি, তেমনি যে-সব বৈজ্ঞানিক শব্দের সহজ সুন্দর এবং সর্বজনস্বীকৃত বাংলা পরিভাষা চালু আছে তাও কোনক্রমে এড়িয়ে যাওয়া হয় নি।

এ পুস্তকগুলি সম্পাদনা করতে গিয়ে বহু সুযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। বিভিন্ন খণ্ডগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। তাছাড়া লেখক হিসেবেও এঁদের পাঠক মহলে বিশেষ সুনাম আছে। এদের পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে এ পুস্তকগুলির প্রকাশই সম্ভব হত না। এঁদের সকলকেই বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে 'বিজ্ঞান চেতনা'র বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে লাভবান হয়েছি। তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে উৎসাহী তরুণ সাহিত্যিক পলাশ মিত্রের নাম উল্লেখ করছি।

পরিশেষে এই বলে শেষ করি যে, 'বিজ্ঞান চেতনা' গল্পের বইয়ের মতই পাঠককে আকর্ষণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সিরিজ পাঠে যদি পাঠকের বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় ও বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ জাগে তবেই এ আয়োজন সার্থক।

'বিজ্ঞান চেতনা'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশে 'গাছপালার কথা' এবং দ্বিতীয় অংশে 'জীবজন্তুর কথা' স্থান পেয়েছে। 'গাছপালার কথা' অংশটি লিখেছেন অধ্যাপক স্নেহাংশু সেন, এম. এ এবং 'জীবজন্তুর কথা' অংশটি রচনা করেছেন অধ্যাপক ডাঃ বিশ্বনাথ মিত্র, এম. এস-সি ; ডি. ফিল।

চেতনাহীন জড় পৃথিবীর বুকে এক সময় হল প্রাণের আবির্ভাব—প্রথমে উদ্ভিদ, তারপরে প্রাণী। শ্যামল শোভায় ভরে উঠল ধরণীর বুক, এল নানা জাতের প্রাণী। সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের বিরাটকায় প্রাণীদের পদভরে কেঁপে উঠল মাটি, প্রলয়-হুঙ্কারে ভরে গেল পৃথিবীর আকাশ বাতাস। কিন্তু তারা চিরস্থায়ী হল না। সেকালকার বিরাট ঘন অরণ্যানীর মত এ সবও একদিন মিলিয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে।

আমাদের চারদিকে কত প্রাণী, কত উদ্ভিদ! কত তাদের বৈচিত্র্য! তাছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখতে আলাদা হলেও বহু বিষয়েই এদের মধ্যে রয়েছে নৈকট্য। এত সব প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনেতিহাস জানতে কার না বাসনা জাগে! বিজ্ঞান চেতনার বর্তমান খণ্ডে আমরা সে গল্পই বলতে চাই।

উদ্ভিদ ও প্রাণী—এক কথায়, জীবজগৎ কেন দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেল তার অন্য একটি কারণও আছে। জীবজগতের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় যে, দুইয়ের মিলনেই সব কিছুর সৃষ্টি। এককভাবে জীবের প্রকাশ ঘটে না। তাই 'দুই' সংখ্যাটি উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরাও তাই দ্বিতীয় খণ্ডে জীবজগতের দুই প্রধান সরিকের আলোচনা করেছি। তৃতীয় খণ্ডে আমরা 'পদার্থ-বিজ্ঞানের কথা' এবং 'রসায়নের কথা' নিয়ে আলোচনা করব।

মহালয়া ১৩৭২
কলকাতা

কুঞ্জবিহারী পাল

এই সিরিজে

প্রথম খণ্ড: আকাশের কথা
পৃথিবীর কথা

দ্বিতীয় খণ্ড: গাছপালার কথা
জীবজন্তুর কথা

তৃতীয় খণ্ড: পদার্থ-বিজ্ঞানের কথা
রসায়নের কথা

চতুর্থ খণ্ড: শিল্প ও বিজ্ঞান

পঞ্চম খণ্ড: মানবদেহের কথা
রোগজয়ের কথা

ষষ্ঠ খণ্ড: মানুষের কথা
মানব-সভ্যতার কথা

সূচীপত্র

গাছপালার কথা

জীবজন্তুর কথা

বিজ্ঞান চেতনা ২

গাছপালার কথা

স্নেহাংশু সেন

১

আমার ঘরের ছোট্ট জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে চোখে পড়ে একটি সবুজ রঙের সতেজ লতা আলোর তপস্থায় রত। দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিলে চোখে পড়ে সবুজ ঘাসে ছাওয়া নরম মাঠে গরু চরে বেড়াচ্ছে, আর নধর ঘাস থেকে তাদের আহার্য সংগ্রহ করছে। আরও দূরে, নদীর তীর ঘেঁষে কত বড়-বড় বৃক্ষরাজি সার সার দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় তাদের সবুজ পাতার সাজ। নদী পেরিয়ে, আরও দূরে, মাঠ আর আকাশ যেখানে এসে মিশেছে সেখানেও সবুজ রঙের ছোপ।

কাছে বা দূরে, যেদিকেই তাকাই না কেন, এই সবুজ রঙ আমাদের চোখে পড়বেই ; কোনক্রমেই এড়ানো যাবে না। এই যে সবুজ রঙ এটা উদ্ভিদের একান্ত নিজস্ব। এই রঙের জন্যেই উদ্ভিদ পৃথিবীতে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। সজীবতা আর নবীনতার প্রতীক এই সবুজ রঙের মূল্য প্রাণীজগতের প্রতিটি প্রাণীর কাছে অপরিসীম। উদ্ভিদের নিজের কাছেও এর মূল্য কোন অংশে কম নয় এতটুকু।

পাতায় সবুজ রঙ আছে বলেই উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ; এক কণা খাবারের জন্যেও তাকে তাকাতে হয় না অন্য কারুর মুখের দিকে।

গাছ কী করে খাবার তৈরি করে

পাতার সবুজ কণিকার সাহায্যে সূর্যের আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে শেকড় দিয়ে টেনে আনা খনিজ দ্রব্য মেশানো জল আর পরিবেশ থেকে সংগৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড দিয়ে গাছ তৈরি করে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় খাবার। দৌড়োদৌড়ি

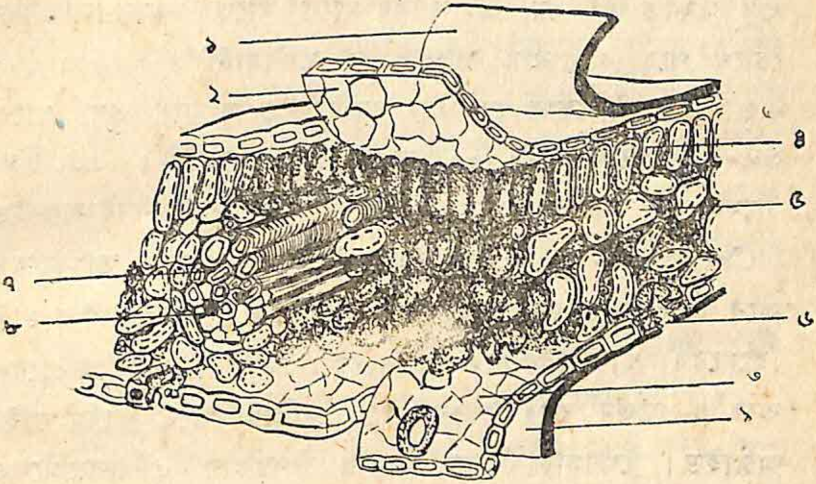
নেই, লাইনে দাঁড়ানো নেই, কী চমৎকার আত্মনির্ভরশীল এই উদ্ভিদ জগৎ!

মানুষ তার জ্ঞান আর বুদ্ধি দিয়ে আজও জল আর কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশিয়ে এককণা শর্করা তৈরি করতে পারে নি। যেদিন জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষ উদ্ভিদের এই আশ্চর্যজনক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করতে পারবে সেদিন সূচিত হবে আমাদের কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিজয়।

একটা গাছের মোটামুটি ধারণা তোমাদের নিশ্চয় আছে। গাছের শেকড় চলে গেছে মাটির নিচে, আর তার ডাল পালা পাতা মেলে দাঁড়িয়ে আছে মাটির উপরে। পাতা যে গাছে যেমন; কোন গাছের পাতা ছোট, কোন গাছের বা বড়। রঙ ফিকে কিম্বা গাঢ় যাই হোক না কেন, মূল রঙটা একই—সব সবুজ। গাছপালার পাতার রঙ সবুজ হয়েছে পাতার মধ্যে অসংখ্য রঙিন কণিকা অর্থাৎ পত্র-হরিৎ আছে বলে। ইংরেজিতে এদের বলে ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিল যদিও পাতাতেই সবচাইতে বেশি থাকে তাহলেও গাছের অন্যান্য অংশে যেখানকার রঙ সবুজ সেখানেও এদের দেখা পাওয়া যায়। পাতার মতই একই রকম কাজ এদের, মানে খাবার তৈরির কাজ আর কি।

পাতার বাইরের চেহারা তোমাদের চেনা। কিন্তু ভিতরের চেহারার আন্দাজ না পেলেও তো চলবে না। একটা কারখানা ঘুরে ঘুরে না দেখলে কী করে আন্দাজ হবে কোথায় কি আছে, আর কোথায় কি তৈরি হচ্ছে? পাতাও তেমনি এক কারখানা। একটা পাতার একটা অংশ খুব পাতলা করে কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে আমরা একেবারে উপরের দিকে দেখব একসারি ইটের মত কোষ, পাতার ভিতরকার জলের অপচয় বন্ধ করা যাদের কাজ। এটা হল পাতার উপরকার এপিডারমিস (Epidermis) বা ছাল। চকচকে পাতায় এপিডারমিসের উপর একটা স্বচ্ছ স্তরও

থাকে, যার নাম কিউটিক্‌ল্ (Cuticle)। এর ঠিক তলায় কতগুলো লম্বা সরু মত কোষ, বেশ ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট। এর নাম প্যালিসেড লেয়ার (Palisade layer)। এই অংশেই দেখতে পাওয়া যায় অজস্র ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast), যার ভিতরে রয়েছে পাতার



১। কিউটিক্‌ল্, ২। উপরের এপিডারমিস, ৩। নিচের এপিডারমিস, ৪। প্যালিসেড লেয়ার, ৫। স্পঞ্জি লেয়ার, ৬। স্টোমাটা, ৭। জাইলেম, ৮। ফ্লোয়েম

সবুজ রঙের জন্যে দায়ী সবুজ রঙের কণিকা, যাকে বলা হয়েছে পত্র-হরিৎ বা ক্লোরোফিল (Chlorophyll)। এরাই সেই অদ্ভুত বস্তু যার সাহায্যে গাছ নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করে। ক্লোরোফিল অতিরিক্ত মাত্রায় আলোক-সচেতন। গাছের খাদ্য প্রস্তুতের জন্যে আলোর প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। তাছাড়া আলোর সংসর্গে আসা ক্লোরোফিলের খুবই দরকার। তাই প্যালিসেড লেয়ারের কোষের চেহারাই ক্লোরোফিলের এই ধরনের আলোর প্রয়োজনীয়তা রক্ষা করে।

প্যালিসেড লেয়ারের নিচে ক-সারি গোল-গোল, অনির্দিষ্ট চেহারার কোষ থাকে আলগাভাবে সাজানো। এখানেও ক্লোরোফিল থাকে, তবে এগুলোর রঙ তুলনায় হালকা। এ অংশের

নামকরণ হয়েছে স্পঞ্জি লেয়ার (Spongy layer)। এই দু-ধরনের কোষেই খাদ্য-প্রস্তুতি ও পাতার অন্যান্য কাজ হয়ে থাকে।

একেবারে নিচে থাকে একসারি কোষ যা উপরকার ছালেরই মত—এটাকে বলে তলাকার এপিডারমিস (Lower epidermis)। শুধু তফাত এই যে, এই সারির মাঝে মাঝেই কতগুলো ছিদ্র চোখে পড়ে, যার নাম বায়ুপথ বা 'স্টোমাটা' (Stomata)। এগুলো এতই ছোট যে এক ঘন-ইঞ্চিতে সংখ্যায় এরা থাকে ৬০,০০০ থেকে ৪,৫০,০০০, অবশ্য পাতা অনুযায়ী। এই ছিদ্র-পথেই জল বাষ্পাকারে বের হয়ে আসে; কার্বন-ডাই-অক্সাইড (Carbon dioxide), যা দিয়ে তৈরি হয় শর্করা, তা প্রবেশ করে এবং অক্সিজেন বের হয়ে আসে খাদ্য তৈরির বাই-প্রডাক্ট হিসেবে। শ্বাসকার্যও চলে এই পথেই। এ সময় ছিদ্রপথে প্রবেশ করে অক্সিজেন আর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে কার্বন ডাই-অক্সাইড। স্টোমাটা অবশ্য পাতার উপরকার এপিডারমিসেও থাকে। তবে তলার এপিডারমিসে এদের সংখ্যা অনেক বেশি। জলজ উদ্ভিদের পাতায় কিন্তু সমস্ত স্টোমাটাই থাকে উপরের এপিডারমিসে আর লম্বালম্বি চেহারা যেসব পাতার তাদের দুদিকেই সমান সমান ভাবে স্টোমাটা থাকে সাজানো।

এই হল পাতার আভ্যন্তরীন চেহারা। পাতার সব-চাইতে প্রয়োজনীয় অংশ হল ক্লোরোফিল। পাতার অন্যান্য অংশের কাজ হল ক্লোরোফিলকে আলোর দিকে ধরে রাখা আর খাদ্য তৈরির প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্লোরোফিলে পৌঁছে দেওয়া।

সূর্যের আলোর সাহায্যে পাতার সবুজ কণা, ক্লোরোফিল, জলের আর কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে খাদ্য-প্রস্তুতির প্রণালী তাকে বলা হয় অঙ্গার আত্মকরণ বা সালোক সংশ্লেষ। ইংরেজিতে বলে Carbon assimilation বা Photo-synthesis.

কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল, এই তুটি উপাদানই প্রয়োজন হয় সালোক-সংশ্লেষের কাজে। গাছপালার শেকড় মাটি থেকে জল টেনে নেয়, তারপর কাণ্ড মারফত পাতায় এসে পৌঁছয় সে জল। স্টোমাটার ভিতর দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডও এসে পৌঁছয় পাতায়। জীবন্ত ক্লোরোপ্লাস্ট-এ এই তুই বস্তুর রাসায়নিক মিলন ঘটে ক্লোরোফিলের দ্বারা। এই মিলনের ফলে যে বস্তু তৈরি হয় তার সঙ্গে আগের তুই কাঁচা মালের কোন মিলই থাকে না। কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল ও ক্লোরোফিল এই তিন বস্তুর মিলনেই সালোক-সংশ্লেষ হবে না—অতিরিক্ত এর পরেও যা প্রয়োজন তা হল শক্তি। সে শক্তি জোগায় সূর্যের আলো। এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে আলোক-নির্ভর।

সালোক-সংশ্লেষের প্রথম উৎপন্ন বস্তু শর্করা—যা নাকি প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়কেই জীবন ধারণের মূল বস্তু সরবরাহ করে।

একটি রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে পাতায় পাতায় এত শীঘ্র আর এত প্রচুর পরিমাণে খাদ্য তৈরি হতে থাকে যার সবটা পাতারা গাছের অন্যত্র পৌঁছে দিতে পারে না। সে কারণে বেশিরভাগ পাতাই, হয় তক্ষুনি, কিম্বা শর্করা তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে পরিবর্তিত করে ফেলে শ্বেতসারে। দিনের শেষে পাতায় পাতায় প্রচুর শ্বেতসার জমে ওঠে।

আগেই বলেছি, আলো ছাড়া এ প্রক্রিয়া চলতেই পারে না। বিকেলের দিকে যখন আলো নিস্তেজ হয়ে আসে, সালোক-সংশ্লেষের কাজও তখন ক্রমশঃ কমে আসে। আর সন্ধ্যা যখন নামে তখন এ কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সারা রাত চলে গাছের অন্যান্য প্রান্তে তৈরি খাদ্যদ্রব্যের পরিবহনের কাজ। পাতার কোষে কোষে জমিয়ে রাখা শ্বেতসার আবার পরিবর্তিত হয় শর্করায়, তারপর তা মিশে যায় জলের সঙ্গে। শ্বেতসার জলে গোলে না বলেই এই ব্যবস্থা। জলে মেশানো শর্করা ক্রমে নেমে আসে পাতার বৃন্তে খাদ্য জোগাতে,

তারপর নামে শাখায়, কাণ্ডে এবং অবশেষে পৌঁছয় মূলে। এমনি-ভাবেই প্রতিটি কোষে কোষে খাদ্য ছড়িয়ে পড়ে। রাত্রি ভোর হয়; দিনের আলো ফুটে ওঠে। পাতারা তখন আবার খাদ্য তৈরির জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করে। এমনি ধরনের ব্যস্ততা চলেছে প্রত্যহ প্রতিটি সবুজ গাছে, প্রতিটি পাতায়, পাতার প্রতিটি কোষে। ভেবে দেখ তো, গাছ আমাদের তুলনায় কত পরিশ্রম করছে! প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে তাদের কী ব্যস্ততায়, কিন্তু নেই কোন চেঁচামেচি, নেই কোন হুড়োহুড়ি!

সালোক-সংশ্লেষে আমরা দু-ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। একটা হল, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল মিশে এক নতুন বস্তুর—শর্করার—সৃষ্টি; এটা রাসায়নিক পরিবর্তন। অন্য পরিবর্তন হল শক্তির পরিবর্তন। আলোকরশ্মির উজ্জ্বলতা, জীবন ধারণের পক্ষে যা অপ্রয়োজনীয়, তা পরিবর্তিত হল রাসায়নিক শক্তিতে। এ শক্তি অবরুদ্ধ হয়ে থাকল উৎপন্ন বস্তুতে এবং পরে প্রয়োজন-মত এই শক্তিই উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহে শক্তি জোগাবে।

প্রতিটি জীবন্ত বস্তুর, কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী, শক্তির মূল উৎস হল সালোক-সংশ্লেষ। প্রথম উৎপন্ন দ্রব্য শর্করা জীবন ধারণের একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ঐ মূল বস্তু থেকেই পরে তৈরি হয় শ্বেতসার, স্নেহজাতীয় পদার্থ, প্রোটিন ও ভিটামিন। সবুজ গাছপালারাই জীব ও উদ্ভিদ জগতের শক্তির উৎস ধরে রাখে তাদের কোষে কোষে। দীর্ঘ দিন ধরে তাপ আর আলোর জন্যে আমরা কাঠে আগুন ধরিয়ে আসছি। এ শক্তি লুকিয়ে রেখেছিল পুরোনো সব গাছেরা। আধুনিক সভ্যতার মূলই হল শক্তি। সে শক্তি জোগাচ্ছে মাটির নিচে আবদ্ধ কয়লা আর তেল। কত হাজার হাজার বছর আগের সূর্যকিরণ ধরা রয়েছে এদের অণুতে অণুতে এবং আজও আমাদের সভ্যতার বিকাশে অফুরন্ত শক্তির জোগান দিয়ে যাচ্ছে। এ সবই কিন্তু সবুজ পাতার দান।

ক্ষুদে ক্ষুদে সবুজ পাতারাও যে এক-একটা কারখানা এ আন্দাজ নিশ্চয়ই তোমাদের হয়েছে। কারখানা তৈরি হয় একটা মস্ত জায়গা নিয়ে, কিন্তু তার আসল কলঘর থাকে নির্দিষ্ট একটা জায়গায়। পাতা একটা কারখানা, আর তার কলঘর হল প্যালিসেড ও স্পঞ্জি লেয়ার। যন্ত্রপাতি ছাড়া কোন কারখানাই ভাবা যায় না, পাতার কারখানার যন্ত্রপাতি হল ক্লোরোপ্লাস্টের ক্লোরোফিলগুলো (Chlorophyll)। সাধারণভাবে, আমরা জানি কারখানা চলে বিজলির শক্তিতে। এক্ষেত্রে শক্তি সরবরাহ করে সূর্যের আলো। সবই হল, কিন্তু কাঁচা মাল না হলে কারখানার কল চালু হবে কী করে? পাতার কারখানার কাঁচা মাল এল বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড আর মাটির নিজের জল থেকে। সরবরাহ করবার ভার মূলরোম (Root hair) আর স্টোমাটা নিল প্রায় সবটাই। কারখানা থেকে তৈরি হয়ে বের হল যে উৎপন্ন-দ্রব্য তার নাম শর্করা। সব কারখানারই কাজের একটা সময় আছে; পাতার কারখানাতেও সে ধরনের নিয়মই চালু। প্রস্তুতকারীদের কার্যকাল দিনের আলো যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ, আর জোগানদার ও পরিবহনকারীদের জন্যে দিন ও রাত্রি সর্বক্ষণ। একটা অদ্ভুত কারখানাই বটে! নয় কি?

পাতার সবুজ শান্ত রঙে আমাদের চোখ জুড়োয়। সে পাতার কাজ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা টের পেলে তো? কিন্তু শুধুমাত্র এটুকুই তার সব কাজের ফিরিস্তি নয়। আরও দুটি দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। তবে, সে কাজদুটিতে সবুজ কণিকার কোন অংশ নেই।

গাছের শ্বাসগ্রহণ

বেঁচে থাকতে গেলে শ্বাসগ্রহণ (Respiration) করতেই হবে। উদ্ভিদও শ্বাসগ্রহণ করে এবং তা করে পাতার সাহায্যে। প্রতিটি

কোষেই হচ্ছে শ্বাসগ্রহণের কাজ। শ্বাসগ্রহণের সময় স্টোমাটা দিয়ে প্রবেশ করে অক্সিজেন। তারপর তা পাতায় অবস্থিত খাদ্য, বিশেষত শর্করার সঙ্গে মিশে যায় রাসায়নিক প্রক্রিয়া অক্সিডেশনের (Oxidation) সাহায্যে এবং শর্করাকে ভেঙে ফেলে সরল ও সাধারণ পদার্থ জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে। এমনিভাবে শর্করার মধ্যে যে সঞ্চিত শক্তি থাকে তা মুক্ত হয়ে যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প স্টোমাটার ছিদ্রপথে বাইরে চলে আসে। শ্বাস গ্রহণের কালে যে শক্তি মুক্ত হয় তারই জোরে কোষেরা তাদের অন্যান্য কাজ চালাবার বল সংগ্রহ করে।

খাদ্য প্রস্তুতের যে প্রক্রিয়া, শ্বাসগ্রহণ প্রক্রিয়া ঠিক তার উল্টো। সালোক-সংশ্লেষে উৎপন্ন শর্করার মধ্যেকার স্থৈতিক শক্তি (Potential energy), গতিশক্তি (Kinetic energy) রূপে নির্গত হয়। সালোক-সংশ্লেষে গাছ খাদ্য তৈরি করে নিজের ওজন বাড়ায় ও স্থৈতিক শক্তি সঞ্চয় করে। আর শ্বাসকার্যের ফলে তৈরি খাদ্য ভেঙে এবং খরচা হয়ে গিয়ে গাছ তার ওজন কমিয়ে ফেলে এবং গতিশক্তির দ্বারা নিজেদের অন্য কাজ চালাবার শক্তি সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ আর প্রাণীর শ্বাসগ্রহণ কাজটা মূলত একই। উভয়েই এ ক্রিয়ায় ভিতরের ও বাইরের বাষ্প আদান প্রদান করে, দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা ধরেই।

গাছের প্রস্বেদন

অন্য আর একটি কাজ যা পাতা করে তাকে বলে প্রস্বেদন বা ট্র্যান্সপিরেশন (Transpiration)। দেহবৃদ্ধির কালে গাছপালারা অনবরত শেকড়ের সাহায্যে জল টেনে কাণ্ড মারফত তা পৌঁছে দেয় পাতায়। খনিজ পদার্থ মেশানো এই জল গাছেরা কেমন করে কাজে লাগায় তা আমরা দেখেছি। তাছাড়া আরও কিছু

পরিমাণ জল ব্যবহৃত হয় কোষগুলোকে স্ফীত রাখার জন্যে। এসব কাজ করার পরেও দেখা যায়, অনেক বেশি জল গাছেরা জমা করে ফেলেছে। সে বাড়তি জল প্রধানত পাতার ছিদ্রপথে (Stomata) বাইরের বায়ুমণ্ডলে চলে আসে বাষ্পাকারে। এই যে অপ্রয়োজনীয় জল নিষ্কাষণের উপায়, এরই নাম প্রস্বেদন।

বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। খেলে বেড়িয়ে কিছুকাল বেশ কাটল। আগামী সপ্তাহে একটা পিক্‌নিকের ব্যবস্থা হওয়াতে মনটা বেশ খুশি-খুশিই ছিল মণ্টুর। কিন্তু ঝামেলা একটা হয়েছে, বাজার করার কিছু ভার পড়েছে যে তার উপর। কসবায় নাকি মাংস শস্তা, দৌড়োও কসবায়। তরিতরকারি শস্তা শেয়ালদায়, সেখানেও নাকি সে-ই দৌড়োবে। কিন্তু উপায়ই বা কী? খাদ্য সংগ্রহ না হলে খাবে কী ওরা? খাবার আনন্দ বজায় রাখতে তাই ছুটতেই হচ্ছে সেসব সংগ্রহের জন্যে।

গাছেদের বেলায় কিন্তু এই ছোটাছুটিটা একদম পোয়াতে হয় না। কিন্তু তাই বলে যে কাজ তারা করে সেটাও যে খুব সহজ তাও অবশ্য নয়।

আমরা জেনেছি জলে মেশানো অজৈব খাদ্যসামগ্রী গাছের শেকড় সংগ্রহ করে মাটি থেকে, আর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে সংগ্রহ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, আর সূর্যের আলোর শক্তিতে তা খাদ্যে পরিণত করে পাতার সবুজ কণিকা।

নেপথ্যকর্মী শেকড়

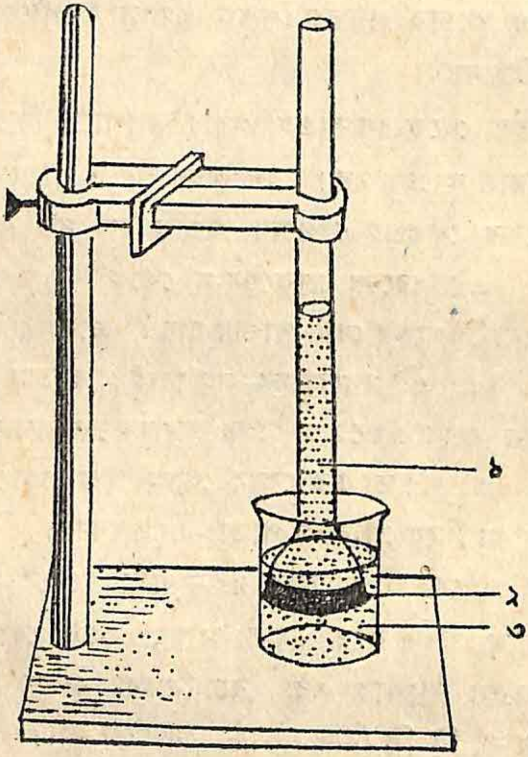
একদিকের কাঁচা মালের জোগানদার হল শেকড়। শেকড় আমাদের দৃষ্টির বাইরে অনেকটা নেপথ্যকর্মীর মত কাজ করে যায় দিনে এবং রাতে। দিনের আলোয় পাতায় পাতায় যেমন অদ্ভুত চাঞ্চল্য, ঠিক তেমনি কর্মচাঞ্চল্য দেখা যায় মাটির নিচের শেকড়ে। দিনের আলোয় আর রাতের অন্ধকার, সব সময়েই। আসলে মাটির উপরের চাঞ্চল্য, যেটা গাছপালারা দেখায়, তা অনেকখানি নির্ভর করে মাটির নিচেকার তৎপরতার উপরে। মাটির নিচের তৎপরতা

মানেই শেকড়ের তৎপরতা। শেকড়ের কাজটা মন্টুর বাজার করতে যাবার সঙ্গেই অনায়াসে তুলনা করা চলে। অবশ্য মন্টুও যেমন শুধুই বাজার করে না, পড়াশুনোও করে, তেমনি শেকড়ও শুধু খাদ্য সংগ্রহই করে না, গাছকে ধরে রাখে মাটির উপরে, খাবার জমিয়ে রাখে ভবিষ্যতের জন্যে, এমনি আরও কত কি। তবে অনেক কাজের মধ্যে কাঁচা খাদ্য সংগ্রহ করাই শেকড়ের প্রধান কাজ। প্রয়োজনীয় খাদ্যের সন্ধানে শেকড় যে কত দূর দূরান্তরে শেকড়ের জাল বিস্তার করে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বড় বড় গাছ হলে এ পাড়ার গাছের শেকড় ওপাড়ায় পৌঁছে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

মাটির তলা থেকে রস সংগ্রহ করার ব্যাপারে কিন্তু বড় বড় শেকড় কিছুমাত্র কাজের নয়। রস গ্রহণ করতে পারে কেবলমাত্র সামনের দিকের শেকড়ই যেগুলো অত্যন্ত সরু সরু এবং তখনও বৃদ্ধির মুখে। এই ধরনের শেকড়ের গা থেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, চুলের মত সরু অসংখ্য শেকড়ের দেখা পাওয়া যায়। এদের বলে মূলরোম (Root hair)। এই মূলরোমের সাহায্যেই গাছ তার প্রাত্যহিক কাজ সমাধান করবার জন্যে অনবরত জলের সঙ্গে মেশানো খাবার সংগ্রহ করে। তারপর তা এক কোষ থেকে অন্য কোষে পাঠিয়ে দেয়। ক্রমে যা গিয়ে পৌঁছচ্ছে পাতার সবুজ কোষে।

শেকড়ের কোষের কী ক্ষমতার দরুন বাইরে থেকে মাটির রস শেকড়ের কোষে প্রবেশ করে এবার আমরা সেটা দেখব। এটি একটি বেশ জটিল ব্যাপার এবং বৈজ্ঞানিকরা এখনও স্থির করে বলতে পারেন না, কি কি বিভিন্ন কারণ এর জন্যে দায়ী। জল টেনে ভিতরে গ্রহণ করার একটা উপায় হল অভিস্রবণ (Osmosis)। একবার জল বাইরে থেকে মূলরোমের কোষে প্রবেশ করলে অভিস্রবণ পদ্ধতিতে কোষ থেকে কোষান্তরে জল চালান হতে থাকে।

সরু শেকড়ের মূলরোমের যে কোষ তার ভিতরকার সামগ্রীর উপস্থিতিতেই কোষের রস গাঢ় হয়ে থাকে। আর বাইরে যে রস মাটিতে মিশে আছে তা পাতলা। এই দু-ধরনের রসের মাঝখানে রয়েছে কোষ-প্রাচীর। কোষ-প্রাচীর যে উপাদানে তৈরি তার প্রকৃতি হচ্ছে আংশিক জল-গ্রহণ-ক্ষমতা সম্পন্ন। আমরা জানি, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী দু-ধরনের বিভিন্ন গাঢ়তার রসের মাঝখানে আংশিক-ভেদ্যতা-সম্পন্ন পর্দা (Semi-permeable membrane) দিয়ে ভাগ করা থাকলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না দুই রসের গাঢ়তায় সমতা



১। ফানেলের মধ্যে বেশি ঘন শর্করা বা লবণ-মিশ্রিত জল। ২। সেমি-পারমিয়েব্‌ল্ মেমব্রেন। ৩। বিকারের মধ্যে কম ঘন সাধারণ জল।

আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত গাঢ় রস তরল রসকে নিজের দিকে টানতে থাকবে। একটা শুকনো কিস্‌মিস্ পরিষ্কার জলে ফেলে রাখলে

দেখা যায়, কিছুক্ষণ পরে কিসমিস জল শুষে শুষে ফুলে উঠেছে। কারণটা একই। কিসমিসের ভিতরের গাঢ় রস বাইরের তরল রস অর্থাৎ জল টেনে ভিতরের রসের সঙ্গে সমতা আনার চেষ্টা করছে। একটা ছোট্ট, সহজ পরীক্ষা করে আমরা একই সিদ্ধান্তে আসতে পারি। একটা থিসিল ফানেলের চওড়া মুখের দিকে একটা মাছের পট্‌কা দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তারপর এক বিকার পরিষ্কার জলে সেই থিসিল ফানেলটি এমনভাবে দাঁড় করানো হয়েছে যাতে ফানেলের মুখটা বিকারের জলে ডুবে থাকে। খুব ঘন চিনির রস বা লবণের রস থিসিল ফানেলের মধ্যে ঢেলে দিয়ে তার মাপটা একবার দেখে নিলে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে থিসিল ফানেলের রসের মাপ আগের মাপের মাত্রা ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে। তার মানে আর কিছু নয়, বাইরের বিকারের জল পটকার আবরণ ভেদ করে থিসিল ফানেলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। অর্থাৎ পাশের ঘন জিনিসকে পাতলা করবার উদ্দেশ্যে পাতলা জিনিস ঘন জিনিসে এসে পৌঁছেছে। বিকারের জল পরীক্ষা করলে সামান্য মিষ্টি বা নোন্‌তা, যেমন জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে, তেমন স্বাদ দেবে। তার মানে, বিকারের পরিষ্কার সাদা জলে থিসিল ফানেলের ঘন রসও সামান্য এসে পৌঁছেছে। অবশ্য এটা আসে খুবই অল্প পরিমাণে, বরং জলই ঘন রসে প্রবেশ করে অনেক বেশি। মাছের পট্‌কার জল ভেদ করার ক্ষমতা যেমন, ঠিক তেমনি ক্ষমতাই কোষ-প্রাচীরের। শেকড়ের ভিতরের কোষে ও বাইরের মাটির জলেও ঠিক এই ধরনের ব্যাপারই ঘটছে। এ ব্যাপারটিরই বৈজ্ঞানিক নাম অস্‌মোসিস। এই যে অভিস্রবণ বা অস্‌মোসিস, এরই সাহায্যে প্রতিটি মূলরোমের কোষ টানছে মাটির রস, পাঠিয়ে দিচ্ছে তা ক্রমে শেকড় থেকে কাণ্ডে, ডালে ও পাতায়।

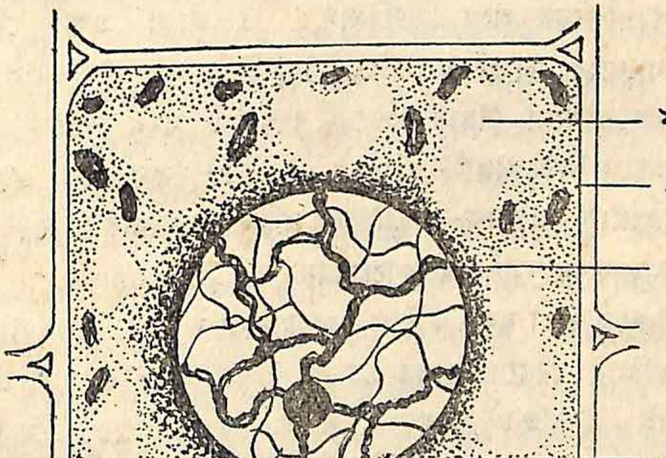
খালি চোখে দেখা যায় না এমনি সব ছোট মূলরোমের কী

ক্ষমতা! পাতা খাবার তৈরি করছে, কিন্তু কাঁচা মাল সংগ্রহের ব্যাপারে মূলরোমের কাজটাও কি কম বাহাদুরির! পাতার যেমন ভিতরকার চেহারাটা অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরি, শেকড়েও তাই; অসংখ্য কোষের সমাবেশ সেখানে। শেকড়ের ভিতরের সাজ-সজ্জাও আমরা দেখব, কিন্তু তার আগে দেখে নেওয়া দরকার বার-বার করে যে কোষের উল্লেখ করছি সেগুলোর চেহারা কী রকমের? কী দিয়েই বা তৈরি তারা?

কোষ কী দিয়ে তৈরি

তিনশো বছর আগে, ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক রবার্ট হুক প্রথম বিবরণ দেন কোষের। তিনি খুব পাতলা করে একটি কর্কের অংশ কেটে নেন। এত পাতলা যে এর ভিতর দিয়ে আলো দেখা যেতে পারে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রাখলে। তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন যে, কর্কের অংশটি কতগুলো ছোট ছোট ছেঁদার সমষ্টি। প্রত্যেকটি ছেঁদা ঘিরে রয়েছে এক একটি প্রাচীর। এই চেহারা দেখে তাঁর মনে পড়ল মৌমাছির চাকের কথা। তাই ছোট ছোট গর্তগুলোর নাম হল কোষ বা Cell। বৈজ্ঞানিক হুক অবশ্য সেদিন জানতে পারেন নি যে কোষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশটাই সেখানে অনুপস্থিত। কারণ এগুলোতে প্রাণ ছিল না, সবই ছিল মৃত। কোষের মধ্যেই যে জীবনের সামগ্রী থাকে তা আবিষ্কৃত হয়েছে আরও দীর্ঘ দিন পরে। একশো সত্তর বছর পরে, ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে যে ফরাসী জীবতত্ত্ববিদ কোষের মধ্যে জীবন্ত সত্তার আবিষ্কার করেন তাঁর নাম ডুজারদাঁ (Dujardin)। উদ্ভিদদেহ ও জীবদেহ যে অনেকগুলো কোষের দ্বারা তৈরি তা জানা যায় এরও তিন চার বছর পরে জার্মান উদ্ভিদবিদ শ্লাইডেন (Matthias Schlideen) ও জার্মান জীবতত্ত্ববিদ শোয়ানের (Theodore Schwann) গবেষণার ফল থেকে।

অসংখ্য ছোট ছোট জীবন্ত স্বাধীন কোষে উদ্ভিদের দেহ গঠিত। কোষগুলো এতই ছোট যে প্রায়ই খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ছোট হলেও প্রতিটি কোষই স্বয়ং-সম্পূর্ণ এক একটি পরিপূর্ণ জগৎ আর কি! এক একটি কোষ চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এর ভিতরে থাকে অর্ধ-স্বচ্ছ, বর্ণহীন, আঠাল জেলির মত এক পদার্থ, যার নাম প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm)। কতগুলো জৈব ও অজৈব রাসায়নিক দ্রব্যের সমষ্টি এই প্রোটোপ্লাজম। এই সজীব পদার্থের মধ্যে প্রাণ থাকে লুকিয়ে। প্রোটোপ্লাজমের মাঝখানে ঘন গোল চেহারার বা ডিমের মত চেহারার একটা জিনিস



১। কোষগহ্বর, ২। কোষ-প্রাচীর, ৩। নিউক্লিয়াস,
৪। সাইটোপ্লাজম, ৫। প্লাসটিড

থাকে। এর নাম নিউক্লিয়াস (Nucleus)। যে জলীয় আঠাল পদার্থ থাকে প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে তাকে বলে সাইটোপ্লাজম্

(Cytoplasm)। একটা কোষের প্রধান জিনিসই হল নিউক্লিয়াস। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে পাকানো দড়ি বা ধুলোর সারির মত একটা জিনিস দেখা যায়। এর নাম ক্রমোসোম (Chromosome)। ক্রোমোসোমের মধ্যে অপূর্ব সব বিস্ময় লুকিয়ে আছে। এরাই বংশপরম্পরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্তানসন্ততিদের মধ্যে চালান করে দেয়। এদের কথা পরে আবার বলা হবে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আর যা আছে তা হল এক বা একাধিক নিউক্লিওলাই (Nucleoli)।

প্রতিটি কোষে প্রোটোপ্লাজম থাকবেই, আর থাকবে প্রোটোপ্লাজমের অংশ নিউক্লিয়াস। এ ছাড়া একটি কোষে আর যা থাকে, তা হল প্ল্যাসটিড (Plastid)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন কণিকা এগুলো—কখনো বর্ণহীন, কখনো বর্ণযুক্ত। যখন বর্ণহীন তখন এদের বলে লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast)। কিন্তু মজা এই যে লিউকোপ্লাস্ট আলোক-সংসর্গে এলে রঙিন হয়ে যায়। বর্ণ যখন হয় সবুজ তখন তার নাম ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast)। এই রঙের জন্যে দায়ী সবুজ কণিকা ক্লোরোফিল (Chlorophyll) বা পত্র-হরিৎ। ক্লোরোফিলের যে কী অদ্ভুত ক্ষমতা তা তো আমরা আগেই শুনেছি। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে এরা প্রোটোপ্লাজমের অংশ বলেই জীবন্ত। প্লাসটিডের রঙ যখন হয় সবুজ ছাড়া আর কিছু, যেমন—লাল, হলদে বা কমলা, তখন তাদের বলা হয় ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast)। ফুলের পাপড়িতেই সাধারণত ক্রোমোপ্লাস্টের দেখা আমরা পাই।

কোষ যখন ছোট থাকে তখন সাইটোপ্লাজম সমস্ত কোষটাই জুড়ে থাকে। আর কোষ বড় হতে থাকলে কোষ-প্রাচীরও (Cell wall) বাড়তে থাকে সঙ্গে সঙ্গে। ফলে কোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজমের অভাব ঘটে আর জায়গায় জায়গায় কতগুলো গহ্বরের (Vacuole) সৃষ্টি হয়। ক্রমে সবগুলো গহ্বর মিলে

একটা বড় গহ্বরের সৃষ্টি হয়। তারপর তা কোষের রসে (Cell sap) পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই গহ্বরগুলোকে জল, খনিজ লবণ বা মজুত খাদ্যদ্রব্যের গুদামঘর হিসেবে ধরে নেওয়া চলে।

নতুন কোষ কিভাবে তৈরি হয়

আগেই বলেছি, এক একটি কোষ এক একটি পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। এমনি একটি কোষ থেকেই উদ্ভিদ তার জীবন শুরু করে। কোষ যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন একটি কোষ ভাগ হয়ে দাঁড়ায় দুটি কোষে, দুই থেকে চার, চার থেকে আট, আট থেকে ষোল। এমনিভাবে অগুনতি কোষের সৃষ্টি হয়ে একটি পূর্ণ উদ্ভিদ গড়ে ওঠে। একটা কোষ থেকে আর একটা নতুন কোষের জন্ম লাভ ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলজনক। একটি কোষ থেকে দুটি কোষ সৃষ্টির প্রয়াসে কোষের নিউক্লিয়াস অনেকগুলো জটিল প্রক্রিয়া অতিক্রম করে নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। যে প্রক্রিয়ায় এ কাজটি ঘটে তাকে বলে মিটোসিস (Mitosis)। আর যে প্রক্রিয়ায় কোষের সাইটোপ্লাজম' দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ও কোষ-প্রাচীর গড়ে ওঠে তাকে বলে সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis)। এভাবে দ্বিগুণ হয়ে প্রতিটি নতুন কোষ পূর্বেকার কোষের সমগ্র পদার্থ সমানভাবে ভাগ করে নেয়। এই ধরনের কোষ বিভাগের প্রণালী দেখা যায় উদ্ভিদের অঙ্গজ অংশের (Vegetative organ) বৃদ্ধিকালে। মিটোসিস ছাড়াও কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যান্য ধরনও আছে।

কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে নির্দিষ্ট একটি আকার নেয়। ক্রমে তারপর সে তার বিশেষ কাজটি সম্পন্ন করবার জন্যে প্রস্তুত হয়। নানান আকার আর প্রকারের কোষ নিয়ে পুরো উদ্ভিদের সৃষ্টি। এক ধরনের কোষ বেড়ে ওঠে একই ভাবে, একই ধরনের কাজ

করবার জন্যে। একে অন্যের সহযোগিতার জন্যে এরা হাতে হাত মেলায়। অনেকগুলো কোষ মিলে তখন 'কলা'র (Tissue) সৃষ্টি হয়। এ সময় এরা এককভাবে না থেকে দলবদ্ধ জীবনযাত্রা শুরু করে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাধারণ কোষগুলো একের উপরে আর একটা এসে জোড়া লেগে যায়। তারপর তাদের প্রাচীরের অংশবিশেষ খসে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে টানা নলের সৃষ্টি হয়। এদের বলা হয় নালিকা (Vessel).

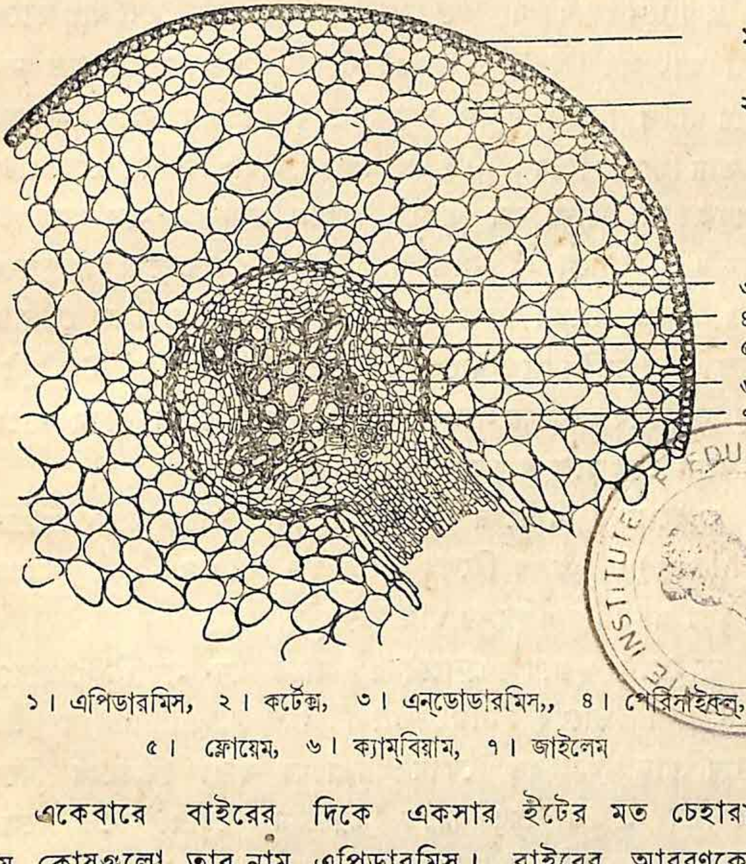
কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী কলা বা টিস্যুর আকার ও গঠনের তফাত ঘটে। কারুর কাজ উদ্ভিদকে রক্ষা করা, কারুর কাজ উদ্ভিদের দেহকে দৃঢ়তা দেওয়া, কারুর বা খাদ্য ও জল সঞ্চয় করা এবং খাদ্য বয়ে নিয়ে যাওয়া। এমনি ধরনের নানা কাজ সম্পন্ন করে এরা।

শেকড়ের ভিতরে কি আছে

এবার আমরা দেখব, শেকড়ের ভিতরটা কী রকমের কোষ দিয়ে তৈরি, আর কাকে কী কাজের ভার বইতে হচ্ছে। বাইরে থেকে শেকড় বহুবারই তো দেখেছ তোমরা। কিন্তু বাইরের দেখা আর ভিতরের দেখায় কতই না তফাত! শেকড় বাইরে থেকে দেখতে কতগুলো দড়ি বা সুতো ছাড়া আর কী? কিন্তু কারিকুরি যত কিছু সব ভেতরে। উদ্ভিদ-দেহে কারিকুরি অবশ্য সর্বত্র—ডালে পাতায় ফুলে ফলে বীজে সর্বাংশে।

ভিতরের অংশের পরিচয় নিতে গেলে আবার আমাদের সাহায্য নিতে হবে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের। আড়াআড়িভাবে খুব পাতলা করে কেটে নেওয়া একটা দ্বিবীজ পত্রী শেকড়ের অংশ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রাখলে আমরা দেখব, নানা আকার আর প্রকারের অসংখ্য কোষ মিলে কাজের সুবিধের জন্যে কলার সৃষ্টি করেছে। এক এক ধরনের কাজের ভার এক এক ধরনের কলা বহন করে,

এ কথা তো আগেই বলেছি। দ্বিবীজপত্রী গাছের কথা পরে বলব।



১। এপিডারমিস, ২। কর্টেক্স, ৩। এনডোডারমিস,, ৪। পেরিসাইক্‌ল্‌, ৫। ফ্লোয়েম, ৬। ক্যাম্‌বিয়াম, ৭। জাইলেম

একেবারে বাইরের দিকে একসার ইটের মত চেহারার যে কোষগুলো তার নাম এপিডারমিস। বাইরের আবরণকেই যে এপিডারমিস বলে এটা বোধহয় আন্দাজ করে ফেলেছ তোমরা। পাতার ক্ষেত্রেও দেখেছি বাইরের ছালকে এপিডারমিস বলে। এপিডারমিসের তলাতেই ফাঁক ফাঁক এবং গোল গোল বেশ কয়েক সারি কোষ দেখা যায়। শেকড়ের যাবতীয় খাদ্য এই অংশে জমা থাকে। এ অংশের নাম কর্টেক্স (Cortex)। কর্টেক্স-এর শেষে থাকে একথাক পুরু কোষ—নাম এন্‌ডোডারমিস (Endodermis)। আর তার নিচে থাকে পেরিসাইক্‌ল্‌ (Pericycle)। এতক্ষণে আমরা

শেকড়ের মধ্যাংশে এসে পৌঁছেছি। এ অংশটাই আসল কাজ করে—জল টেনে পাতায় পৌঁছে দেয় আর শেকড়কে দেয় দৃঢ়তা।

মধ্যাংশে যে বড় বড় শক্ত চেহারার কোষগুলো দেখা যায় তাকে বলে জাইলেম (Xylem)। এই পথেই অর্থাৎ জাইলেমের নল বেয়ে মাটির নিচের খনিজ পদার্থ মেশানো জল কাণ্ড মারফত পাতায় গিয়ে পৌঁছয়। এই কোষগুলো অর্থাৎ কলার চেহারাটা, অনেকগুলো ফাঁকা নল একত্রে রাখলে যেমন দেখায় অনেকটা তেমনি। আসলে এই নলগুলো ফাঁকাই। কোষগুলো কিছুকাল মাত্র জীবিত থাকে। কিন্তু মরে যাবার পরেও জল টেনে তোলার কাজ এই পথেই চলতে থাকে। জলের গতি এ পথে ঊর্ধ্বমুখী। বড় জাইলেম কোষের সঙ্গে আর যে ছোট ছোট কোষ থাকে সেগুলো শেকড়কে শক্ত হতে সাহায্য করে।

জাইলেমের বাইরের দিকে যে কলা, তাকে বলে ফ্লোয়েম (Phloem)। এদের বিশেষ কাজ হল পাতায় তৈরি খাবার নামিয়ে আনা। এ পথের গতি নিম্নমুখী।

জাইলেম আর ফ্লোয়েমের মাঝে যে লম্বাটে চেহারার কোষগুলো তাদের নাম ক্যামবিয়াম (Cambium)। এই ক্যামবিয়াম অনবরত কোষ বিভাগের দ্বারা ভিতরের দিকে জাইলেম ও বাইরের দিকে ফ্লোয়েম তৈরি করে চলে। গাজরের চেহারাটা তোমাদের খুবই চেনা। গাজরের বীজ যখন অঙ্কুরিত হয় তখন তার শেকড় অত মোটা থাকে না। কিন্তু পরে ক্যামবিয়ামে অনবরত কোষ সৃষ্টির ফলে তার চেহারা অমনি মোটাসোটা হয়ে দাঁড়ায়। খাবার সঞ্চয়ের জন্যেই অবশ্য অতটা মোটা হবার দরকার হয়।

একটা বড় গাছের পুরোনো শেকড়ে অনেকগুলো জাইলেম ও ফ্লোয়েমের স্তর দেখা যাবে। বছর বছর ওগুলো সৃষ্টি করে ক্যামবিয়াম। শেকড়ের বাইরের দিকেও একটা ছালের আবরণ

তৈরি হয়ে যায়। এ ধরনের পুরোনো শেকড়ের জল টানার ক্ষমতা যে থাকে না তা আগেই বলেছি। এরা কেবল জল বয়ে নিয়ে যাবার কাজ করে আর মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে।

কাণ্ডের কাজ

নেপথ্যকর্মী শেকড়ের অনেক খবরই সংগৃহীত হল। শেকড়কে আমরা বলতে পারি খনিজ পদার্থ ও জল সংগ্রহের কেন্দ্র। পাতার বিরাট কাণ্ডকারখানাও দেখেছি—যেখানে কাঁচা মাল থেকে খাবার প্রস্তুত হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। শেকড় আর পাতা, দুপ্রান্তের যোগাযোগ সাধন করছে কাণ্ড (Stem)। শুধু তাই নয়। প্রতিটি পাতা যাতে সূর্যকিরণের সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে তার জন্যে পাতাগুলোকে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সাজিয়ে রাখা, যে ফুল ফল ধরাবে তাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা—এও কাণ্ডের দায়িত্ব। এসব তার বাইরের দিকের কাজ। কাঁচা মাল জোগান দেওয়া ও তৈরি মাল প্রয়োজনীয় অংশে সরবরাহ করার কাজটাই তার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা সেগুলোর খোঁজই বেশি করে করব, আর সেইসঙ্গে দেখব গাছ দিনে দিনে কিভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কাণ্ডের ক্ষেত্রেও আমরা আরও একবার কাটাকুটির আশ্রয় নেব আর অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখে নেব তাদের ভিতরকার সাজসজ্জাটি কী রকমের। একটা বড় গাছের (দ্বিবীজ পত্রী) একটা কচি ডাল কাটলে তিনটি সুনির্দিষ্ট অংশ আমরা দেখতে পাব। একেবারে বাইরের অংশটির নাম ছাল (Bark)। এটা ভিতরকার কাঠের (Wood) অংশ থেকে ভিন্ন। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এখানে ছাল বলতে আমরা কেবলমাত্র গাছের কাণ্ডের বাইরের আবরণের কথাই বলছি না। এ ছাল আসলে আরও অনেক কিছু অংশের মিলিত সংজ্ঞা। একেবারে ঠিক মাঝখানের যে অংশ সেটা

হল পিথ (Pith)। বড় বড় গাছে কিন্তু পিথ সনাক্ত করা সম্ভব হয় না, কারণ পিথ খুব অল্প জায়গা দখল করে থাকে ; তাছাড়া কাঠের অংশের সঙ্গে পিথ থাকে মিশে । চতুর্থ আরও একটা অংশ, যেটার অবস্থান ছাল আর কাঠের মাঝখানে—তা হল ক্যামবিয়াম। পাতলা এবং কোমল কলা দিয়ে তৈরি এ জিনিসটি। শেকড়ের ক্ষেত্রে যেমন দেখেছ, ঠিক তেমনিভাবেই ক্যামবিয়ামের কোষ বিভাগের দ্বারাই কাণ্ডও আকারে বাড়তে থাকে। বসন্তকাল থেকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত ক্যামবিয়ামের তৎপরতা থাকে খুব বেশি। আর এই তৎপরতার দরুন ক্যামবিয়াম অসংখ্য নতুন কোষের সৃষ্টি করে। বাইরের দিকে, অর্থাৎ ছালের দিকে যেগুলো তৈরি হল সেগুলো ফ্লোয়েম, আর ভিতরের দিকে যেগুলো তৈরি হল সেগুলো জাইলেম বা কাঠ। কোন ঋতুতে ক্যামবিয়াম অনেক বেশি জাইলেম কোষ সৃষ্টি করে ফ্লোয়েম কোষের তুলনায়। সেজন্যেই একটা গাছে ছালের তুলনায় কাঠের পরিমাণ অনেক বেশি।

একটা কচি ডাল কিছুকাল ঢাকা থাকে এপিডারমিস-এর আবরণে। যাতে আঘাত না পায় বা অসুখ বিসুখের আক্রমণ এড়াতে পারে সেজন্যেই এ ব্যবস্থা। কিছুদিন পরে এপিডারমিসের স্থানাধিকার করে 'কর্ক'। সঙ্কীর্ণ অর্থে এটাই গাছের ছাল। এ তৈরি হয় কতগুলো মৃত কোষ থেকে। এসব কোষের ভিতরে থাকে বাইরের জল ভিতরে ঢুকতে না দেবার সামগ্রী। আমাদের ব্যবহৃত শিশি বোতলের কর্কও এই একই জিনিস, গাছের কর্ক থেকেই তা তৈরি।

ডাল যেমন আকৃতিতে বাড়তে থাকে তেমনি তার বাইরের কর্কে চাপ পড়তে থাকে বেশি, আর কর্ক সে চাপ সহ্য করতে না পারায় জায়গায় জায়গায় তা ফেটে যায়। এই ফাঁক মেরামত করার জন্যে থাকে এক ধরনের কোষ যাদের কাজ হল অনবরত নতুন কোষ সৃষ্টি করে এই ফাঁক বুজিয়ে রাখা।

ক্যামবিয়ামের মত নতুন কোষ উৎপাদন করতে পারে বলে এদের বলে কর্ক ক্যামবিয়াম (Cork Cambium)। কর্ক ও কর্ক ক্যামবিয়ামের নিচেই থাকে ছালের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কচি ডাল থেকে আস্তে আস্তে যদি ছালের পাতলা অংশ তুলে নেওয়া যায় তাহলে সবুজ রঙের একটা আস্তরণ চোখে পড়ে। এই অংশটার নাম 'কর্টেক্স' (Cortex)। সবুজ কণিকা থাকার দরুন খাদ্য তৈরির কাজে এরাও অংশ নেয়। পরে যখন কর্কের সৃষ্টি হয় তখন এই অংশের কাজ হয় খাদ্য মজুত করে রাখা।

কর্টেক্সের নিচের দিকে, ছালের একেবারে ভিতরের অংশের নাম হল ফ্লোয়েম। এ অংশের কাজ হল পাতায় তৈরি খাবার নিচের দিকে নামিয়ে আনা।

একটা কাণ্ডের বেশির ভাগ অংশই কাঠ বা জাইলেম যা বিভিন্ন রকমের কোষ দিয়ে তৈরি। যেসব দেশে প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তন অত্যন্ত স্পষ্ট, সেসব জায়গায় ক্যামবিয়ামের তৎপরতা সারা বছর একই রকম থাকে না। কখনো তা কমে কখনো বা বাড়ে। বসন্তকালে পাতায় পাতায় যখন কাজের তাড়া পড়ে যায়, তখন পাতায় কাঁচা মাল পৌঁছে দেবার প্রয়োজন অনেক বেশি হয়ে পড়ে। সেকারণেই ক্যামবিয়ামের কর্মক্ষমতাও বছরের এই সময়ই সব-চাইতে বেড়ে যায়। ক্যামবিয়াম তখন সৃষ্টি করে বড় বড় ছেঁদা-ওয়ালা নালিকা-রাশি। আর শীতকালে কাজের তাড়াহুড়ো যখন কমে আসে, তখন ক্যামবিয়াম সৃষ্টি করে সরু এবং ছোট নালিকা। বসন্তকালে যে কাঠ তৈরি হল তাকে বলে বসন্তকালীন কাঠ, আর শীতকালে যে কাঠ তৈরি হল তাকে বলে শীতকালীন কাঠ। এই দু-রকমের কাঠই একসঙ্গে পাশাপাশি থেকে এক বছরের তৈরি কাঠের পরিমাপ নির্দেশ করে। বার্ষিক রেখা (Annual ring) বলে এদের উল্লেখ করা হয়। একটা গাছের আয়ু কত হয়েছিল তার মোটামুটি হিসেব পাওয়া যায় কটি বার্ষিক রেখা

তার চিহ্ন রেখে গেছে গাছের দেহে গুনে। বলা বাহুল্য, গাছকে আড়াআড়িভাবে কাটলেই এই রেখা গোনা সম্ভব হবে।

যেকোন বুড়ো গাছের কাঠের অংশ পরীক্ষা করলে দু-ধরনের কাঠের নমুনা দেখা যাবে। মধ্যিখানে যে কাঠ তা বেশ শক্ত (Heart wood), রঙ কালো। নানারকম পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে এ অংশটা, যেমন—ধুলো, তেল, আঠা ইত্যাদি। শেকড় থেকে জল টেনে পাতায় পৌঁছনোর কাজ আর এ অংশের দ্বারা সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র গাছকে দৃঢ় করে ধরে রাখা ছাড়া গাছের আর কোন উপকারে আসে না এ অংশটা। আমাদের কাছে অবশ্য এ অংশের কদরই বেশি, কারণ এ অংশ থেকেই ভাল ভাল আসবাব তৈরি হয়। মধ্যাংশকে ঘিরে যে কাঠ তার রং হালকা। জল টেনে গাছকে বাঁচিয়ে রাখার কাজ চালায় এই দ্বিতীয় অংশ বা Sap wood।

মানুষের সমাজে দুটি শ্রেণী হামেশাই চোখে পড়ে। একদল বিত্তশালী আর একদল বিত্তহীন। গাছপালাদের মধ্যেও ঠিক তেমনি দুটি পৃথক শ্রেণীর দেখা পাওয়া যায়। সবুজ গাছপালা যেগুলো, তারা যে কী সৌভাগ্যবান তা তো দেখলাম। খাদ্যের ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন এরা। খাবার জন্যে এদের নির্ভর করতে হয় না মাতৃস্তন্যের উপর, কেঁদে ককিয়েও উঠতে হয় না ক্ষিদের যন্ত্রণায়। এসব সবুজ গাছপালারাই বিত্তশালী, এদের হাতেই আবার জগতকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব। চাবিকাঠি সব তাদের হাতে। যাকিছু খাদ্যশস্যে 'মনোপলি' ব্যবসাদার এরা। এই ধনী সবুজ গাছপালাদের উপর অ-সবুজ গাছপালাদের (যারা নিজেদের খাবার তৈরি করতে পারে না) নির্ভর করতে হয় অনবরত। এরা হল বিত্তহীন মানুষেরই মত পরমুখাপেক্ষী, পরাধীনও বলা চলে। আসলে, জীবজগতটাই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করছে সবুজ গাছপালাদের উপর।

পরভোজী গাছপালা

অ-সবুজ গাছপালাদের খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে তুলনামূলক উদাহরণ টানলে আমরা দেখা পাব বহু চোর ডাকাতের। অন্যের তৈরি খাবার চুরি করে খেয়ে বেঁচে থাকে যেসব উদ্ভিদ তাদের নাম পরভোজী (Parasite)। এরা পুরো জীবনটাই কাটিয়ে দেয় অন্য গাছ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে। এরা যে গাছের উপর খাদ্যের জন্যে নির্ভর করে সে গাছকে বলা হয় হোস্ট (Host)। ইংরেজি শব্দ হোস্টের মানে নিমন্ত্রণকারী হলে কী হবে, পরভোজীরা কিন্তু নিমন্ত্রণ পাঠানোর অপেক্ষায় দেরি করে না। সুবিধে পেলেই এসে গাছের সুবিধেজনক জায়গায় চেপে খাবারের ভাগে হাত বাড়ায় এরা।

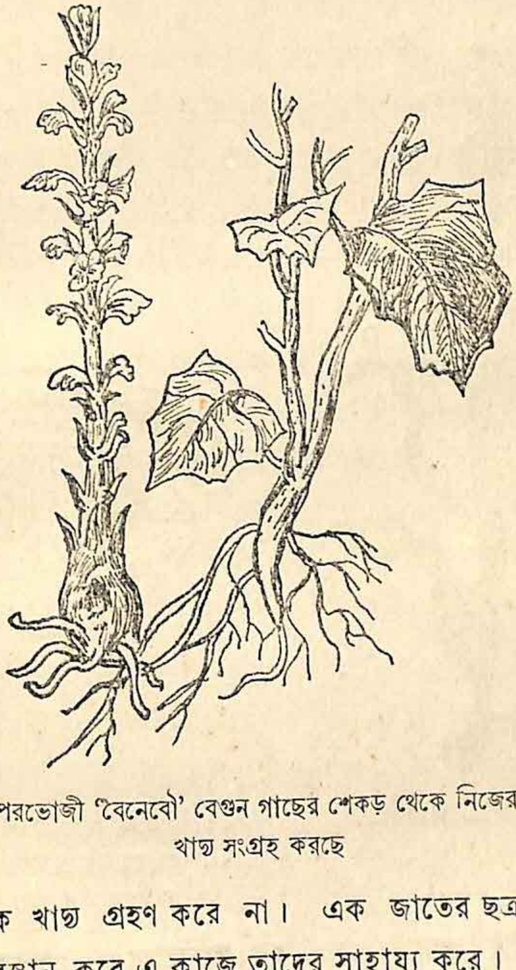
খাবার সংগ্রহের পরিমাণ অনুযায়ী পরভোজী দু-ধরনের। সম্পূর্ণ পরভোজী বলা হয় তাদের, সবুজের লেশমাত্রও থাকে না যাদের দেহের কোন অংশে। স্বর্ণলতা এমনি একটি পরভোজী যার ভিতরে কোন ক্লোরোফিল থাকে না। এমন কি পাতাই নেই এদের। দ্বিতীয় রকমের নাম হল আংশিক পরভোজী। এরা কিছু পরিমাণ খাবার নিজেরাই তৈরি করে। তাছাড়া এদের পাতাও থাকে, পাতায় আবার সবুজ রঙও থাকে। অন্য গাছের তৈরি খাবার শুষে নেবার জন্যে পরভোজীরা এক ধরনের শেকড় হোস্ট গাছের শেকড়ে, কাণ্ডে কিংবা ডালের কোষে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সেই শেকড় দিয়েই চুরি করে টেনে নেয় হোস্টের পুষ্টি। এই যে বিশেষ ধরনের শেকড় তাকে বলে হস্টরিয়া (Haustoria)।

আংশিক পরভোজী একটি গাছ কিন্তু খুবই সুখ্যাত। এ হল চন্দন গাছ। চন্দন কাঠের সুগন্ধ কার বা অচেনা! মহীশূর রাজ্যে এ গাছের চাষ হয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। নিজস্ব শেকড় থাকা সত্ত্বেও এ গাছের বৃদ্ধি হয় পরভোজী হিসেবে। এরা ধারে-কাছের অন্য জাতের গাছের শেকড়ে পাঠিয়ে দেয় হস্টরিয়া খাদ্যরস শোষণ করে আনবার জন্যে। দেখা গেছে, অন্য গাছের রস সংগ্রহ করতে না পারলে চন্দন গাছের বৃদ্ধি তেমন লক্ষণীয় হয় না।

পুরোপুরি নিজের খাবার সংগ্রহ করে অন্য গাছের শেকড় থেকে যে উদ্ভিদ তার নাম বেনে বৌ (Orŏbanche)। আর যে গাছের উপর আশ্রয় করে বেঁচে থাকে এরা সেগুলোর মধ্যে পড়ে আলু, বেগুন, টম্যাটো, তামাক ইত্যাদি আমাদের প্রয়োজনীয় গাছ। পরভোজীর আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট। জীবাণু ও ছত্রাক জাতের উদ্ভিদের মধ্যেও পরভোজীর সংখ্যাই বেশি।

আর এক জাতের উদ্ভিদ আছে যারা তাদের খাদ্য-সংগ্রহের জন্যে সবুজ গাছপালার উপর নির্ভর না করে পচা গলা প্রাণী অথবা উদ্ভিদেরই দেহাবশেষের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে।

এর মধ্যে পড়ে বহুসংখ্যক জীবাণু ও ছত্রাক জাতীয় নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যেও এ ধরনের গলনজীবীর (Saprophyte) উদাহরণ পাওয়া যায়, তবে তারা নিজেরা সরাসরি

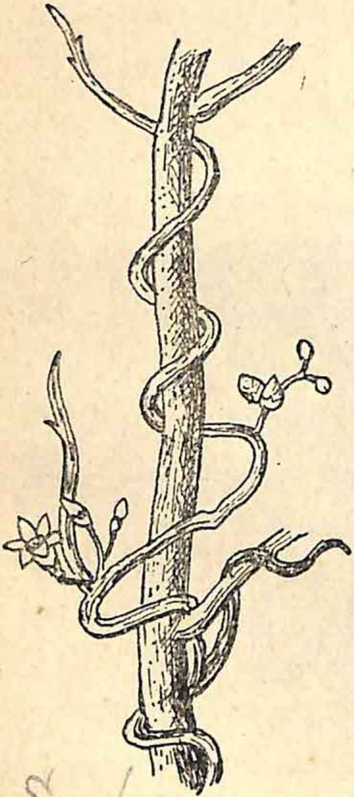


পরভোজী 'বৈনেবৌ' বেগুন গাছের শেকড় থেকে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করছে

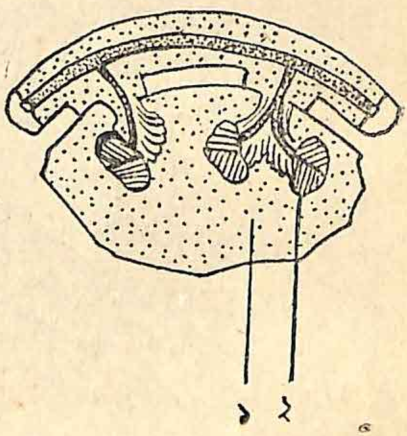
এই জৈবিক খাদ্য গ্রহণ করে না। এক জাতের ছত্রাক তাদের শেকড়ে অবস্থান করে এ কাজে তাদের সাহায্য করে।

এই প্রসঙ্গে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের কথাও জেনে রাখা ভাল। পরভোজী (Parasite) ও পরাশ্রয়ীর (Epiphyte) মধ্যে কিন্তু একটা মস্ত তফাত বিদ্যমান। পরাশ্রয়ীর খাদ্যসংগ্রহের প্রণালীটা অস্বাভাবিক, কিন্তু খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে তারা পুরো

স্বাধীন। সন্দেহ হয়, অন্য গাছের উপর আশ্রয় করে বলে। নানা জাতের অর্কিডকে এই রকম পরাশ্রয়ী হয়ে আমরা বাঁচতে দেখি।



পরভোজী ঃ স্বর্ণলতা



১। 'হোস্ট' গাছের কাণ্ড
২। পরভোজী যেভাবে শেকড় প্রবেশ করিয়ে দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে

পরাশ্রয়ীর শেকড় বের হয় দুরকমের। একরকম শেকড় বের হয় আশ্রয়স্থলকে আঁকড়ে ধরবার জন্যে। গাছের ফাঁকে বা ফাটলে এই শেকড়গুলো চলে গিয়ে যেমন আশ্রয়কে শক্ত করে আটকে ধরে, তেমনি ধারে-কাছে পাওয়া সামান্য কিছু জল বা পুষ্টি তাও শুষে নেয়, আশ্রয়দাতার কোন ক্ষতি না করেই।

এ জাতের শেকড়গুলো হয় খুব ছোট ছোট। অন্য আর এক ধরনের যে শেকড় হয় তাকে বলে বায়বীয় শেকড় (Aerial roots)। এগুলো এদিক ওদিক ঝুলে পড়ে গাছ থেকে, তাই অতি সহজেই এগুলো দৃষ্টিগোচর হয়। এই বায়বীয় শেকড়ের গায়ে স্পঞ্জ-জাতীয় এক আবরণের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে বাতাস বা বৃষ্টি থেকে জল ধরে রাখা সম্ভব হয়, ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে।

বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বড় বড় গাছও তাদের জীবন শুরু করে পরাশ্রয়ী হিসেবে।

খাদ্য তৈরি করে সবুজ উদ্ভিদ আর তাতে ভাগ বসায় অ-সবুজ উদ্ভিদ থেকে শুরু করে প্রাণীকুলের সবাই। খাদ্য প্রস্তুত আর খাদ্য গ্রহণের ফাঁকে ফাঁকে চলে উদ্ভিদের অন্যান্য কর্মতৎপরতা। উদ্ভিদ জগতের বিভিন্ন বাসিন্দাদের কার কী অবস্থা, কার কোথায় বাসস্থান, খাদ্য সংগ্রহের কার কী প্রণালী এবং আমাদের কাছেই বা তাদের মূল্য কতখানি তার একটা খবর নেওয়া যাক।

৪

উদ্ভিদ জগতের অন্যান্য বাসিন্দা

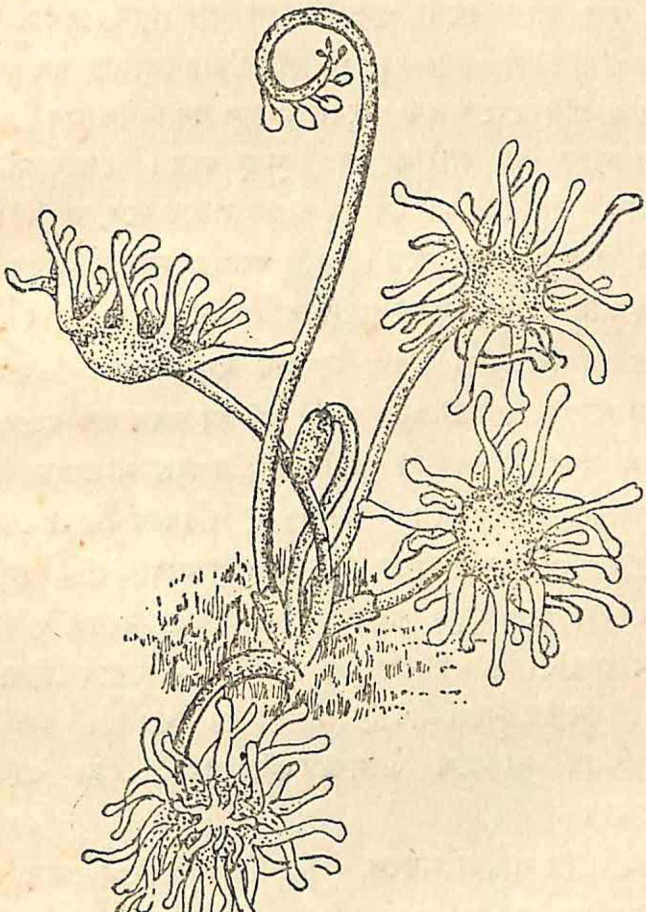
গভীর অরণ্যের রহস্য পুরোপুরি প্রকাশ না হলে অরণ্যের উদ্ভিদের সম্পর্কে নানারকমের লোমহর্ষক কাহিনী যে শোনা যাবে তাতে আর অবাক হবার কী আছে! এক ধরনের গল্প একসময় খুবই প্রচলিত ছিল। এখনো যে মাঝে মাঝে শোনা যায় না তা নয়। আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে এমন সব উদ্ভিদ ওত পেতে বসে আছে যারা সুযোগ আর সুবিধে পেলে বড় বড় জন্তুজানোয়ার, এমনকি মানুষকে পর্যন্ত তাদের তৈরি ফাঁদে ফেলে তাদের রক্ত মাংস শুষে খেয়ে নেয়। উদ্ভিদের এ ধরনের অদ্ভুত ক্ষমতার গল্প কতই না লেখা হয়েছে! এগুলো কিন্তু অতিরঞ্জিত, কাল্পনিক কাহিনী মাত্র। তবে ছোট ছোট কীট পতঙ্গ, যেমন পিঁপড়ে মাছি প্রভৃতি পোকাদের কৌশলে ধরে তাদের দেহের প্রোটিন জাতীয় খাবার শুষে নিয়ে নিজের দেহের পুষ্টি সাধন করবার ক্ষমতা কয়েকটি উদ্ভিদের আছে। হয়ত এ ধরনের উদ্ভিদের ক্রিয়াকলাপ থেকেই কল্পনা এগিয়েছে অনেকটা দূরে।

যেসব উদ্ভিদ পোকামাকড় ধরে তা থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে তাদের নাম পতঙ্গভুক (Insectivorous)। তা বলে শুধু পতঙ্গকুলের উপরই এরা নির্ভর করে না। সাধারণভাবে ক্লোরোফিলের সাহায্যেই খাদ্য তৈরি করে নেয় এরা। পোকা ধরবার এবং তা হজম করবার ক্ষমতাটা তাদের একটি বাড়তি সুবিধে হিসেবে প্রকৃতির দান।

সারা পৃথিবীতে সব রকমের পতঙ্গভুক উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় চারশো। এর মধ্যে প্রায় ৩০ রকমের পতঙ্গভুক উদ্ভিদের দেখা পাওয়া যায় ভারতবর্ষে। এক এক ধরনের উদ্ভিদ এক এক

প্রক্রিয়ায় পোকা মাকড় ফাঁদে ফেলে বটে, কিন্তু সকলের মধ্যে একটা বিষয়ে মিলও নজরে পড়ে।

ড্রসেরা (Drocera বা Sundew) নামে এক রকমের পতঙ্গভুক উদ্ভিদ আছে যার বাংলা নাম পানের পিক। নামটা



ড্রসেরা—অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে

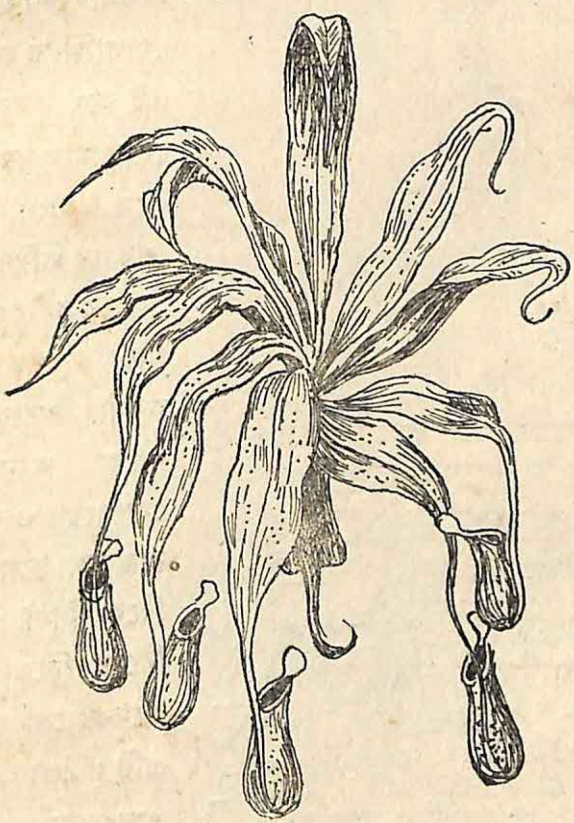
হয়েছে এদের লাল রঙ থেকে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে কেউ বুঝি পান খেয়ে পিক ফেলেছে জায়গায় জায়গায়। শীতের

শেষাশেষি, বেশি গরম না পড়া পর্যন্ত সময়টাতেই এদের দেখা পাওয়া যায়। দেখতে এরা ছোট ছোট। একটা গাছ ক-ইঞ্চি মাত্র লম্বা। তলার দিকে পাতাগুলো ছড়িয়ে সাজানো—এই পাতার মধ্যেই পোকা ধরার যত কারসাজি। পাতার উপরের দিকে থাকে চুলের মত অনেকগুলো সূক্ষ্ম জিনিস যার নাম দেওয়া যেতে পারে শুঁয়া (Tentacles)। প্রতিটি শুঁয়ার গোড়ায় থাকে একটি গ্রন্থি। এ গ্রন্থি থেকে এক ধরনের আঠাল রস নির্গত হয়। সূর্যের আলো পড়ে এই আঠাল রস চক্‌মক্ করে। পোকামাকড়েরা মধু মনে করে যেই না সে মধু সংগ্রহ করতে বসে, অমনি চটচটে আঠায় তারা আটকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শুঁয়াগুলো ভিতর দিকে গুটিয়ে এসে পোকাটিকে পুরোপুরি জড়িয়ে ধরে। তার তখন বেরিয়ে আসার আর কোন উপায়ই থাকে না। এমনিভাবে আটকা পড়ে পোকাটি মরে যায়। উদ্ভিদ তখন এক ধরনের রস নিষ্কাষণ করে (Enzyme) প্রোটিনজাতীয় খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরিপাক ক্রিয়া শুরু করে। যতক্ষণ না পরিপাক ক্রিয়া শেষ হয় শুঁয়াগুলো গুটোনোই থাকে। শেষ হলে আবার শুঁয়াগুলো টান টান সোজা হয়ে নতুন শিকার ধরার অপেক্ষা করে। শুঁয়াগুলো এক ধরনের রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতিতে পরিপাক ক্রিয়া করে থাকে। সে বস্তুটি হল নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ। অন্য কোন রকম বস্তুর সংস্পর্শে এলেও শুঁয়াগুলো কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, এগারো হাজার থেকে তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় যে পতঙ্গভুক উদ্ভিদের দেখা পাওয়া যায় তার নাম বাটারওয়ার্ট (Butterwort বা Pinguicula)। ড্রসেরার মত ছোট জাতের গাছ এগুলো, কিন্তু শিকড় এদের তেমন ভাল করে গজায়ই না। পাতাগুলো ভর্তি থাকে এক ধরনের গ্রন্থি দিয়ে। এ সব গ্রন্থি থেকে এক ধরনের আঠালো বস্তু বের হয়ে সারা

পাতায় ছড়িয়ে থাকে। কোন কারণে কোন পোকামাকড় পাতার সংস্পর্শে এলে সে সঙ্গে সঙ্গে পাতায় আটকে যায়। পাতাগুলো দু-ধার থেকে ভিতরের দিকে গুটিয়ে এসে প্রাণীটিকে জড়িয়ে ধরে। গ্রন্থি থেকে পরিপাকের জন্যে প্রয়োজনীয় রস (Enzyme) বের হয়ে অবশেষে পোকাটিকে পরিপাক করে ফেলে। পরিপাক শেষ হলে পাতা আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

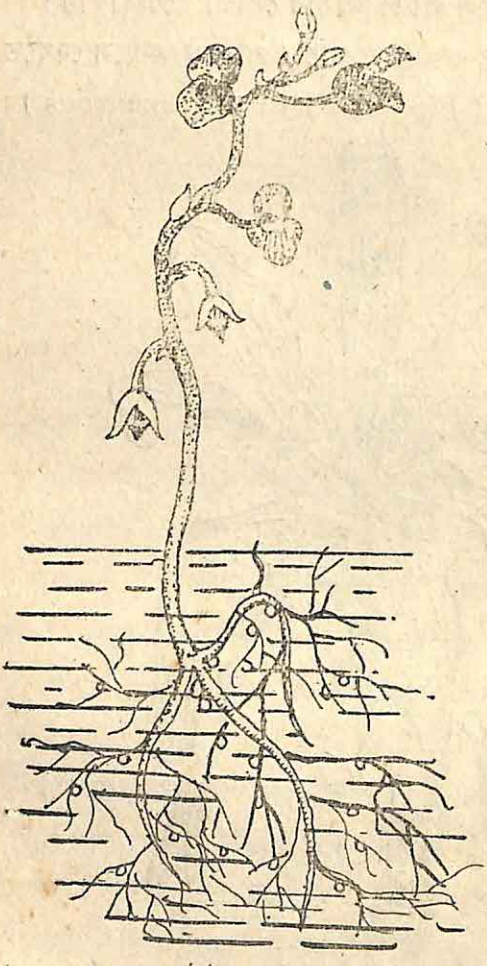
আসাম প্রদেশের খাসি, জয়ন্তী ও গারো পাহাড় অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় কলসী গাছ (Pitcher Plant বা Nepenthes)।



কলসী গাছ

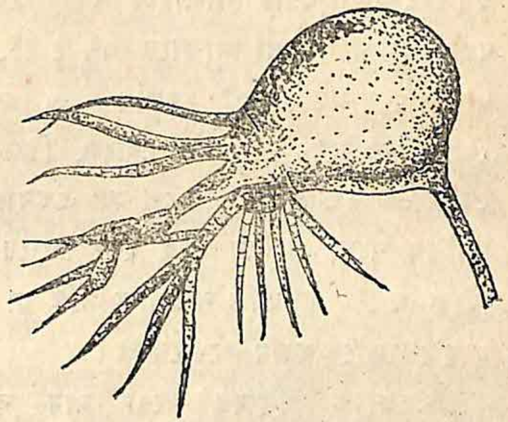
এই গাছের প্রতিটি পাতার ডগায় একটি করে কলসীর আকৃতির অংশ ঝুলতে দেখা যায়। আকারে এগুলো খুব একটা বড় না হলেও

একেবারে ছোটও নয়। ৬ ইঞ্চি থেকে ৮ ইঞ্চি মাপের এক একটি কলসী। গাছগুলো মোটামুটি বড়। কখনো দেখতে পাওয়া যায় আঁকড়ির সাহায্যে অন্য গাছে বেয়ে উঠেছে। কলসী গাছের কলসীগুলো কিন্তু আসলে পাতারই একটা রূপান্তরিত চেহারা। কলসীগুলোর মাথার উপর একটি করে ঢাকনি থাকে, যেগুলো শিশু অবস্থায় কলসীর মুখ ঢেকে রাখে। এই ঢাকনাগুলো হয় সুন্দর গোলাপি রঙের, আর এই রঙে আকৃষ্ট হয়ে পোকামাকড়রা দৌড়ে এসে কলসী গাছের শিকারে পরিণত হয়।


ইউট্রিকুলারিয়া

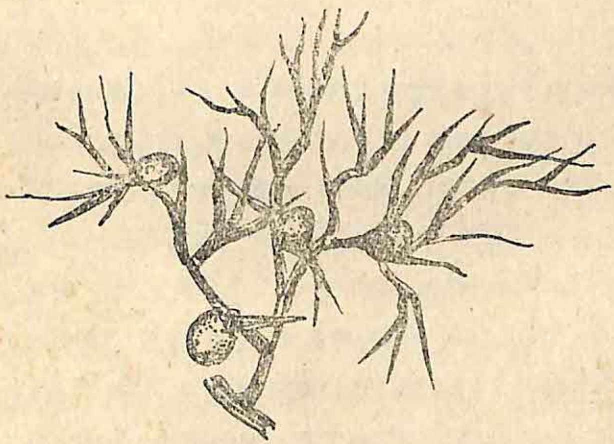
কলসীর মুখ টা থাকে পেছল আর কলসীর ভিতরের দিকে থাকে অনেকগুলো মোলায়েম ও সূক্ষ্ম চুল যার ডগাগুলো নিচের দিকে নির্দিষ্ট। আরও নিচের দিকে থাকে অনেকগুলো পরিপাক গ্রন্থি। পোকা মাকড় এসে কলসীর কানায় বসতে গেলে মুখের পিচ্ছিলতার দরুন পিছলে চলে যায় কলসীর গর্তে আর কলসীর গায়ের সূক্ষ্ম চুলগুলো তাদের উপরে উঠে আসায় বাধার সৃষ্টি

করে। পোকারা তখন পালাতে না পেরে কলসীর মধ্যেই থেকে যেতে বাধ্য হয়। এরপর গ্রন্থি থেকে পরিপাকরস নির্গত হয়ে ক্রমশ পোকামাকড়ের দেহের খাদ্যবস্তু হজম করে ফেলে।



ইউট্রিকুলারিয়ার একটি থলে
—অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে

নানাজাতের পতঙ্গ-ভুক উদ্ভিদের মধ্যে ভারতে যে জাতের পতঙ্গভুক উদ্ভিদ সব-চাইতে বেশি দেখতে পাওয়া যায় তা হল ইউট্রিকুলারিয়া বা ব্লাডার ওয়ার্ট (Utricularia বা Bladder wort)। এদের দেখা পাওয়া যায় পুকুরে, জলাভূমিতে এবং নালায়। শেকড়হীন এই ছোট্ট জলজ উদ্ভিদ জলের



ইউট্রিকুলারিয়ার শেকড়ের একটি অংশ

উপর ভেসে বেড়ায়, কখনো বা থাকে জলের নিচে। এদের পাতা-গুলো খুব সরু সরু ভাবে বিভক্ত, এত সরু বলে হঠাৎ দেখে মনে হয়

বুঝি এগুলো শেকড়ই—অবশ্য রঙটা পাতার মতই সবুজ। পাতার সরু সরু অংশই কিছুসংখ্যক থলের (bladder) আকারে পরিণত হয়। পোকা ধরার ব্যাপারটা চলে এই অংশ দিয়ে। পোকা ধরার এই থলেগুলো আকারে বেশ ছোট, মাত্র ⅕ ইঞ্চির মত। মুখে থাকে ফাঁদ-মত একটি দরজা। এ দরজা কেবলমাত্র বাইরে থেকে ভিতরের দিকেই খোলে, ভিতর-দিক থেকে খোলার কোন উপায় নেই। তাই পোকা একবার ঢুকে গেলে ভিতরেই আটকে পড়ে, বাইরে বের হতে পারে না। থলের ভিতরের দিকে থাকে গা-ভর্তি পরিপাক-গ্রন্থি যা থেকে পরিপাক-রস বের হয়ে পোকাকে হজম করে ফেলে।

পতঙ্গভুক উদ্ভিদের মধ্যে নাম করা যায় ড্রাইওনিয়া, এলড্রোভাণ্ডা, সারসিনিয়া প্রভৃতির। সকলের দেহেই পোকা ধরার একটা কৌশল থাকে, আর থাকে পরিপাক-করতে পারার মত রস নিষ্কাশনের উপায়। দুইয়ের মিলিত ফলে পোকামাকড়ের দেহের পুষ্টি সংগ্রহ করে নিজেদের পুষ্টিসাধন করে এইসব গাছ।

হাত থেকে গম, চাল আর চিনির থলে-কটা মাটিতে ধপ্ ধপ্ করে ফেলে দিয়ে রাগে ফেটে পড়ল রতন। সেই কখন গিয়ে দোকানে লাইন দিয়েছিল, আর এই ফেরা। সমস্ত সকালের পড়াশুনো মাটি, তাই বলে ঘড়ির কাঁটা বসে নেই, টিক্‌টিক্ করে এগিয়েই চলেছে। এবার না স্কুলেরই দেরি হয়ে যায়! তাড়া পড়াটা স্বাভাবিক, দৌড়োদৌড়িও শুরু হয়ে গেল তাই। নাওয়া খাওয়া সবই বাকি, এদিকে ঢং ঢং করে ঘড়িতে বেজে গেল দশটা। আর তখনই ঘটল ব্যাপারটা। কলতলায় যেতে গিয়ে পড়ে গেল রতন। সিমেণ্টের উপরে সবুজ সবুজ ছোপ-ধরা জায়গাটা যে এমন অসময়ে রসিকতা করবে এটা কেই-বা আন্দাজ করেছিল! অথচ আছাড় খেয়ে না পড়ে যেতে হয় এই আশঙ্কার কথা মনে রেখে মাত্র কিছুদিন আগেই জায়গাটা থেকে শেওলা সাফ করার চেষ্টাও রতন করেছিল—বন্ধুদের ক্যারম খেলার আমন্ত্রণ এড়িয়েও।

শেওলা

শেওলার রকমই ওই। আজ পরিষ্কার করলেও দু-দিনেই আবার একরাশ নতুন শেওলা গজিয়ে জায়গাটা ভরে ফেলবে। জল আর আলোর অনুকূল সরবরাহে এদের বৃদ্ধি হয় অতি দ্রুত।

শেওলা (Algae) হল পৃথিবীর অন্যতম পুরোনো উদ্ভিদ। আজকের দেখা বড় গাছপালাদের তুলনায় এরা পৃথিবীতে এসেছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে। খুব সরল আর সাধারণ চেহারা হয় শেওলার। একটি কোষে একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদের উদাহরণ শেওলার মধ্যে বেশি খুঁজতে হয় না। এগুলো আকৃতিতে খুবই ছোট, এত ছোট যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া চোখেই পড়ে না। অবশ্য বহু কোষ দিয়ে যখন এদের দেহ তৈরি হয় তখন খালি চোখে বেশ ভালই দেখা

যায়। কিন্তু মজা এই যে, এরা উদ্ভিদ জগতের বাসিন্দা হলেও এদের না আছে শেকড়, না ডালপালা, না ফুল বা ফল। মিল শুধু সবুজ রঙের অবস্থিতিতে। যে কারণে এরাও বড় বড় মহীরুহদের মতই স্বাধীন, খাদ্য-প্রস্তুতির ব্যাপারে।

এই ক্ষুদে ক্ষুদে উদ্ভিদ চিরকালই বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং আজও করছে নতুনতর ভাবে। নতুন দিগন্তের সন্ধান চলেছে এদের মধ্যে।

একটা পুকুর বা ডোবার জল ঘোলাটে আর সবুজ হয়ে আছে, এ দৃশ্য এমন কী আর নতুন ? এ দৃশ্য তো আমাদের সকলেরই দেখা। কিন্তু কারণটা কী? কারণটা আর কিছুই নয়, জলে শেওলার অতিরিক্ত পরিমাণে উপস্থিতি। ছোট বলে এদের রঙটাই চোখে পড়ে বেশি করে, চেহারার হদিশ পাওয়া যায় না। অনেক শেওলাই দেখা যাবে যারা এককোষী। কেউ ভেসে বেড়ায় জলের উপর, কেউ তলিয়ে থাকে নিচে। এককোষী শেওলার মধ্যে এমন শেওলাও দেখা যায় যারা প্রাণীদের মতই গতিসম্পন্ন এবং এদিক থেকে ওদিকে জলের মধ্যে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। এই রকমের এককোষীউদ্ভিদ অনেক সময় একত্র হয়ে একটা কলোনিও তৈরি করে থাকে। কিন্তু তা সত্বেও সবাই স্বয়ং-সম্পূর্ণ, কেউ কারুর উপর কোনরকমেই নির্ভর করে না। কোষগুলো একটার পর একটা জুড়ে লম্বা ধরনের কলোনির সৃষ্টি করে। গোলাকার চেহারাও হতে পারে কলোনির। এটা নির্ভর করে কোষের জোড়া লাগার নমুনার উপর।

অনেক শেওলাই এক ধরনের আঠা নিষ্কাশন করে থাকে তাদের কোষ-প্রাচীরের ধারে ধারে। এ আঠা কোষকে বেশি মাত্রায় জলক্ষয়ের হাত থেকে ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে রক্ষা করে। এই আঠার জন্যেই শেওলার পিচ্ছিলতা এবং আমাদের রতন বাবুর আছাড় খাওয়া।

জলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে, বা জলের নিচে ডুবে আছে, সূক্ষ্ম সুতোর মত সবুজ বা হলদেটে কিম্বা খয়েরি রঙের শেওলা যে-কোন পুকুরে একটু নজর করলেই দেখা যাবে। ঝরনার জল অনবরত বয়ে চলেছে যে পথে, শেওলার দেখা পাব সেখানেও। দেখা পাব সমুদ্রের গভীরে, পাথরের গায়ে, নুড়ির গায়ে, গাছের গুঁড়িতে বা ডালের খাঁজে খাঁজে। একটু জুত করে বসতে পারলেই হল, জায়গাটা যেমনই হোক না। সঙ্গে সঙ্গে শ্যাওলা গজিয়ে উঠবে সেখানটায়। এ পর্যন্ত ৩০,০০০ বিভিন্ন ধরনের শেওলার হিসেব পাওয়া গেছে। তাছাড়া ভবিষ্যতে যে আরও নতুন নতুন শেওলার দেখা আমরা পাব তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

সমস্ত শেওলাতেই সবুজ রঙ থাকে। আর কোন-কোন শেওলাতে সবুজ ছাড়াও যখন অন্য রঙের রঙিন কণিকা (Pigment) বেশি পরিমাণে থাকে তখন সবুজ রঙকে তা ঢেকে ফেলে। পুরো সবুজ রঙ ছাড়াও নীলাভ সবুজ, হলদেটে সবুজ, বাদামি ও লাল রঙের বিভিন্ন ধরনের শেওলার দেখা পাওয়া যায়। ছোট এককোষী শেওলাই হোক কিম্বা বহুকোষী শেওলাই হোক, রঙ সবুজই হোক বা অন্য আর কিছুই হোক—প্রতিটি কোষে থাকে ক্লোরোফিল বা পত্রহরিৎ। শেওলারা নিজেরাই তাই বড়-পাতা-ওয়ালা গাছের মতই সালোক-সংশ্লেষের কাজ করতে পারে। প্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড জলেই মেশানো থাকে। আর জলের নিচেও সূর্যের যে তাপ পৌঁছয় তা-ই শক্তির জোগানদার হিসেবে যথেষ্ট।

শেওলার বংশবৃদ্ধি

শেওলার মধ্যে বংশবৃদ্ধির নানা রকমফের দেখা যায়। শেওলার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে, একটা কোষ ভেঙে দুটো নতুন কোষের জন্মলাভ ঘটছে। কলোনি করে একত্রে যে শেওলারা থাকে

তাদের কোষ বিভক্তিতে কলোনির আকার ছোট থেকে বড় হতে থাকে। আর এইসব কলোনি যখন জলের তোড়ে কিম্বা জলজ প্রাণীর যাতায়াতের আঘাতে ভেঙে যায় তখন অন্যত্র সরে গিয়ে কলোনির কোষের সংখ্যা আবার নতুন করে বাড়তে থাকে।

রেণুর সৃষ্টি করে শেওলা অযৌন উপায়েও বংশবৃদ্ধি করে। রেণু তৈরি হয় কোষের প্রোটোপ্লাস্ট থেকে। রেণুগুলো অনেকদিন সুপ্ত থেকে তাদের দিন কাটিয়ে দেয়, যতদিন না অঙ্কুরিত হবার মত ভাল পরিবেশ তারা পায়। তারপর পরিবেশ সুবিধেজনক হলে সে রেণু থেকে তক্ষুনি তক্ষুনি নতুন শেওলার জন্মলাভ ঘটে।

যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধির সময় কোষের ভিতরকার পদার্থ মিলে তৈরি হয় গ্যামেট (Gamete)। স্ত্রী ও পুরুষ গ্যামেট দেখতে হয় কখনো একই রকমের, কখনো বা ভিন্ন রকমের। দু-রকমের গ্যামেটের মিলনে তৈরি হয় জাইগোট (Zygote)। কিছুদিন বিশ্রামের পর জাইগোট থেকে জন্মায় নতুন শেওলা।

সবুজ শেওলার মধ্যে ডেসমিড (Desmid) নামের এককোষী যে শেওলা তার দেহ-সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে দেখার মত। কখনো একত্রে, কখনো কলোনি তৈরি করে এরা জলে ভেসে বেড়ায়। কলোনিগুলো কখনো লম্বা সুতোর মত, কখনো বা শেকলের মত দেখতে। ডেসমিডের দুটি ভাগ, এক ভাগ অপর ভাগের ঠিক বিপরীত আকৃতির। মাঝখানে নিউক্লিয়াসের অবস্থান। তাইতেই সৌন্দর্যটা খোলে ভাল।

অদ্ভুত সৌন্দর্যমণ্ডিত অন্য আর এক ধরনের শেওলা হল ডায়াটম (Diatom)। চেহারা এদের কখনো গোল, কখনো চতুর্ভুজ, কখনো বা ত্রিকোণাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি। রঙ কারুর সবুজ, কারুর বা খয়েরিসোনালি। যে রঙই হোক না কেন, কোষে থাকে ক্লোরোফিল। আর এদের তৈরি খাদ্য হল তেল। ডায়াটমের সৌন্দর্য কেবলমাত্র তার আকৃতির জন্যেই নয়। কোষের গায়ে সরু

সরু অসংখ্য দাগ থাকার জন্যে নানারকম সুন্দর নক্সার সৃষ্টি হয় বলে এদের দেখতে এত সুন্দর। মৃত ডায়াটম নদী, পুকুর বা সাগরের জলের তলায় জড়ো হয়ে সৃষ্টি করে ডায়াটম স্তরের (Diatomaceous earth)। এ ব্যবহৃত হয় নানা শিল্পে, যেমন —চিনি শোধনের জন্যে ও নানারকম পালিশ করার কাজে। এছাড়া আরও অন্য ব্যবহার এর আছে।

মাটির উপরে যেমন ঘাসের প্রাচুর্য, জলে তেমনি শেওলার। শেওলাকে তাই জলের ঘাস বলেও উল্লেখ করা হয়। জলে যেসব প্রাণী বাস করে তারা শেওলার কাছ থেকেই তাদের খাদ্য ও শক্তি সংগ্রহ করে। ছোট বড় অনেক মাছই কেবলমাত্র শেওলা খেয়ে বেঁচে থাকে। অত বড় যে তিমিমাছ তারও মূল খাদ্য জোগায় শেওলা। তাছাড়া জলজ প্রাণীদের অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের জোগান দেয় শেওলা।

শেওলাও আমাদের উপকারী

সামুদ্রিক শেওলা দিয়ে জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনার কাজ অনেকদিন ধরেই চলছে। বড় বড় গাছ মাটি থেকে যে নুন শুষে নেয় শেওলা তা পরিপূরণ করে দিয়ে জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দেয় অনেকাংশে।

ইউরোপ আমেরিকায় 'সুপ' তৈরির জন্যে এক ধরনের শেওলার ব্যবহার হয়। দই জমাবার জন্যে 'চাইনীজ গ্রাস' (Chinese grass) নামের যে জিনিসটি আমাদের জানা আছে তা আসে এক ধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে। আগার আগার (Agar agar) নামেও এরা পরিচিত। প্রতিটি ল্যাবরেটরি ও হাসপাতালে জীবাণুর পরীক্ষায় এর ব্যবহার হয়। শেওলা থেকে আর যেসব কাজ আমরা পেয়ে থাকি তা প্রসাধন তৈরি থেকে শুরু করে চামড়া চকচকে করার কাজ পর্যন্ত।

শেওলা নিয়ে অতি সম্প্রতি এক নতুন পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এজন্যে প্লাসটিকের ছোট টিউবে অথবা বড় চৌবাচ্চায় প্রচুর পরিমাণে শেওলার চাষ শুরু হয়ে গিয়েছে। শেওলার খাদ্যের জন্যে প্রয়োজনীয় জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও সূর্যকিরণ জোগান দিতে পারলে তাদের বৃদ্ধি হয় অতি দ্রুত। এইভাবে উৎপন্ন শেওলা শুকিয়ে রাখা হয় ভবিষ্যতে গবাদি পশুদের ব্যবহারের প্রয়োজনে।

পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা যখন খাদ্যাভাবে আতঙ্কিত তখন বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু মস্ত এক আশার বাণী শুনিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকরা আশা করেন যে, ভবিষ্যতের খাদ্য-সঙ্কটে শেওলাই আমাদের জীবন ধারণের সহায়ক হবে। পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য সরবরাহ করবে এই শেওলাই যখন আমরা আমাদের পরিচিত খাদ্যভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছি। এরকম দিন আসা তখন বিচিত্র নয়।

মহাকাশ বিজ্ঞানে এইসব ছোট-ছোট উদ্ভিদ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে চলেছে। একথা প্রথমে শুনলে হয়ত হাসিই পাবে। কিন্তু অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। সত্যি-সত্যিই একদিন এই শেওলাই এক মস্ত সমস্যার সমাধান করবে, এ রকম সম্ভাবনা এখনই দেখা যাচ্ছে। মহাকাশযাত্রীর পরিত্যক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে মহাকাশযান মুক্ত করা এক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে শেওলার কর্মক্ষমতা বিবেচনা করতে গিয়ে এক জাতের শেওলার সন্ধান পাওয়া গেছে যা অন্য অনেক শেওলার চাইতে বেশি তাড়াতাড়ি বাড়ে। তার মানে, তারা তাদের বৃদ্ধির কালে অনেক বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অনেক বেশি পরিমাণ অক্সিজেন ত্যাগ করে থাকে। ক্লোরেলা (Chlorella) নামে এক জাতের সবুজ শেওলার মধ্যে এ গুণটির খোঁজ পাওয়া গেছে। ক্লোরেলা যে শুধুমাত্র মহাকাশযাত্রীকে বদ্ধ

আকাশ-যানের কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়ে সাহায্য করবে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশযানে ক্রমশ-ফুরিয়ে-আসা অক্সিজেনের সরবরাহও বাড়াবে। আরও একটা সম্ভাবনা এই শেওলার আছে, তা হল খাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্লোরেলার চাষ মহাকাশযানেও সম্ভব। ঊর্ধ্বাকাশে মহাকাশযানে তাহলে পৃথিবীর পরিচিত পরিবেশই সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। ফলে অনেক সমস্যাই সেদিন আর সমস্যা বলে মনে হবে না।

তাহলেই দেখ, তুচ্ছ কেউই নয়, অকারণে বেঁচে থেকে অসময়ে আছাড় খাওয়ানোটাই তাদের কাজ নয়। কত অদ্ভুত সম্ভাবনাই না লুকিয়ে আছে ছোট ছোট অনাদৃত শেওলার কোষে কোষে!

বিত্তহীন উদ্ভিদ, যারা সবুজ পত্রহরিতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, উদ্ভিদ জগতে তাদের সংখ্যাও অসংখ্য। নিজেরা খাবার তৈরি করতে পারে না বলে জীবন কাটায় পরজীবী, গলনজীবী, বা মৃতজীবী হিসেবে। তার মানে তাদের পুষ্টি সংগ্রহ করতে হয় অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ থেকে (Parasite) অথবা পচা গলা খাবার থেকে (Saprophyte)। এমনিধারা উদ্ভিদের মধ্যে সবচাইতে ছোট উদ্ভিদ হল জীবাণু বা Bacteria। জীবাণুর নাম শুনলেই আমরা আতঙ্কিত হই, কেননা আমরা জানি কী অদ্ভুত মারাত্মক রোগ এরা নিয়ে আসে। যক্ষ্মা, কলেরা, টাইফয়েড, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি সাঙ্ঘাতিক সব রোগের জন্যে এরাই দায়ী। এরাও কিন্তু উদ্ভিদ জগতেরই বাসিন্দা।

জীবাণু

জীববিজ্ঞানীদের মতে জীবাণুরাই পৃথিবীতে এসেছে সবচাইতে আগে, এরাই পুরোনো পৃথিবীর অন্যতম বাসিন্দা। সংখ্যায় এরা অসংখ্য ; এবং শুধুমাত্র সংখ্যা যদি সার্থকতার কোন নিদর্শন হয় তাহলে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, জীবাণুরা সার্থকতার চরম।

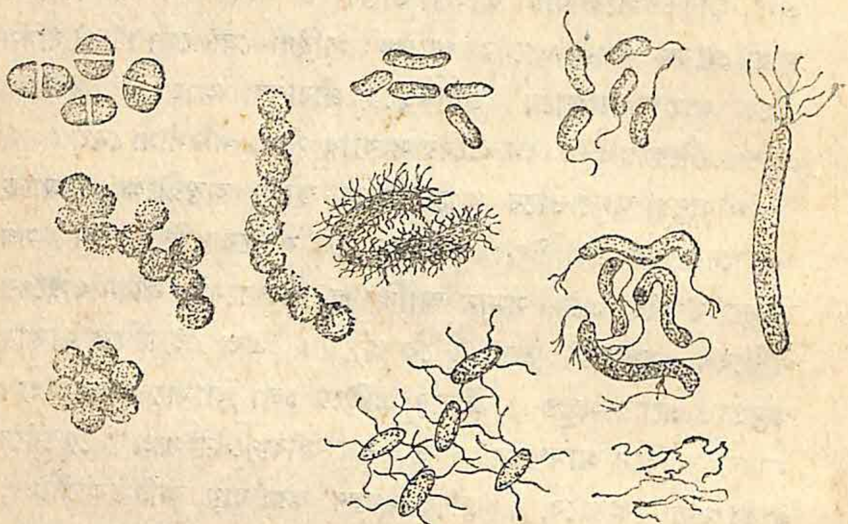
যখন সবুজ গাছপালার চিহ্নও ছিল না এবং সেজন্যে ক্লোরোফিলের সাহায্যে খাদ্য-সংশ্লেষের কোন কথাই ছিল না, তখন সম্ভবত জীবাণুরা সূর্যের শক্তির বদলে অজৈব লোহা আর সালফার যৌগ (Sulphur compound) থেকে শক্তি সংগ্রহ করে শর্করা তৈরি করতে পারত। ভূবিজ্ঞানীদেরও তাই ধারণা। আজকের পৃথিবীতে যে প্রচুর লৌহ আকরের প্রাচুর্য এবং যা আমরা আজ নানা কাজে লাগাচ্ছি তা বহুকাল পূর্বের জীবাণু-ঘটিত ভূতাত্ত্বিক

ঘটনার নিদর্শন। তারপর যখন সবুজ উদ্ভিদের আবির্ভাব হল, এল নতুন ধরনের জীবাণু। এদের বেঁচে থাকার প্রয়োজন মেটালো গাছের তৈরি সঞ্চিত জৈব পদার্থ। অন্য ধরনের জীবাণু এল আরও পরে যারা জীবন্ত উদ্ভিদ ও জীবন্ত প্রাণীর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের খাদ্যের চাহিদা মেটালো। দীর্ঘদিন টিকে থাকার সংগ্রামে জয়ী হয়ে জীবাণুরা আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এখন এদের সংখ্যার সীমা পরিসীমা নেই।

জীবাণুরা অদৃশ্যভাবে আছে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে; আছে আমাদের শরীরের উপর ভর করে এবং শরীরের ভিতরেও। সব কিছুর উপরই এদের সমান আধিপত্য—যেখানেই জীবন-ধারণের পরিবেশ সেখানেই তারা টিঁকে আছে। এবং এই টিঁকে থাকার ক্ষমতাও এদের অদ্ভুত। জীবাণু এড়িয়ে চলা আমাদের অসাধ্য। আজকের দিনে আমাদের সমস্যা হল, জীবাণুদের সঙ্গে নিয়ে বেঁচে থাকা যায় কিভাবে, কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় অহিতকারীদের, এবং হিতকারীদের কাছ থেকে কিভাবে পুরো সুবিধে গ্রহণ করে নিতে পারি আমরা।

জীবাণুদের চেহারা অত্যন্ত ছোট। একটি মাত্র কোষ এক একটি উদ্ভিদ যেন। কোষের মধ্যে আছে পাতলা আবরণে ঘেরা প্রোটোপ্লাস্ট। এত ছোট এই জীবাণুরা যে এদের চেহারা সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে না। অন্ততপক্ষে হাজার গুণ বড় করে দেখার যন্ত্রে এদের দেখা পাওয়া যায়। কত ছোট আন্দাজ হবে, যদি বলি এক ইঞ্চির দশ হাজার ভাগের একভাগ থেকে পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র এদের আকৃতি! একটা ছুঁচের ডগায় হাজার হাজার জীবাণু ধরে যাবে। চেহারা অনুযায়ী জীবাণুদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়। ছোট বলের আকৃতি হলে কক্কাস (Coccus), লম্বা লাঠির আকারের হলে ব্যাসিলাস (Bacillus), আর বাঁকানো বা পেঁচানো মতন হলে স্পাইরিলাম (Spirillum)।

জীবাণুর বংশ-বিস্তার হয় কোষ বিভাগের দ্বারা। একটি থেকে দুটি নতুন কোষে, দুটি থেকে চারটিতে—এমনিভাবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি থেকে অসংখ্য জীবাণুর সৃষ্টি হতে পারে।



নানারকমের জীবাণু

হিসেব করে দেখা গেছে, জীবাণুরা আদর্শ পরিবেশ পেলে কুড়ি মিনিটেই পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং নতুন কোষ সৃষ্টির ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। তার মানে, একটি মাত্র কোষ তিন দিনের শেষে ৭,০০০ টন জীবাণুর জন্ম দিতে পারে ভাবলে সাঙ্ঘাতিক মনে হবে, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য, ঠিক তেমন-তেমন আদর্শ পরিবেশ জীবাণুরা সব সময় পায় না বলে এরকম ভয়ঙ্কর দ্রুত বৃদ্ধি এদের এক সময় হ্রাস পায়। আমাদের পক্ষে আরও একটি সৌভাগ্যের কারণ এই যে, বেশিরভাগ জীবাণুরই ক্ষতি করবার ক্ষমতা নেই। এ তবু মন্দের ভাল। ক্ষতিকারক জীবাণু যা অল্পসল্প আছে তাদের নিয়েই তো আমরা আতঙ্কিত।

প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকার ক্ষমতা জীবাণুদের অসীম। এরকম অবস্থায় বেঁচে থাকার জন্যে জীবাণুরা নিজেদের আকৃতির

পরিবর্তন করে ফেলে। নিজেদের চারদিকে এরা একটি কঠিন আবরণ সৃষ্টি করে প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পাবার আশায়। এ অবস্থায় অত্যন্ত গরম বা অত্যন্ত ঠাণ্ডায় এদের কোন ক্ষতিই হয় না। অবিশ্বাস্য রকম অবস্থায় অতি সহজেই এরা বেঁচে থাকতে পারে। বছরের পর বছর ঘুমন্ত অবস্থায় কাটিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে জীবাণুর রেণু (Spore) ভেসে আসে হাওয়ায় ভর করে। তারপর যখন আশ্রয় পায় কোন অনুকূল স্থানে, প্রাণী কিম্বা উদ্ভিদে, তখন আরম্ভ হয় তাদের নতুন কর্মতৎপরতা। এক কোষ থেকে দুই কোষ, দুই থেকে চার, চার থেকে আট—এমনি করে অতি দ্রুত নতুন কোষ সৃষ্টি হতে থাকে।

আমাদের মারাত্মক অসুখ বিসুখের জন্যে যে দায়ী জীবাণুরা এ তো তোমাদের জানা কথা। শরীরে এসে আশ্রয় করে আর শরীর থেকেই পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে জীবাণুরা দেখতে দেখতে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। আর সেইসঙ্গে আশ্রয়কারীর শরীরে তাদের উৎপন্ন বিষ ঢালতে থাকে। বিষের তীব্রতা বেশি হলেই হয় আশ্রয়দাতার মৃত্যু। ইদানীং কালে অবশ্য অদ্ভুত সব নতুন ঔষধ আবিষ্কারে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করা অনেকাংশে সহজ হয়েছে।

অসুখ বিসুখ ছাড়া, খাবার নষ্ট করে যে ক্ষতি জীবাণুরা করে তার পরিমাণও কম নয়। শুধু যে আর্থিক ক্ষতি হয় তাই নয়। অজান্তে সে খাদ্য গ্রহণ করলেই দুর্ভোগ, আর বিষক্রিয়া তীব্র হলেই মৃত্যু।

জীবাণুরা আমাদের উপকারও করে

উপকারী জীবাণুর কথা শুনলে, অন্তত কিছুসংখ্যক জীবাণুর সম্পর্কে আমাদের ভয়-মিশ্রিত অস্বস্তি কেটে যায়। দুধ থেকে দই তৈরির ব্যাপারটা জীবাণুরই তৎপরতা। মাখন ও চীজ তৈরির জন্যেও দায়ী কয়েকটি ছোট জীবাণু। চীজের মন-মাতানো গন্ধ আসে

এক ধরনের জীবাণুর তৎপরতায়। ভিনিগার তৈরি হয় অন্য আর-এক ধরনের জীবাণুর দ্বারা এক ধরনের ছত্রাকের সহযোগিতায়।

পাটের চাষ আমাদের দেশের একটি অর্থকরী চাষ। দেশে এবং বিদেশে আজও পাটের প্রচুর চাহিদা। চাষের পরে পাট গাছগুলোকে আঁটি বেঁধে জলে রেখে দেওয়া হয় পাটের আঁশ আলাদা করে নেবার জন্যে। জলে অবস্থিত এক ধরনের জীবাণুই আঁশ আলাদা করার কাজটা করে দেয়।

চামড়া শিল্পে জীবাণুর প্রয়োজন চামড়াকে নরম করার জন্যে। চা আর তামাক শিল্পে জীবাণুর প্রয়োজন পাতাগুলোকে পাকানো ও গন্ধযুক্ত করার জন্যে।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে কাজ জীবাণুরা করে তা হল মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীকে পচিয়ে গলিয়ে উদ্ভিদের গ্রহণ-উপযোগী করে তোলা। গাছের গোড়ায় যে সার দেওয়া হয় তাও জীবাণুরাই পচিয়ে খাদ্যের আকারে গাছকে পৌঁছে দেয়।

মটর-জাতীয় গাছের শেকড়ে এক অদ্ভুত ধরনের জীবাণু বাসা বাঁধে। এসব জীবাণু বাতাস থেকে মূল্যবান নাইট্রোজেন গ্রহণ করে সবুজ গাছকে তা পৌঁছে দেয়।

ভাল আর মন্দের মিলিত এই পৃথিবীতে জীবাণুরাও শুধুমাত্র মন্দ নয়, ভালোর দেখা পাই তাদের মধ্যেও।

বন্ধুর মত উপকার করছে একদিকে আর অন্য দিকে শত্রুতায়ও কম যাচ্ছে না, তেমনি এক শ্রেণীর উদ্ভিদ হল ছত্রাক। আসলে জীবাণুরই সমগোত্রীয় এরা। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ হলেও জীবাণুদের চাইতে এরা সামান্য উন্নত। অবশ্য সেটা কেবলমাত্র চেহারায়। আসলে এরাও পারে না নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে—বাঁচে অন্যের উপর নির্ভর করে, পরজীবী বা গলনজীবী হিসেবে।

নানা ধরনের ছত্রাক

খুব ছোট আকারের ছত্রাক (Fungus) যেমন আছে যাদের কেবলমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি খুব সহজেই চোখে পড়ে তেমন ছত্রাকের সংখ্যাও প্রচুর। ব্যাঙের ছাতা এই ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদ। আরও অনেক বেশি বড় আকারের ছত্রাকও অনেক আছে। ছোটই হোক আর বড়ই হোক, একটা ব্যাপারে কিন্তু উভয়ের মিল আছে। তা হল উভয়ের ক্ষেত্রেই ক্লোরোফিলের অনুপস্থিতি। বলা বাহুল্য, সেজন্যে এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। তাই বেঁচে থাকে অন্যের সাহায্য নিয়ে।

ছত্রাককেও এড়িয়ে চলার উপায় নেই। রুটি মাখন বাসি হলে বা ফল বেশি দিন রেখে দিলে তাদের গা-ভর্তি দাগ দেখা যায়। হলদে, লালচে, সবুজে (তাই বলে পত্রহরিৎ নয়)—এ রকম নানা রঙের দাগ এগুলো। সাধারণভাবে এই হল ছাতা ধরা—আমরা বলি ছাতা ধরেছে। আসলে খাদ্যের উপর ছত্রাকের আক্রমণ হয়েছে আর কি। বর্ষায় জুতো ভিজে গেলে কদিন পরই জুতো-ভর্তি ছোপ ছোপ দাগ ফুটে ওঠে, এও সেই ছাতা। ভেজা জামা

কাপড়ে মসে ধরা মানে ছত্রাকের আক্রমণ। বর্ষাকালে বাঁশের গায়ে বা পচা গাছের গুঁড়িতে ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে ওঠে, আরও কত বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ গজিয়ে ওঠে। এ সবই ছাতা-গোত্রীয়। বর্ষাকাল ছাড়াও অনেক সময় গাছের ডালে দেখা যায় বেশ বড় আকারের, নানান মাপের, নানান রকমের সব ছাতার। মানুষের শরীরও ছাতার আক্রমণের হাত থেকে নিস্তার পায় না। মানুষের গায়ের দাদ আসলে এক রকমের ছাতাজাতীয় উদ্ভিদ।

সাধারণভাবে ছত্রাকের শরীর গড়ে ওঠে একপ্রকার খুব সরু সুতোর মত অতি সূক্ষ্ম জিনিস দিয়ে। একে বলে মাইসেলিয়াম (Mycelium)। মাইসেলিয়াম দেখতে সাদা বা সামান্য বাদামি রঙের। এর ভিতরে ক্লোরোফিলের দেখা মেলে না বটে, কিন্তু কিছু-কিছু ছত্রাকের চেহারা হয় রঙিন—হলদে, কমলা, লাল, নীল বা সবুজ। বিভিন্ন রকমের রঞ্জক কণার (Pigments) জন্যেই এদের এত সব আলাদা রঙ। আমাদের পক্ষে উপকারী অথবা অপকারী, দু-ধরনের ছত্রাকের দেখাই আমরা পাই। উপকারও যেমন করে এরা, নানাভাবে অপকারেও তেমনি এরা পটু। উপকার করে, এমন কয়েকটি ছত্রাকের পরিচয়ই প্রথম দেওয়া যাক, পরে অপকারীদের চেনা যাবে।

উপকারী ছত্রাক

রুটি বিস্কুট তৈরির কারখানায় একরকম ছত্রাকের বিশেষ প্রয়োজন। সে ছত্রাকের নাম ঈস্ট (Yeast)। চেহারা সাধারণ গোল অথবা ডিমের আকৃতি। একটি মাত্র কোষ দিয়েই এদের দেহ সম্পূর্ণ। দেহ এদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র, যে খালি চোখে দেখাই যায় না, দেখতে গেলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য

দরকার। প্রত্যেক ঈস্টের গা থেকে কুঁড়ির আকারে কোষের সৃষ্টি হয়। ক্রমে তা যেমন বড় হতে থাকে, তেমনি সংখ্যায়ও বাড়তে থাকে। তারপর এই কুঁড়ি-কোষগুলো প্রধান কোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে নতুন উদ্ভিদের মত ব্যবহার করে এবং তারাও একসময় নতুনভাবে বংশবৃদ্ধি করে যেতে পারে একই উপায়ে। ঈস্টের বংশবৃদ্ধির অবশ্য আরও পন্থা আছে।

ঈস্টের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। শর্করাকে অ্যালকোহল (Alcohol) ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিবর্তিত করে ঈস্ট। এজন্যে রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি শিল্পে এর পর্যাপ্ত ব্যবহার রয়েছে। রুটি তৈরির জন্যে ময়দার লেচি ও চিনির সঙ্গে ঈস্টের গুঁড়ো কিম্বা ঈস্ট থেকে প্রস্তুত মদ (যেমন, তাড়ি) মিশিয়ে দেওয়া হয়। পরে যখন সেই লেচিগুলো আগুনের আঁচে দেওয়া হয় তখন ঈস্টের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং চিনিকে অ্যালকোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে ভেঙে দেয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড সেখানে আবদ্ধ থাকে না, বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। ফলে লেচিগুলো ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে ওঠে। এজন্যেই অসংখ্য ছেঁদার দেখা পাই আমরা পাঁউরুটিতে। ঈস্টের তৎপরতায় প্রস্তুত অ্যালকোহল কিন্তু রুটিতে থাকে না—উনুনের তাপে তা নষ্ট হয়ে যায়। কখনো-কখনো যে পাঁউরুটির স্বাদ টক মতন লাগে তার কারণ পরিমাণের চাইতে বেশি ঈস্টের সংযোগ। জিলিপির প্যাঁচের মধ্যটা কেমন ফাঁকা আর রস ঢুকে কেমন লোভনীয় হয়ে থাকে! ফাঁপা হওয়ার মূলে আছে ঈস্টেরই ক্রিয়া।

খেজুর রস, মদ বা তাড়িতে পরিবর্তিত হয় ঈস্টের কার্যকলাপে। মদ তৈরির কারখানায় ঈস্ট এক মূল্যবান সামগ্রী। ঈস্ট থেকে পাওয়া যায় মূল্যবান ভিটামিন বি-টু (B_2) বা রিবোফ্লাভিন। আমাদের দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে এই ভিটামিনটির একান্ত প্রয়োজন।

পেনিসিলিন ও ছত্রাক থেকে পাওয়া

কমলালেবু, লেবু বা ঐ জাতীয় ফলের গায়ে নীল বা হালকা-সবুজ রঙের এক ধরনের ছোপ-ছোপ দাগ দেখা যায়। হাত দিলে পাউডারের মত গুঁড়ো লেগে যায় হাতে। এগুলো আর-এক রকমের ছত্রাক। আর যেগুলো পাউডারের মত গুঁড়ো, সেগুলো হল লক্ষ লক্ষ রেণু (Spore)। আরও একটি করে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হতে পারে প্রতিটি রেণু থেকে। এদের দেহের গঠন ঈস্টের মত ততটা সরল নয়। অনেকগুলো সূক্ষ্ম সুতোর মত জিনিসের সমষ্টি নিয়ে এদের দেহ, যার নাম মাইসেলিয়াম। মাইসেলিয়ামের মাথায় জন্মায় অসংখ্য রেণু। এই জাতের ছত্রাকের মধ্যেই পাওয়া গেছে মূল্যবান এক ওষুধ। এ ওষুধের রোগপ্রতিষেধ-ক্ষমতা অসীম। এর নাম পেনিসিলিন। যে ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন তৈরি হয় সে ছত্রাকের নাম পেনিসিলিয়াম (Penicillium)। পেনিসিলিয়াম জাতের কিছু ছত্রাক থেকে উৎপন্ন ক্ষরণ রস থেকেই তৈরি হয় পেনিসিলিন। জীবাণু ধ্বংসের অদ্ভুত ক্ষমতার জন্যে একে বলা হয় 'বিস্ময়কর ওষুধ'। বহু রকমের আবিষ্কারের মত পেনিসিলিনের আবিষ্কারও একটি আকস্মিক ঘটনা। আলেকজান্দার ফ্লেমিং নামে এক জীবাণু-বিশেষজ্ঞ কিছু জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। সেটা ১৯২৯ সালের কথা। হঠাৎ এক সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে, এক ধরনের ছাতার কতগুলি জীবাণু-বৃদ্ধি রোধ করার ক্ষমতা আছে। পরীক্ষায় দেখা গেল, সেগুলো লেবু বা কমলালেবুর গায়ে জন্মানো ছাতার সমগোত্রের। কিন্তু সে সময় তা নিয়ে তেমন কিছু কাজ আর হয় নি। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে নতুন করে এদিকে নজর পড়ল আর-এক বৈজ্ঞানিকের। তাঁর নাম ডঃ হাওয়ার্ড ফ্লোরি। ফ্লেমিং, ফ্লোরি ও চেন—এই তিন বৈজ্ঞানিকের মিলিত প্রচেষ্টা সৃষ্টি করল এক ইতিহাস। আবিষ্কৃত হল পেনিসিলিন। নোবেল পুরস্কারের

মাধ্যমে পরবর্তীকালে এঁরা তিনজনে একত্রে সম্মান লাভ করেছেন।

পেনিসিলিনের কার্যকারিতা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের অনুপ্রাণিত করল এবং নতুন করে সন্ধান চলল, আরও কী বিস্ময় লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বার করার। পাওয়া গেল স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin)। ক্রমে আরও নতুন সব ওষুধের সন্ধান পাওয়া গেল জীবাণু ও ছত্রাক থেকে। এদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে অরিওমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন, টেরামাইসিন এবং খুব সাম্প্রতিক কালের এরিথ্রোমাইসিন ও টেট্রাসাইক্লিনের।

অন্যান্য ধরনের ছত্রাক

এক ধরনের ছত্রাক আছে যাকে উল্লেখ করা হয় আরগট (Ergot) বলে। এ জাতীয় ছত্রাক শস্যের দানায় এসে বাসা বাঁধে। এ থেকে অনেক রকম দামি ওষুধ তৈরি হয়। আমাদের বাংলাদেশেও সরকারি ব্যবস্থায় এর চাষ হয় হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে।

ছত্রাকের এই ধরনের উপকারিতার পাশেই আছে এদের ক্ষতি করার অদ্ভুত ক্ষমতার ফিরিস্তি। খাদ্য শস্য নষ্ট করে বিপুল অর্থক্ষতি করে এরা। তাই খাবারে অভাব ঘটিয়ে, ভিক্ষের মুখেও ঠেলে দেবার ক্ষমতা আছে এইসব ছোট ছোট ছত্রাকের। ক্ষতির পরিমাণে আতঙ্কিত হয়ে বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করছেন কিভাবে ছত্রাকের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানো যায় প্রয়োজনীয় গাছপালাকে। অনেক রকমের ওষুধ বিষুধের আবিষ্কারও হয়েছে। তাহলেও পুরো সফলতা আসেনি, কেননা আজও দেশে বিদেশে ছত্রাক থেকে ক্ষতির পরিমাণ কমলেও, একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি।

বিপদজনক এক ছত্রাকের আক্রমণে গত শতাব্দীতে আয়ারল্যাণ্ডে সমস্ত আলুর ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আলু অন্যতম প্রধান খাদ্য হওয়ার দরুন দেশ পড়েছিল দুর্ভিক্ষের কবলে।

আমাদের ক্ষেতের ফসলের যে নানারকম রোগ হয় তার বেশির ভাগই হয় নানান ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে। ধান, গম, যব, আখ, তামাক, চা প্রভৃতি সমস্ত রকম গাছই এদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেঁচে থাকার জন্যে ছত্রাক সাধারণত আশ্রয় নেয় পাতায়, শেকড়ে এবং দানায়। প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য পেয়ে এরা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে এবং ক্রমে আশ্রয়দাতার খাদ্যে টান পড়িয়ে দিয়ে তাদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়।

গুরুতর ধরনের যে রোগ ছত্রাকেরা সৃষ্টি করে কৃষকের চিন্তার কারণ ঘটায় তার মধ্যে খাদ্যশস্যের রোগই প্রধান। এইসব রোগে কী বিপুল অর্থক্ষতিই না আমাদের সহ্য করতে হয়! পৃথিবীর সব শস্যক্ষেত্রেই যেসব ছত্রাক হামেশাই শস্যকে রোগাক্রান্ত করে তোলে তার মধ্যে রাস্ট (Rust) নামের রোগই সমধিক পরিচিত। এদের জীবনযাত্রা বেশ জটিল ধরনের। এ রকম একটি রাস্টের জীবন-বৃত্তান্ত শুনলে বুঝতে পারবে আমাদের চোখের আড়ালে ছোট-ছোট উদ্ভিদের জীবনযাত্রা কিভাবে চলেছে।

মাঠ-ভর্তি সবুজ সতেজ ফসল। হঠাৎ একদিন রোগাক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল ডালে আর পাতায়। গমের গাছে এসে এরা বসে অর্থাৎ গম গাছই এদের হোস্ট (Host)। ডালে আর পাতায় ছত্রাকের আক্রমণ প্রকাশ পেল ছোট একটু লালচে ধরনের ছিট থেকে। ক্রমে আরও অনেক ছিটে ভরে গেল পাতাগুলো। তারপর এক গাছ থেকে অন্য গাছে বিস্তার হতে থাকল ছত্রাকের।

এই ছিটগুলো অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, মাইসেলিয়ামের উপরের দিকে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য রেণুর (Uredospores), যে রেণু অন্য নীরোগ গাছের পাতায় বা ডাঁটায় পড়লে নতুন ছত্রাকের সৃষ্টি করে। ফসল যখন পাকবার মুখে এগোচ্ছে তখন ঐ একই মাইসেলিয়াম থেকে তৈরি হল আরও এক রকমের রেণু (Teliospores) যার রঙ আর চেহারা প্রথম রেণুর চাইতে আলাদা। কিন্তু মজা এই যে, নতুন তৈরি যে রেণু তা গমের গাছকে নতুন করে আক্রমণ করতে পারে না। শীতকালটা এরা কাটিয়ে দেয় ঘুমন্ত অবস্থায়, ফসলের গায়ে লেগে থেকে বা চাষের জমিতে পড়ে থেকে। বসন্ত-সমাগমে ঐ রেণু অঙ্কুরিত হয়ে তৃতীয় প্রকারের রেণু সৃষ্টি করে। এগুলো আকারে ছোট এবং হাওয়ায় ভেসে যায় দূর দূরান্তরে, বাসা বাঁধে অন্য ধরনের সবুজ পাতায়। যে গাছের পাতায় এরা বাসা বাঁধা পছন্দ করে সে গাছের নাম বার্বেরি (Barberry)। বার্বেরির পাতায় পৌঁছতে না পারলে এই বিশেষ ছত্রাকটি তার জীবনবৃত্ত শেষ করতে পারবে না। বার্বেরির পাতায় আবার একসার রেণু জন্মায় (Aeciospores)। জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এই যে রেণু তৈরি হল, এই রেণুই হাওয়ায় ভেসে যাবে দূরে, কখনো পাঁচশো মাইল দূরে, নতুন করে গম গাছের চারাকে আশ্রয় করতে। গমের গাছের পাতা থেকে খাবারের জোগান নিয়ে নতুন রেণুর জীবন-বৃত্ত শুরু করবে।

এই ছত্রাক (Puccinia) নিজের জীবনে তৈরি করছে সব-সমেত চার রকমের রেণু। আশ্রয় নিচ্ছে দু-ধরনের বিভিন্ন গাছের উপর তার জীবনবৃত্ত সম্পন্ন করতে। বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে শস্যের কী অদ্ভুত ক্ষতি করে চলেছে এরা!

গম গাছ ছাড়াও রাস্ট রোগ হয় তিসি গাছে, ভুট্টাগাছে, বীনগাছে আর কফি গাছের পাতায়। কিন্তু তাই বলে একই

রকমের ছত্রাকের আক্রমণে সেসব রোগ হয় না। ভিন্ন-ভিন্ন গাছে ভিন্ন-ভিন্ন ছত্রাকের আক্রমণেই কেবল তা হয়। সেসব ছত্রাকের জীবনবৃত্তও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়।

স্মাট (Smut) নামে পরিচিত অন্য এক রোগ একগাদা ফসলের অসুখ ঘটায়। গম, বার্লি, আখ, জোয়ার, বাজরা—এরাই সেইসব ছত্রাকের আক্রমণে কাহিল হয়। আর্থিক ক্ষতিও হয় যথেষ্ট।

স্মাট-এর আক্রমণ হয় সাধারণত গাছ যখন কচি থাকে তখন। আক্রমণের কিছুদিন পরেই দেখা দেয় পাতা ডাল আর পুষ্পমঞ্জরীতে স্ফীতি। যেমন শস্য পাকতে থাকে, ছত্রাকও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একরাশ কালো কালো রেণুর সৃষ্টি হয়। এই রেণু বাতাসে উড়ে এসে যেমন নতুন নীরোগ গাছকে আশ্রয় করে শোষণ করতে পারে, তেমনি ঘুমন্ত অবস্থায়ও বেশ কিছুকাল কাটিয়ে দিতে পারে। অনুকূল অবস্থায় অঙ্কুরিত হয়ে সৃষ্টি করতে পারে অন্যরকমের রেণু, যা হাওয়ায় ভেসে চলে যায় নতুন-বোনা ফসলের ক্ষেতে—নতুন জীবন শুরু করতে।

ব্যাঙের ছাতা

আমাদের সবচাইতে বেশি পরিচিত ছত্রাক বোধহয় ব্যাঙের ছাতা। ব্যাঙের ছাতা আমাদের দেখা দেয় প্রতি বছর বর্ষাকালে। মরা গাছের গোড়ায়, পচা-জিনিস-জমানো মাঠের কিনারায়, জঙ্গলের এখানে সেখানে বহু জায়গাতেই ব্যাঙের ছাতা একদিন মাথা তোলে গোল গোল কুঁড়ির আকারে। পরে এগুলো ছড়িয়ে ছাতার আকার নেয়। আসলে আমরা ব্যাঙের ছাতার গাছটাকে কিন্তু খুবই কম দেখতে পাই। কতগুলো চকচকে মাইসেলিয়াম দিয়ে ব্যাঙের ছাতার গাছ তৈরি। পচা কাঠ বা খড় বিচালির মধ্যে এগুলো অনেক বেশি প্রবেশ করতে পারে। এই মাইসেলিয়ামগুলো বেঁচে থাকে অনেকদিন ধরে। তারপর বর্ষায় দেখা দেয়

আমাদের পরিচিত ব্যাঙের ছাতা। এগুলো থেকে তৈরি হয় ব্যাঙের ছাতার রেণু।

ছোট বড়, সাদা বা রঙিন অনেক রকমের ব্যাঙের ছাতার দেখা আমরা পাই। হরেক রকম ব্যাঙের ছাতার মধ্যে বেশ কয়েক রকম ব্যাঙের ছাতা কিন্তু খুব সুখাদ্য। ইউরোপ, আমেরিকা ও চীনদেশে তাই রীতিমত চাষ করে ব্যাঙের ছাতার জোগান দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও পাড়াগাঁয়ে ব্যাঙের ছাতা খাওয়ার চল আছে। কলকাতার বড় আর নামী হোটেলেও ব্যাঙের ছাতার তৈরি খাদ্য অনায়াসে পাওয়া যায়। তবে, চাষ করে বাজারে বিক্রি করাটা আমাদের দেশে শুরু হয় নি এখনো।

খাবার উপযোগী ব্যাঙের ছাতা যেমন আছে নানা রকমের, তেমনি অতি বিষাক্ত ধরনের কিছুসংখ্যক ব্যাঙের ছাতাও আছে, যা খেলে মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত সম্ভব। বিষাক্ত কিম্বা বিষাক্ত নয় এ চেনবার কতগুলো উপায় আছে। বিষাক্ত নয়, একথা স্থির জানা না থাকলে কোনরকম ব্যাঙের ছাতাই খাবার লোভে রান্নাঘরে ঢোকানো উচিত হবে না।

বড় গাছের ডালে অনেক সময় ব্র্যাকেটের আকারেও ছত্রাকের দেখা আমরা পাই। এ ধরনের ছত্রাক কাঠের খুব ক্ষতি করে। মাইসেলিয়াম গাছের গভীরে ঢুকিয়ে দিয়ে খাবার গ্রহণ করে এরা; সঙ্গে সঙ্গে কাঠ নষ্ট হতে থাকে। এ ধরনের ছত্রাক বেশ কঠিন প্রকৃতির, প্রায় কাঠের মতই শক্ত; দীর্ঘ দিন গাছের গায়ে আটকে থাকে। সেখান থেকেই রেণু ছড়িয়ে নতুন ছত্রাকের জন্ম দেয়।

লাইকেন

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—এই কথাটির সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত আজকাল। রাজনৈতিক নেতাদের মুখে সহাবস্থানের কথা আমরা

প্রায়ই শুনি। কেউ বলেন পক্ষে, কেউ বা বিপক্ষে। উদ্ভিদ জগতে কিন্তু বহুকাল ধরে সহাবস্থানের নীতি মেনে চলেছে এক জাতের উদ্ভিদ, যাদের স্থান হওয়া উচিত শেওলা ও ছত্রাকের মাঝামাঝি। আসলে শেওলা ও ছত্রাকের একটি মিলিত সংস্করণই লাইকেন। মিলিত জীবন ধারণের মধ্যে যে সহযোগিতা দরকার তা তারা প্রতিদিনকার জীবনেই উভয়ে উভয়কে দান করছে।

লাইকেনের (Lichen) দেহের গঠন ছত্রাকের সূক্ষ্ম তন্তুর সঙ্গে শেওলার সবুজ কোষের সংমিশ্রণে। সবুজ কোষগুলো থাকে জায়গায় জায়গায় ছড়ানো সারা গা জুড়ে। এই গঠন-বৈচিত্র্যের জন্যে অবশ্য উভয়েই কিছু সুবিধে ভোগ করে থাকে। সবুজ ক্লোরোফিল থাকার দরুন শেওলা খাবার তৈরি করে, আর সেই খাবারের ভাগ পায় অপর পক্ষ। সুবিধে অবশ্য ছাতার দিক থেকেই বেশি। কিন্তু ছাতাও কিছু দায়িত্ব নেয় বৈকি। ছাতা সাহায্য করে শেওলাকে রক্ষা করা ও জল ধরে সঞ্চয় করে রাখার ব্যাপারে। লাইকেন জন্মায় গাছের গুঁড়িতে, পাথরের খাঁজে খাঁজে পাহাড়ের অনেক উঁচুতে, গাছ জন্মাবার সীমানা ছাড়িয়ে। লাইকেনকে বলা হয় অগ্রগামী উদ্ভিদ, কেননা লাইকেনই প্রথম এসে অন্য উদ্ভিদের আসার পথ তৈরি করে দেয়। প্রাকৃতিক কারণে যখন পাথর গুঁড়িয়ে ভেঙে পড়ে তখন সেখানে একের পর এক লাইকেনের দেহাবশেষ জমা হতে থাকে। এরাই তৈরি করে রাখে জৈব পদার্থে পরিপূর্ণ মৃত্তিকার উপাদান। এরকম অবস্থায় সেখানে অন্য উদ্ভিদ এসে বাঁচার মত পরিবেশ পেয়ে যায়।

তুন্দ্রা অঞ্চলে হরিণের খাদ্য জোগায় লাইকেন। লাইকেন খেয়েই হরিণগুলো ঐ অঞ্চলে বছরের পর বছর বেঁচে আছে।

উদ্ভিদ জগতে সহাবস্থানের উদাহরণ আরও আছে। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের উদাহরণগুলোও একই সঙ্গে এখানে রাখছি। কোন ক্ষতি না করে যখন বড় গাছের শেকড়ের মধ্যে এসে বাসা বাঁধে কোন

ছত্রাক, তাকে বলে মাইকরহাইজা (Mycorrhiza)। বড় গাছের উপকার কী ধরনের হয় সেটা সব সময় বোঝা না গেলেও আন্দাজ করা হয়; জল টানার ব্যাপারে শেকড়কে সাহায্য করতে পারে এরা। আর কিছু পরিমাণে নাইট্রোজেন-জাতীয় খাদ্য সংগ্রহেও এরা সাহায্য করে। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে যে, ছত্রাকের অনুপস্থিতিতে বড় গাছ ঠিকমত অঙ্কুরোদ্গম করে না, যেমন দেখা যায় সাধারণ সবুজ অর্কিডের বেলায়। এ থেকে অনুমান করা হয়, হয়ত একেবারে শিশুকালে অর্কিড কিছুটা পুষ্টি ছত্রাকের সহযোগিতায়ই আহরণ করে থাকবে।

মটর-জাতীয় গাছের গোড়ায় এবং শেকড়ে ছোট ছোট দানার আকারে জীবাণুর অবস্থানের কথা আগেই বলেছি। এই জীবাণুদের ক্ষমতা আছে বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে তা থেকে মটর-জাতীয় গাছদের অ্যামিনো কম্পাউণ্ড (Amino compound) সরবরাহ করার। কিন্তু একক ভাবে জীবাণুর বা মটর-জাতীয় গাছের কারোরই ক্ষমতা নেই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করার। মটর-জাতীয় গাছ যখন খুব ছোট থাকে তখন এই বিশেষ গুণসম্পন্ন জীবাণু মাটির মধ্যেকার শেকড়ে এসে বাসা বাঁধে। পরে সংখ্যায় বেড়ে বেড়ে শেকড়ময় দানার আকারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এরা। একটি মজাদার পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মাটিকে জীবাণুমুক্ত করে যদি মটর-জাতীয় গাছ লাগানো হয় তবে সেসব গাছ স্বাভাবিক ভাবে বাড়তে পারে না। তাই বলছিলাম উদ্ভিদরাজ্যে সহাবস্থানের সুন্দর ব্যবস্থার কথা; জীবাণু এনে দিচ্ছে সবুজ গাছের পক্ষে মূল্যবান নাইট্রোজেন আর পরিবর্তে পাচ্ছে সবুজ গাছের তৈরি-করা অন্যান্য খাদ্য। অথচ কেউ কাউকে ক্ষতি করছে না।

উদ্ভিদ জগতের এমন সব বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় হল যাদের দিকে সহজে আমাদের নজর পড়ে না। উদ্ভিদ বললেই যে

চেহারাটা আমাদের চোখে ভাসে তার সঙ্গে এইসব শেওলা, ছত্রাক প্রভৃতির কতই না তফাত! এদের না আছে শেকড়, না আছে ডালপালা বা পাতা। এদের ফুল ফোটে না, ফল ধরে না, বীজেরও সৃষ্টি হয় না। তাই এরা নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ।

মস্ আর ফার্ন

ফুল ফোটে এমন সব গাছ, আর শেওলা ছত্রাকের মাঝে আছে মস্ (Moss) এবং ফার্ন (Fern) জাতের গাছ। শেওলা ও ছত্রাকের চাইতে মস্ এবং ফার্ন অনেক উন্নত ধরনের উদ্ভিদ। এদের বংশ-বিস্তারের পদ্ধতিও শেওলা বা ছত্রাকের মত ততটা সহজ সরল নয়, মোটামুটি বেশ জটিল ধরনেরই। সম্ভবত ডাঙায় বাস করবার ক্ষমতাও মস্ই প্রথম অর্জন করে, অবশ্য জলে বাস করে এমন সদস্যও ওদের দলে আছে।

মস্ এবং ফার্নের রঙ সবুজ, কাজেই আন্দাজ করতে পারবে, খাদ্য-প্রস্তুতির ব্যাপারে এরা স্বাধীন। এককালে হয়ত পৃথিবীতে মস্ আর ফার্ন-জাতীয় গাছেরই প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন সবুজ গাছপালা, যারা আজকের মস্ বা ফার্নের পূর্বপুরুষ, তারাই জমা করে রেখেছিল সেই সুদূর অতীতের সৌরশক্তি। এই শক্তিকেই আমরা আজও কাজে লাগাচ্ছি যখনই কয়লা বা তেল পোড়াচ্ছি নানা কাজের জন্যে।

একটা জীর্ণ জমিদার-বাড়ি দেখে আন্দাজ করা যাবে না সে বাড়ির অতীত কালের ঐতিহ্য, তার মহিমা বা গরিমা। তেমনি আজকের দেখা কয়েক ধরনের ফার্ন থেকেও তাই আন্দাজ করা শক্ত, লক্ষ-লক্ষ বছর আগে কী অদ্ভুত প্রাচুর্যে ভরা ছিল সেদিনকার ধরাপৃষ্ঠ।

সেদিন যেমন ছিল ছোট জাতের ফার্ন, তেমনি ছিল ৩০।৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের অজস্র গাছ। আগেই বলেছি, আজকের কয়লা সবই

সেই অতীত কালের ফার্ন গাছের দেহাবশেষ। বনভূমি, জলা জায়গা কী পরিমাণ ফার্নের গাছে ঢাকা ছিল, তার আন্দাজ হবে যদি কী পরিমাণ গাছ থেকে কী পরিমাণ কয়লা সৃষ্টি হয় তার উল্লেখ করি। হিসেবে দেখা গেছে, ৩০০ ফুট চাপ-বাঁধা উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় মাত্র ২০ ফুট আয়তনের কয়লা। তাহলে আন্দাজ কর, কী পরিমাণ গাছ সেদিন ছিল!

মস্ ও ফার্ন অপুষ্পক হলেও উন্নত ধরনের গাছ,—অপুষ্পক শেওলা আর ছত্রাকের তুলনায় অবশ্য। এদের চেহারা অনেকাংশে আমাদের চেনা উন্নত ধরনের গাছেরই মত। মসের শেকড় উন্নত নয়, এদের পাতা আছে, কাণ্ডও আছে।

ফার্নের শেকড় বের হয় মাটির তলায় অবস্থিত তাদের কাণ্ড (Rhizome) থেকে। ফার্নের পাতা বেশ বড় বড়। কাণ্ড সাধারণত থাকে মাটির তলায়, কখনো-কখনো মাটির উপরে। লম্বা কাণ্ডও দেখা দেখা যায় ট্রি ফার্ন (Tree fern) নামে একজাতীয় ফার্নে।

মস্ এবং ফার্ন থেকেই আমরা আধুনিক বীজযুক্ত উদ্ভিদে বীজ সৃষ্টির প্রণালী আন্দাজ করতে পারি। সে ধরনের গাছই আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি।

ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা ঝরল যত
তারা আজ কেঁদে শুধায়, 'সেই ডালে ফুল ফুটল কি গো,
ওগো কও ফুটল কত।'

সারা বছর কর্মব্যস্ততায় কাটাবার পর বসন্তের সমাগমে আসে পাতার ঝরে যাবার সময়। প্রচুর খাদ্য কোষে কোষে মজুত রেখে ভবিষ্যতের ভাবনা কমিয়ে পাতা ঝরে যায়। ডালে ডালে উঁকি মারে ফুলের কুঁড়ি।

ফুল

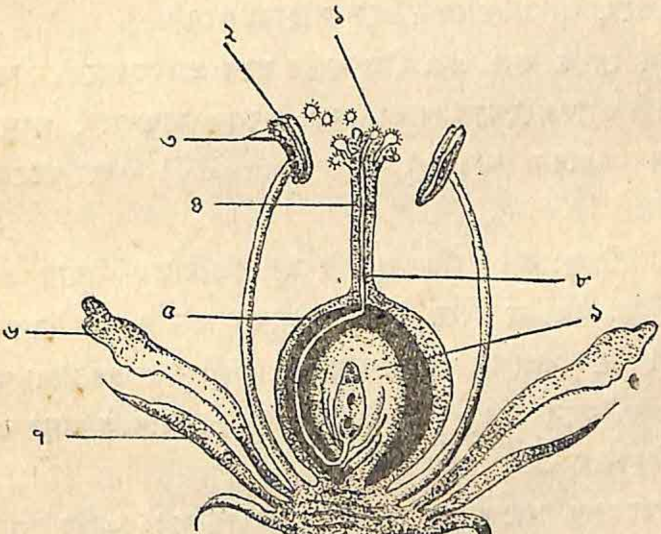
ফুল প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৌন্দর্যমণ্ডিত সৃষ্টি। ফুলের রূপে, বর্ণে ও গন্ধে আমরা কী অদ্ভুতভাবেই না আকৃষ্ট হই! কিন্তু যে গাছ সে ফুল ফোটায় তাদের কাছে ফুল হল প্রতিরূপ সৃষ্টির আধার। শুকনো পাতা তাই আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, যে ডালে তারা পরিশ্রম করে ফুল ফোটাবার, ফল ধরাবার আয়োজন রেখে এসেছে তা সফলতার দিকে কতখানি এগিয়েছে? ফুল ফুটলেই তাদের শ্রম সার্থক হবে, সৃষ্টি থাকবে অব্যাহত। ভবিষ্যত বংশের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসেই ফোটে ফুল। মাত্র কদিনের জীবনে অদ্ভুত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধান করে তারা বিদায় নেয়।

ফুল ফোটে, ফুল ঝরে যায়। সৃষ্টি হয় ফল আর বীজের, যে বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয় আর একটি নব জীবন। সৃষ্টির ধারাকে বয়ে নিয়ে চলে বংশপরম্পরায়।

ফুল আসলে একটি শাখার পরিবর্তিত রূপ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এখানে পাতা অদ্ভুতভাবে রূপান্তরিত হয় ফুলের বিভিন্ন অংশ সৃষ্টিতে। ফুলের রকম-ফেরের আর শেষ নেই! রঙে, নক্সায়, সুগন্ধে বৈচিত্র্যের নেই কোন অভাব। কিন্তু মিল আছে

এক জায়গায়। প্রতিরূপ সৃষ্টির জন্যে যে অংশের প্রয়োজন তা আছে সবকটি ফুলে, কখনো একত্রে একই ফুলে, কখনো ভিন্ন-ভিন্ন ফুলে।

জবা, গোলাপ, বেল, যুঁই, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি ফুলকে বলা হয় আদর্শ ফুল। কেননা, ফুলের যে অংশকটি আছে তার প্রতিটি অংশই দেখা যায় এইসব ফুলে। এই ধরনের ফুলে থাকে চারটি বিভিন্ন অংশ। প্রতিটি অংশকে এক-একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার বহন করতে হচ্ছে। একটি বোঁটার উপর স্তরে স্তরে সাজানো থাকে ফুলের অংশগুলো। একেবারে বাইরের দিকে যে অংশ তার রঙ সবুজ,



(১) মুণ্ড (২) পরাগকোষ (৩) পরাগ (৪) দণ্ড (৫) বীজকোষ (৬) পাপড়ি (৭) বৃত্যংশ (৮) পরাগমিলন নল (৯) ডিম্বক (১০) পুষ্পাধার (১১) পুষ্পদণ্ড

ছোট পাতার মতই চেহারা। এর নাম বৃতি (Calyx)। আলাদা-ভাবে একটিকে বলে বৃত্যংশ (Sepal)। বৃতির কাজ কুঁড়ি

অবস্থায় অন্যান্য অংশকে রক্ষা করা। ফোটা অবস্থায় ফুলকে ধরে রাখার কাজও বৃতির।

এর পরেই আছে ফুলের রঙিন অংশ, পাপড়ির থাক। প্রতিটি পাপড়িকে বলে দল (Petal), আর একসঙ্গে সবগুলোকে বলে দলচক্র (Corolla)। পাপড়ির রঙে আকৃষ্ট হয়েই কীট পতঙ্গ ফুলের দিকে এগিয়ে আসে। পাপড়ির রঙ সর্বদাই রঙিন হবে এখন কোন কথা নেই। অনেক ফুলেই আমরা সাদা পাপড়ি দেখতে পাই। বৃতি ও দল— এই যে ছুটি অংশের কথা বলা হল এ ছুটি অংশ ফুলের প্রতিরূপ সৃষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় অংশ নয়। তবে, পরোক্ষভাবে সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

ফুল থেকে ফল এবং বীজ সৃষ্টির জন্যে প্রত্যক্ষভাবে যে অংশ-ছুটি দায়ী তাদের দেখতে পাওয়া যায় ফুলের মাঝখানে, পাপড়ির ভিতরে। এদের নাম পুংকেশর (Stamen) এবং গর্ভকেশর (Carpel)

প্রতিটি পুংকেশর সরু সুতোর মত জিনিসের মাথায় একটি দানার মত জিনিস দিয়ে তৈরি। মাথার দানার রঙ সাধারণত হলদে। একে বলা হয় পরাগকোষ (Anther)। এর মধ্যে থাকে পরাগ বা ফুলের রেণু (Pollen grain)। আসলে রেণুর রঙেই পরাগকোষকে রঙিন দেখায়।

গর্ভকেশর থাকে ফুলের ঠিক মধ্যস্থলে। এটির চেহারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মাথাটা দানার মত আর আঠালো, নাম মুণ্ড (Stigma)। তার তলাতেই থাকে সরু সুতোর মত একটা ডাঁটা, যার তলার দিকটা বেশ স্ফীত ; এই স্ফীত অংশের নাম বীজকোষ বা বীজাধার (Ovary)। মুণ্ড ও বীজকোষকে সংযুক্ত করছে যে সরু ডাঁটার মত অংশ তার নাম দণ্ড (Style)। বীজাধারের মধ্যে থাকে এক বা একাধিক ডিম্বক (Ovule), যা পরে রূপান্তরিত হয় বীজে।

একটি ফুলে যখন এই চারটি অংশই (বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর) থাকে তখন সে ফুলকে বলে সম্পূর্ণ ফুল, আর যখন চারটির যে-কোন একটি বা দুটি অংশ অনুপস্থিত তখন সে ফুলকে বলে অসম্পূর্ণ।

একলিঙ্গ ফুলগুলো অসম্পূর্ণ। একটি ফুলে কেবলমাত্র পুংকেশর বা কেবলমাত্র গর্ভকেশর থাকলে সে ফুল একলিঙ্গ ফুল (Unisexual) নামে অভিহিত হয়। মজা এই যে, একলিঙ্গ ফুল কখনো ফোটে একই গাছে—যেমন লাউ, কুমড়ো, ভূট্টা, রেড়ি ইত্যাদি, আবার কখনো কখনো দু-রকমের ফুল ফোটে দু-রকম গাছে, যেমন পেঁপে, তুঁত, কয়েক ধরনের পাম ইত্যাদি।

ফুল থেকে কী করে ফল হয়

ফুল থেকে ফল হয়। আমরা দেখি একটি ফুল ফুটল, কদিন পরে ফুলের পাপড়িগুলো শুকিয়ে খসে পড়ল, আরও কদিন পরে দেখা দিল একটি ফল। আমাদের চোখের আড়ালে, ফুল থেকে ফল হবার মাঝে কী কী ঘটনা ঘটে তার খোঁজ নেওরা যাক একটু।

পুংকেশরের পরাগ যতক্ষণ না সমজাতীয় ফুলের গর্ভমুণ্ডে (Stigma) এসে পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফুল থেকে ফল হওয়ার আশা দুরাশা। ফুলের রেণু যখন পেকে ওঠে তখন পরাগকোষ ফেটে গিয়ে পরাগ বাইরের আবহাওয়ায় চলে আসে, মিশে যায় জলে, হাওয়ায়, কীট-পতঙ্গের পাখায় ডানায়। ফুল থেকে বিচ্যুত হয়েও এই পরাগগুলো জীবন্ত থাকে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে পারিপার্শ্বিক জল হাওয়া বা কীট পতঙ্গের উপর নির্ভর করে পরাগকে পৌঁছতে হবে গর্ভমুণ্ডে। পরাগের গর্ভমুণ্ডে এসে পৌঁছনোর নাম 'পরাগ সংযোগ' (Pollination)।

পরাগসংযোগ সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে ফুলে ফুলে কত রকম অদ্ভুত আর সুন্দর ব্যবস্থাই না প্রকৃতি করে রেখেছে! তাতেই আন্দাজ করা সম্ভব, কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এই পরাগসংযোগের কাজ। প্রশ্ন করতে পার, পরাগ তো পরাগকোষ থেকে বের হয়ে সোজা গর্ভমুণ্ডে এসে পড়তে পারে! এত সোজা ব্যবস্থা থাকতে ভাবনাই বা কী, আর বিশেষ ব্যবস্থারই বা কী প্রয়োজন? কিছুসংখ্যক ফুলে এই সোজা উপায়েই ফলের জন্ম হয়, এটা ঠিকই। একই ফুলের পরাগ গর্ভমুণ্ডে পড়েও যাতে কার্যকরী না হতে পারে সে ব্যবস্থাও প্রকৃতি করে রেখেছে। কেননা, প্রকৃতি জানে ভাল ফল পেতে গেলে এক ফুলের পরাগ সমজাতীয় অন্য ফুলের গর্ভ-দণ্ডে এসে (Cross Pollination) পৌঁছনো দরকার। সেজন্যেই যত কিছু কারসাজি। 'ক্রস পলিনেশনে' সব সময়ই বাইরের কোন প্রতিনিধির প্রয়োজন; তা জল, হাওয়া বা কীট-পতঙ্গ যাই হোক না কেন।

ছোট কীট পতঙ্গের সাহায্যে পরাগ-সংযোগ তো অতি সাধারণ ঘটনা। যে সব ফুলে কীট পতঙ্গ এসে হাজির হয় সেফুলের চেহারা হয় অতি বাহারী; সুন্দর জ্বলজ্বলে রঙে রাঙানো থাকে, হয় পাপড়ি, নয় তো ফুলের অন্য কোন অংশ। রূপের কদর করতে ছোট পোকা-মাকড়রাও জানে। কিম্বা বিজ্ঞাপন যেভাবে খদ্দের আকর্ষণ করে এও অনেকটা তেমনি। শিমুল, পলাশ, লাল পাতা বা বাগানবিলাসের তীব্র চটকদার রঙ থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকা কি সম্ভব! কীট পতঙ্গ এসে ফুলে বসে খোঁজ চালায় খাদ্যসামগ্রীর। খাদ্য পাক বা না পাক, পরাগ-সংযোগের কাজ এই খোঁজাখুঁজির মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এক ফুলের পরাগ সারা গায়ে মেখে যখন অন্য ফুলে গিয়ে পৌঁছল কোন কীট, তখন তার গা থেকে পরাগ এসে পৌঁছল অন্য সমজাতীয় ফুলের গর্ভমুণ্ডে। তারপর সেখানকার চটচটে আঠায় আটকে গেল সে পরাগ।

তবে, এ ধারণা যেন কারো না হয় যে গোলাপ ফুলের পরাগ শিমুল ফুলের গর্ভমুণ্ডে এসে পৌঁছলে সফল পরাগ-সংযোগ হবে। সেরকম হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। পরাগ-সংযোগ তখনই সফল হবে যখন গোলাপ ফুলের পরাগ গোলাপ ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে এসে পৌঁছতে পারবে। তেমনি শিমুল ফুলের পরাগ শিমুল ফুলের গর্ভমুণ্ডেই পৌঁছনো চাই।

পোকা-মাকড়কে আকর্ষণ করার জন্য ফুলে অনেক সময়ই থাকে মধুভাণ্ড। ফুলের তলার দিকে এক ধরনের গ্রন্থি থাকে, যা থেকে মধু নির্গত হয়ে ফুলের বুকে জমা থাকে। মিষ্টি মধুর লোভে যখন মৌমাছি বা প্রজাপতি ছুটে আসে তখন তাদের সমস্ত গায়ে মাথায় পরাগ-রেণু মাখামাখি হয়ে যায়। তারপর তারা যেমন ছোটে অন্য ফুলে পরাগ-সংযোগও হতে থাকে একে-একে।

সুগন্ধ ছড়িয়েও ফুল কখনো কখনো কীট পতঙ্গদের নির্দেশ জানায়। একবার কীট পতঙ্গরা এসে পৌঁছলেই তো তাদের অজান্তে ফুল তার বিশেষ কাজটি সফল করিয়ে নেয়। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার যে, যে সমস্ত ফুল রাতে ফোটে—যেমন, বেল, যুঁই, হাসনাহানা, শিউলি—তাদের সুগন্ধের সাহায্যেই কীট পতঙ্গ ফুলের হদিশ পায়। রাত্রে-ফোটা ফুলের আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে, রঙিন না হয়ে প্রায়ই এগুলো হয় সাদা। অল্প আলোয় যাতে কাছে পৌঁছতে কীট পতঙ্গের কোন অসুবিধে না হয় সেজন্যেই এ ব্যবস্থা।

মাঝে মাঝে আমরা এমন ফুলেরও দেখা পাই যার অদ্ভুত বিশ্রী গন্ধে আমাদের প্রাণ বের হয়ে যেতে চায় আর কি! আমাদের কাছে বিশ্রী হলে কী হবে, নানান ধরনের পোকা কিন্তু এই 'দুর্গন্ধে' আত্মহারা হয়ে ছুটে আসে সে সব ফুলের কাছে। কচু কিম্বা ওলের ফুল যখন ফোটে তখন আমরা তাদের দুর্গন্ধ আন্দাজ করতে পারি; পোকাদের কাছে কিন্তু সে গন্ধের বার্তা ভিন্ন।

রূপে, গন্ধে বা মধুর লোভে আকৃষ্ট হয়ে যে অনেক কীট পতঙ্গ পরাগ-সংযোগে সাহায্য করবে সেটা তেমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। কিন্তু রূপহীন, গন্ধহীন ফুলের সংখ্যাও তো কম নয়; মধুর সঞ্চয় নেই এমন ফুলও তো কত রয়েছে। তাদের পরাগ-সংযোগের জন্যে নির্ভর করতে হয় অবশ্য বাতাসের উপর। যেসব ফুল বাতাসের উপর পরাগ-সংযোগের জন্যে নির্ভর করে সেসব ফুলে পরাগ সৃষ্টি হয় অনেক বেশি মাত্রায়, আর পরাগগুলোও হয় খুব হাল্‌কা। প্রকৃতি জানে যে বাইরের প্রতিনিধির উপর যখন একটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তখন দু-একটি পরাগ রওনা হয়ে আসল জায়গায় পৌঁছতে নাও পারে। পরাগ অনেক থাকলে, অন্তত একটিও যদি পৌঁছে যায় ঠিক-ঠিক তাহলেই সম্ভব হবে সেই বিশেষ গাছের সৃষ্টিরক্ষা। তাই অজস্র পরাগ নষ্ট করার ভিতর দিয়েই একটি সার্থক সৃষ্টির আশায় প্রকৃতির এই অপব্যয়। কখনো কখনো-পরাগ এত বেশি হয় যে গাছের নিচের মাটি ঢাকা পড়ে যায় পরাগে পরাগে।

জলের স্রোতের সাহায্যেও কিছুসংখ্যক জলজ উদ্ভিদের পরাগ-সংযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যদিও জলের সাহায্যটা এ ব্যাপারে পুরো মাত্রায় প্রত্যক্ষ নয়।

পাতা শেওলার (Vallisnaria) দেখা পাওয়া যায় যে-কোন বিলে বা পুকুরে। এদের পরাগ-সংযোগ ক্রিয়াটি একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পাতা শেওলার ফুল একলিঙ্গ। শুধু তাই নয়। দুটি ভিন্ন গাছে দুটি ভিন্ন ধরনের ফুল ফোটে; এর একটিতে থাকে স্ত্রী-ফুল। সংখ্যায় এরা কম। অন্য গাছে পুরুষ-ফুল ফোটে একটি মঞ্জরীর মধ্যে। সংখ্যায় এরা অনেকগুলো।

পুরুষ ফুল এক সময় মঞ্জরী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে ওঠে জলের উপরে। এগুলি যাতে ভাসতে পারে তার ব্যবস্থাও তাই থাকে। স্ত্রী-ফুল সাধারণত গাছের তলার দিকে অর্থাৎ জলের

নিচে থাকলেও যখন পরিণত হয় তখন বোঁটাটিকে প্রসারিত করে ভেসে আসে জলের উপরে। এরপর স্রোতের টানে স্ত্রী-ফুলের গর্ভমুণ্ডে এসে ঠেকে পুরুষ-ফুলের পরাগ। এমনিভাবে পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন হয়ে যায়। স্ত্রী-ফুল এবার বোঁটা গুটিয়ে ফল সৃষ্টি করতে আবার জলের তলায় নেমে যায়।

জলজ উদ্ভিদ হলেই যে পরাগ-সংযোগের জন্যে জলের উপর নির্ভর করতে হবে এমন কোন কথা নেই। বেশির ভাগ জলজ উদ্ভিদই, যাদের আছে বর্ণবৈচিত্র্য, সুগন্ধ বা মধুর সঞ্চয়, তারা পরাগ-সংযোগ ঘটায় কীট পতঙ্গের সাহায্যেই।

যে-কোন উপায়েই হোক, ফুলের পরাগ সৃষ্টি ও গর্ভমুণ্ডের সঙ্গে তার সংযোগ—এ-ই হল ফল-সৃষ্টির অর্ধেক কাজ। বাকি-অর্ধেক কাজের জন্যে দায়ী ডিম্বক (Ovule), যা বীজ-কোষের মধ্যে ফুল ফোটার দিন থেকেই তৈরি হতে থাকে। পরাগ যখন গর্ভমুণ্ডে পৌঁছে অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন একটি নলের সৃষ্টি করে। এ নল ফুলের ডিম্বকের মধ্যে অবস্থিত ভ্রূণস্থলীর (Embryo sac) কাছে এসে পৌঁছয়। এই নলের মধ্য দিয়ে পরাগের পুংজনন কোষ (Male nuclei) এসে মিলিত হয় ভ্রূণস্থলীর স্ত্রীজনন কোষের সঙ্গে (Egg cell)। এই প্রক্রিয়ার নাম নিষিক্তকরণ (Fertilization)।

নিষিক্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় ফুলের কর্তব্য। বৃতি আর পাপড়ি শুকিয়ে ঝরে যায়। কখনো ফলের সঙ্গে লেগেও থাকে। পুংকেশরও শুকিয়ে যায়, শুধু থাকে বীজকোষ ও গর্ভকেশর। বীজকোষের মধ্যে তৈরি হয় বীজ আর বীজকোষ পরিণত হয় ফলে। ফল পাকে। বীজ ছড়িয়ে পড়ে ফলের ভিতর থেকে। এ বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে একটি শিশু গাছ, যা অনুকূল পরিবেশে নতুন গাছ সৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে।

আমরা দেখেছি, সবুজ রঙের উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের কী অদ্ভুত ক্ষমতা। কেমন সুন্দর খাদ্য সরবরাহ পেয়ে যাচ্ছে এরা মাটির নিচের রস থেকে আর বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে। নিশ্চিন্ত হয়ে আছে খাদ্যসম্ভার জমা করে। ফুল ফুটছে, ফল ধরছে, বীজের জন্ম হচ্ছে। আবার একটি শিশু গাছ থেকে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে খাবার তৈরির, ফুল ফোটানোর আর ফল ধরানোর।

আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার জীবন হয়ত উদ্ভিদের, কিন্তু বেঁচে থাকার সংগ্রামে উদ্ভিদ জগতের বাসিন্দাদেরও লড়তে হচ্ছে অনবরত। তার প্রধান কারণ, সমগ্র প্রাণীজগত, হয় প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ জগতের উপরে খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারে পুরো নির্ভরশীল। আত্মরক্ষা করতে না পারলে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে একদিন উদ্ভিদকে। বেঁচে থাকার সংগ্রামে তাই উদ্ভিদ জগতও প্রাণী-জগতের মতই সমান অংশীদার। সে সংগ্রামে তারা যে জয়ী হয়েছে, পর্যাপ্ত গাছ পালায় ভরা বন জঙ্গলই তার নিদর্শন।

বেঁচে থাকার সংগ্রাম

প্রাণীজগতের তুলনায় উদ্ভিদজগত প্রকৃতির দুর্বল সৃষ্টি। তাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকে প্রকৃতিই তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে। তবু কেবলমাত্র বনের পশুদের পায়ে পায়েই যে কত উদ্ভিদ অকালে নষ্ট হচ্ছে তার কি কিছু ইয়ত্তা আছে? তবু চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক, প্রাণীজগতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে বেশ অনেক রকম 'অস্ত্রের' সমারোহ ঘটিয়েছে

গাছপালা। অবশ্য এটা খুবই সত্যি যে, গাছপালা নিজেদের ইচ্ছায় এই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে লড়াইয়ে নামতে পারেনি। ক্রমবিকাশের ধারায় তারা এমন এমন সুবিধের সাজসজ্জা পেয়ে গেছে যা থাকার দরুন বেঁচে থাকার যুদ্ধে কোন-না-কোন উপায়ে তারা লাভবান হয়েছে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে উদ্ভিদ-জগতের বাসিন্দারা দৌড়ে পালাতে পারে না, লাঠি-সোঁটা নিয়ে তাড়া করতেও পারে না। তাই যা ছোটখাট অস্ত্র তাদের জুটেছে তা দিয়েই তারা শক্তিশালী প্রাণী-জগতের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের যথাসম্ভব রক্ষা করে চলেছে।

গোলাপের কাঁটা প্রায় গোলাপ ফুলের মতই সুপরিচিত। বেগুন গাছের পাতার উপরের কাঁটা, ফনিমনসার কাঁটা, শেয়াল-কাঁটা গাছের কাঁটা—এ সবই যেন আমাদের তীর, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রের রকমফের, অবশ্য অনেক ছোট আকারের। বেল গাছের কাঁটা আক্রমণকারী শত্রুকে যে সামলাতে পারবে তাতে আর সন্দেহ কী? বনের পশুদের কাছে এ ধরনের নানারকম কাঁটা বেশ পরিচিত। তাই তারাও এ ধরনের অসুবিধেকে এড়িয়ে চলে।

বিছুটি গাছের পাতায়, কাণ্ডে ও ফলে ছোট ছোট চুলের মত কতগুলো শুঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো পূর্ণ থাকে বিষাক্ত পদার্থে। কোন প্রাণীর সংস্পর্শে এলে শুঁয়াগুলোর সূঁচের মত ডগা ভেঙে যায়, আর ভিতরের বিষাক্ত রস একটা চাপের দরুন চামড়া ভেদ করে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিষের ক্রিয়ায় জায়গাটা ফুলে ওঠে আর জ্বালা করে। বিছুটির চুলকানিতে নাস্তানাবুদ হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়ত অনেকের আছে। এটাকে গাছের হুল বলা যেতে পারে।

তামাক, পুনর্নবা, ভেরেণ্ডা প্রভৃতি গাছে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে আছে এক ধরনের গ্রন্থি, যা থেকে চটচটে আটা-জাতীয় একটি পদার্থ নির্গত হয়। কোন পশু ভুল করে এসব গাছে

মুখ লাগালে গাছের পাতা এবং ডাঁটা এমনভাবে মুখে আটকে যায় যে, দ্বিতীয়বার তারা সে গাছে পাতা খাবার লোভে আর মুখ ঠেকায় না।

বড় গাছের ছাল যেন সৈনিকের গায়ের বর্ম। সর্বাঙ্গ ঢেকে রেখে গাছকে রক্ষা করে তার ছাল।

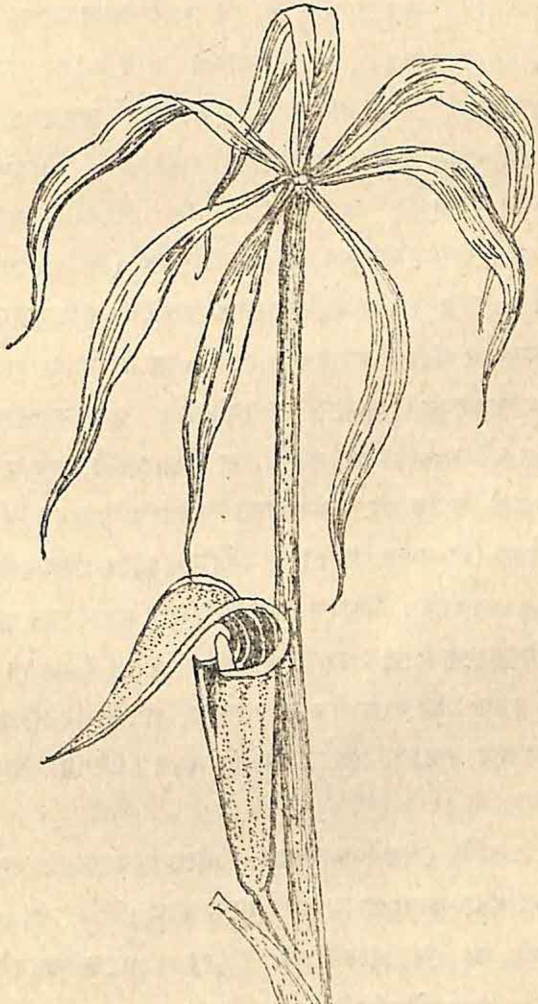
কম-বেশি কিছু পরিমাণ বিষাক্ত দ্রব্য অনেক গাছেই থাকে। এসব বিষাক্ত দ্রব্যই পশুদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে। বট, অশ্বত্থ বা কাঠগোলাপ গাছে সাদা আটা (যাকে বলে latex) আছে বলে প্রাণীরা, হয় অভিজ্ঞতায়, নয় তো সহজাত জ্ঞানে জানে যে, এ গাছের খাদ্য তাদের পক্ষে অনুপযোগী।

অত্যন্ত বিষাক্ত দ্রব্যের মধ্যে আছে তামাকের নিকোটিন, আফিঙের মরফিন, সিনকোনার কুইনিন প্রভৃতি নানারকম আল্‌কলয়েড (Alkaloids)। গাছপালার বেঁচে থাকার জন্যে এসব হল মস্ত হাতিয়ার। অবশ্য প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ এই-সব বিষাক্ত পদার্থ থেকেই অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের আবিষ্কার করেছে।

গাছপালার তেতো স্বাদ, বিদঘুটে গন্ধ ইত্যাদিও অনেক সময় গাছপালাকে প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা করে। আত্মরক্ষার জন্যে ওল কচুর দেহে থাকে 'র‍্যাফাইড' (Raphides) ও 'স্ফিরাফাইড' (Sphaeraphides)। এগুলো স্ূঁচের আর তারার আকারে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের (Calcium oxalate) দানার সমষ্টি। ওল কচু খেলে যে গলা ধরে, তা এইগুলো থাকে বলে। বিচরণকারী পশুরা তাই চায় এসব গোলমেলে খাদ্য এড়িয়ে চলতে।

পশুপাখিদের হাত থেকে ধ্বংস এড়াতে কয়েক রকমের গাছ এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে নিজেদের রক্ষা করে। এক্ষেত্রে গাছের চেহারা একটা পরিবর্তিত রূপ ধরে। কখনো-কখনো গাছটি

দেখায় অন্য কোন প্রাণীর মত। এক ধরনের কচু গাছ আছে যার রঙ এমন যে দূর থেকে দেখলে মনে হয় বুঝি কোন সাপই বসে আছে। এমন গাছও আছে, যাদের পাতায় নানারকম রঙের



অনুকৃতি

বৈচিত্র্যে মনে হয় কোন পশুর দেহের অংশই বুঝি দেখা যাচ্ছে।

শিলং দার্জিলিঙের পাহাড়ে কয়েক রকমের কচু গাছ আছে যাদের ফুলের মঞ্জরীর আকার (Inflorescence) দেখতে হয় ঠিক ফণা-ধরা সাপের মত। বর্ষাকালে এই ফুল ফোটে প্রচুর পরিমাণে। তাদের রঙ আর আকৃতি দেখে দূর থেকে সাপ বলে ভ্রম হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এদের নামও তাই সাপ ফুল। শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতেই এ ব্যবস্থা। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যকে বোকা বানাবার কৌশল অর্থাৎ ক্যামোফ্লাজিং-এরই (Camouflage) অনুরূপ আর কি !

উদ্ভিদের এই অনুকরণের নাম অনুকৃতি (Mimicry)। কম ক্ষতি স্বীকার করে বেশি ক্ষতির হাত এড়ানো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। উদ্ভিদের মধ্যেও এর উদাহরণ পাওয়া যায়। আম, জাম ইত্যাদি গাছে এক রকমের পিঁপড়ে বাসা বাঁধে। গাছের পাতা ইত্যাদি খেয়েই এরা জীবন ধারণ করে। কিন্তু অন্য প্রাণী, তা মানুষও হতে পারে, গাছের কাছে এলে কামড়ের যন্ত্রণায় তাদের দূরে পাঠিয়ে দেয়। গাছ পিঁপড়ের সাহায্যে এমনিভাবে আত্মরক্ষা করে। অন্য গাছেও এরকমের উদাহরণ পাওয়া যায়। উদ্ভিদ আর প্রাণীর এই অদ্ভুত সম্বন্ধকে বলে সহকৃতি (Myrmecophily)।

এখন হয়ত আন্দাজ করতে পারবে, যতটা নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবন উদ্ভিদের ভাবা গিয়েছিল তাদের জীবন ততটা সহজ সরল নয়।

কিন্তু এসবই শেষ কথা নয়। বেঁচে থাকতে গেলে উদ্ভিদকে আরও নানা ধরনের সংগ্রামে জয়ী হতে হবে।

আত্মরক্ষা করতে পারাটাই উদ্ভিদের পক্ষে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার শেষ নিদর্শন নয়। বিশেষ আক্রমণে আত্মরক্ষা করে টিকে থাকাটা সেই বিশেষ গাছের পক্ষে জয়ের কারণ নিশ্চয়ই, কিন্তু ব্যাপক অর্থে, আত্মরক্ষা সৃষ্টিরক্ষারই নামান্তর। ফলের মধ্যে যে বীজ তৈরি হয়ে আছে ভবিষ্যৎ-বংশরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে, সেই বীজকে

অঙ্কুরিত হবার মত পরিবেশে এনে না ফেলতে পারলে সব শ্রম, সব চেষ্টাই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

দূর দেশে গাছের প্রতিনিধি

একটা গাছের সব বীজ যদি সেই গাছেরই ধারে-কাছে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সামান্য জায়গার সীমিত খাদ্য আর আলোর স্বল্পতা বেশির ভাগ বীজকেই অঙ্কুরিত হবার সুযোগ দেবে না। দিলেও অতি শীঘ্র তার বেশির ভাগই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তাই প্রকৃতি নানা উপায়ে বীজকে দেশে দেশান্তরে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সে ব্যবস্থা কখনো যন্ত্রের মত আপনা-আপনি চলে, কখনো বাইরের প্রতিনিধির উপর তা নির্ভরশীল।

একটা বীজের মধ্যে কী আছে ভাবতে গেলে বেশ অবাক লাগে। বীজ যেন একটি ছোট শিশু গাছ। খাদ্যসম্ভার নিয়ে সে যেন দূরদেশের যাত্রী! যেখানে পৌঁছতে চায়, সেখানে পৌঁছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সময় যাতে না খাদ্যাভাব ঘটে তারই ব্যবস্থা থাকে বীজের মধ্যে। এমনি অবস্থাতেই বীজ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। শেকড় গজিয়ে গেলে স্থানান্তরে যাওয়া আর গাছের পক্ষে সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে যত বীজ অঙ্কুরিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশি বীজ থেকে যায় অনঙ্কুরিত। এটা প্রকৃতির হিসেবের মধ্যেই ধরা। সেই জন্যেই এত অজস্র বীজের সৃষ্টি; অনেক ক্ষতির ভিতরে একটি নিশ্চিন্ত সফল সৃষ্টিরই প্রয়াস এটা। একটা গাছের এত বেশি বীজ হয় বলে আমরা তার একটা প্রধান অংশ খেয়ে শেষ করলেও বোনার মত বীজের অভাব ঘটে না কখনো।

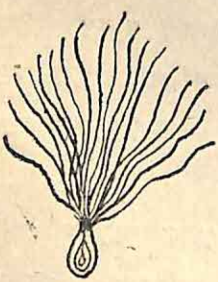
গাছের বীজ ছড়াবার কাজে অনেকখানি অংশ নেয় হাওয়া, জল, পশু, পাখি।

হাওয়ার উপর নির্ভরশীল যারা

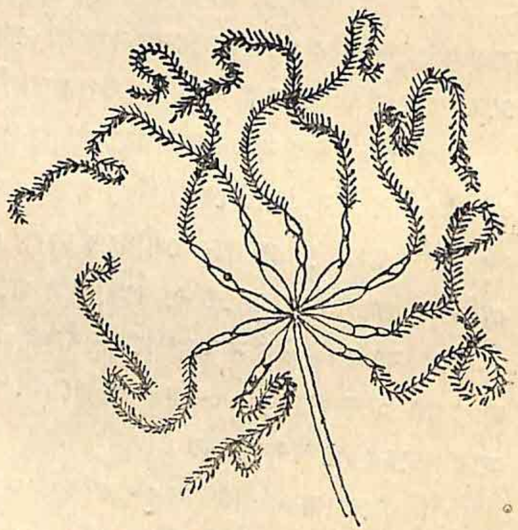
বাতাসের উপর নির্ভর করে যে বীজ দূর দেশে পাড়ি দেবে তাকে হতে হবে খুব হালকা আর শুকনো, যাতে বাতাসে ভেসে বেড়াতে তার কোন অসুবিধে না হয়। ধুলোকণার চেয়ে ছোট বীজ অর্কিডের, তাই তা সহজেই হাওয়ায় ভেসে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যেতে পারে। ঘাসের বীজ, সিনকোনার বীজ, এগুলোও খুব ছোট, তাই দূরে চলে যেতে কোন অসুবিধে হয় না।



সূর্যমুখী ফুলের প্যারাসুট ব্যবস্থা



আকন্দর বীজ



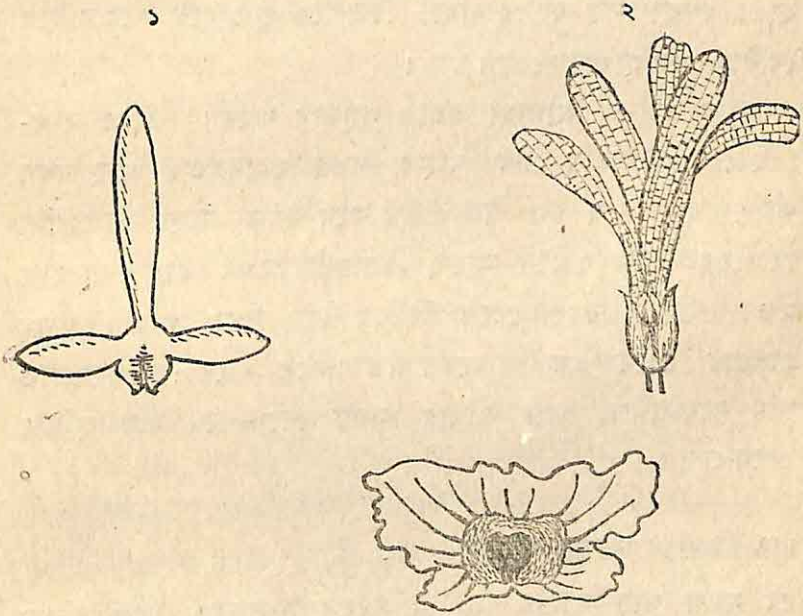
নারাভেলিয়ার বীজ : হাল্কা করার জন্যে পালকের মত ব্যবস্থা

কিন্তু যে সব বীজ অত ছোট নয় তাদের বেলা বাতাসে ভেসে বেড়াতে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেইজন্যে তাদের বীজে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ আকৃতি, যা হাওয়ায় ভাসতে সাহায্য করে। ছোট্ট একটি বীজ, অথচ মাথায় একরাশ পাতলা, হালকা চুলের মত জিনিস ছাতার আকারে সাজানো থাকে। প্যারাসুট বেঁধে যেমন নিশ্চিন্তে নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছনো যায়, এসব

বীজেও থাকে ঠিক তেমনি ধরনের কৌশল। শিমুলের বীজে থাকে সরু সরু অসংখ্য আঁশ, যা বীজকে হালকা বানিয়ে বাতাসের ভিতর দিয়ে ভেসে যেতে সাহায্য করে।

টঁ্যাপারি ফলের উপরকার শুকনো আবরণ দেখতে যেন একটা বেলুনের মত। এর সাহায্যেই বাতাসে ভর করে শুকনো ফল বীজ-সমেত দূরে ভেসে যায়। এমনিভাবে বীজ পৌঁছে যায় দূর দেশে।

ডানায় ভর করে পাখি উড়ে যায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে। পাখির মত ডানা পাবার বাসনা কার বা না হয়েছে! প্রকৃতি শুধু



(১) মাধবীলতা, (২) শাল, (৩) সোনা—ডানাওয়ালা বীজ

পাখিদেরই ডানা দেয় নি, ডানা দিয়েছে অনেক বীজের গা জুড়ে। আর সেই ডানায় নির্ভর করে বীজ উড়ে যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।

ডানাওয়ালা বীজের মধ্যে নানা আকৃতির বীজের দেখা আমরা পাই। সজনের বীজের আকৃতি ডানার মত, সে ডানার মত অংশ বের হয় বীজের তিন দিন থেকে। শালের বীজে লাগানো থাকে সুন্দর পাঁচটি পাখনা,—এগুলো আসলে ফুলের বৃতি অংশটা শুকিয়ে এমনি রূপ নিয়েছে। এই পাখনাই বীজকে দূর দেশে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। এমনি নানা আকৃতির পাখনা লাগানো থাকে বিভিন্ন রকম বীজে।

পোস্ত, পপিফুল, শেয়ালকাঁটা ইত্যাদির বীজ আকারে বেশ ছোট। ফলের মধ্যে শুকিয়ে যখন বীজগুলো তৈরি হয় তখন হাওয়ার ঝাপটায় ফলের মাথার ছিদ্রপথে দু-চারটে করে বাইরে বেরিয়ে এসে হাওয়ায় ভেসে যায়।

এক ধরনের আগাছা জন্মায় সমুদ্রের ধারে। এদের বংশ-বিস্তারের উপায়টা বেশ মজার, স্বতন্ত্র ধরনেরও। গাছ যখন পরিণত বয়সে ফল এবং বীজ তৈরি করে তখন গাছের ডালগুলো ভিতরের দিকে গুটিয়ে আসে, চেহারাটা তখন হয় গোলগাল মত। আসল কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে গাছটা তখন হাওয়ার বেগে একটা বলের মত চলতে থাকে ; বীজগুলোও যায় সঙ্গে নিয়ে, আর যাবার সময় পথে-পথে বীজ ছড়িয়ে রেখে দেয়।

বীজ বিস্তারে জলের ভূমিকা

যে সমস্ত গাছ তাদের বীজ বা ফলের বিস্তারের জন্যে জলের উপর নির্ভর করে তাদের বীজে (বা ফলে) সাধারণত ভেসে থাকার উপযোগী কতগুলো ব্যবস্থা থাকে। নারকেল একটি ফল, যা জলে ভেসে দেশ-দেশান্তরে চলে যায়। দীর্ঘদিন সমুদ্রের নোনা জলে যাতে নষ্ট না হয় এবং ভালভাবে যাতে ভেসে থাকতে পারে তাই ফলের উপরে পুরু ছোবড়ার আস্তরণ। হাজার হাজার

মাইল সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে নারকেল গাছ তাদের বংশ-বিস্তার করে চলেছে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে।

সুপুরির ফলেও আছে জলে ভেসে থাকা ও জলে নষ্ট না হবার উপকরণ। জলের স্রোতে আরও কত বীজই না স্থানান্তরে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। যাতে সহজে জলে ভাসতে পারে পদ্মের চাক তাই অত হালকা। বীজ-সমেত চাক স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে চলে। চাক যখন পচে ওঠে ক্রমে ক্রমে, তখন বীজ পড়ে যায় জলের তলায়। তারপর জন্ম হয় নতুন গাছের। জলজ উদ্ভিদের বীজে অনেক সময় একটা স্পঞ্জ-জাতীয় আবরণ থাকে যাতে করে বীজ জলে ভেসে থাকতে পারে।

দোপাটির বীজ বিস্তারের ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় আছে। ফলের মধ্যে যখন বীজ তৈরি হয়ে যায় তখন ফলের খোলসটা ভেঙে যায় ছোটখাট একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, আর সেই বিস্ফোরণের বেগে বীজগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্লক্‌স্ (Phlox) নামের যে মরশুমি ফুল দেখা যায়, তার ফলও এরকম উপায়েই ফাটে। ধারে-কাছে থাকলে বিস্ফোরণের আওয়াজও বেশ ভাল করেই শোনা যায়।

বীজবিস্তারে সাহায্য করে নানা প্রাণী

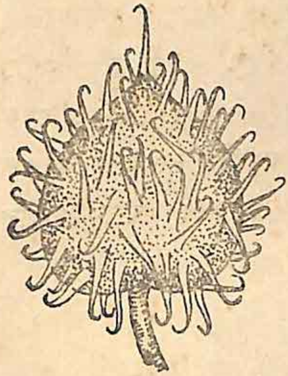
প্রাণীজগতের উপর নির্ভর করে যে কত বীজ (এবং ফলও) বংশ বিস্তার করে তার শেষ নেই। আম কাঁঠালের মত ভারি ভারি ফল, যারা বাতাস বা জলের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারে না, তাদের বেলা অন্য রকমের ব্যবস্থা রয়েছে। সুন্দর টুকটুকে রঙ, রসাল খাদ্য-সামগ্রী, লোভনীয় গন্ধ—এই সবই এদের দিকে প্রাণী-জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্য পশুপক্ষী তো বটেই, আমাদেরই কি উপায় আছে এমন সুস্বাদু

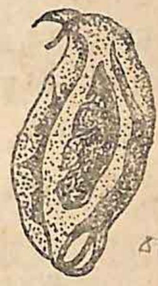
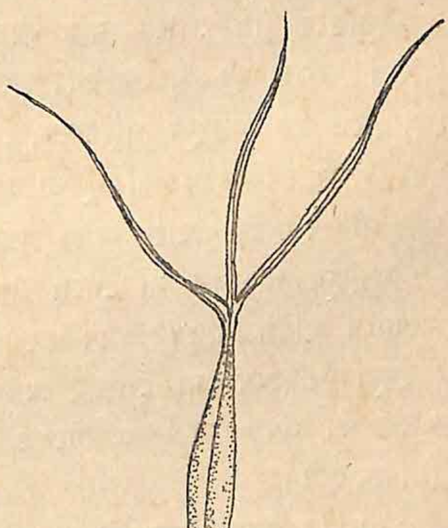
ফলের দিকে নজর না দিয়ে থাকার! ফলটি খেয়ে আঁটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেই আমাদের কাজ শেষ।

কত রকমের সুন্দর সুন্দর রঙের ফল আছে যা দেখলেই পাখিরা তাদের স্বাদ নিতে ছুটে আসে। কাঠবেড়ালি, শেয়াল, বাঁদর, বাদুড় প্রভৃতি তো ফল পাকড় খেতেই অভ্যস্ত। আর শাঁসালো ফল হলে তো কথাই নেই। পেয়ারা, অশ্বত্থ বটের ফল, আঙুর প্রভৃতি এইসব পশু এবং অন্যান্য পাখি পরমানন্দে খেয়ে ফেলে। কিন্তু শক্ত বীজগুলো খেয়ে হজম করে ফেলতে পারে না। এগুলো মলের সঙ্গে বের হয়ে আসে এবং পরে সুবিধেমত সময়ে অঙ্কুরিত হয়। এমনিভাবে পশুপাখির সঙ্গে অনেক দূরে যেতে বীজের কোন অসুবিধেই হয় না। বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছ অনেক সময় খেজুর গাছের খাঁজে, পাঁচিলের উপরে, দু-তিন তলা বাড়ির ছাদে দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ এই যে, পাখিদের তো আর ওসব জায়গায় পৌঁছোতে বাধা নেই! পাকা ফল খাইয়ে বংশ বিস্তার করার চেষ্টাটা অনেকটা ঘুস দিয়ে কাজ হাসিল করিয়ে নেবার মতই। তাই মনে হচ্ছে না?

ঘুষ দেবার সঙ্গতি নেই, অথচ প্রাণীজগতের উপরই নির্ভর করতে হয় বংশ-বিস্তারের জন্যে যে সব বীজের, তাদের থাকে অন্যরকমের কৌশল। হয় তাদের বীজে থাকে কাঁটা বা আঁকড়ি, নয় থাকে শক্ত চুলের মত কোন জিনিস কিম্বা আঠাল, চটচটে কোন বস্তু, যা দিয়ে তারা প্রাণীর দেহের কোন অংশে আটকে থেকে কিছু দূরে পৌঁছে যেতে পারে। চোরকাঁটা এ ধরনের একটা সুন্দর উদাহরণ। এর বীজে একটি লম্বা সোঁয়া লাগানো থাকে, প্রাণীর কোন অংশে আটকে থাকার উপায় হিসেবে। মাঠে ঘাটে গিয়ে কাপড়ে লাগিয়ে নিয়ে আমরা নিজেরাই এদের কত বীজকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দিচ্ছি। তাদের বংশ-বিস্তারে এই সাহায্য আমরা করি নিজেদের অজান্তে। বাঘনখের বীজের একটা দিক, শক্ত দুটি

কাঁটায় রূপান্তরিত। আর কাঁটার মুখ থাকে অত্যন্ত সুঁচোলো। ফলে কোন লোমশ জন্তুর গায়ে আটকে গেলেই তাদের দূর দেশে পৌঁছে যাওয়ার ভাবনা মিটে যায়। এ রকম উদাহরণ আছে আরও অনেক।



নানাধরনের ফল ঃ
জীবজন্তুর গায়ে আটকে যারা
দূর দেশে পৌছে যেতে পারে।

যে-সব গাছ আমাদের খাদ্য জোগায়, সেসব গাছে আছে ওষুধ তৈরির নানা উপকরণ। যে-সব গাছ থেকে আমরা পাই কোন

দরকারি জিনিস, সে-সব গাছ মানুষই সারা পৃথিবীময় এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছে। ফুলের সৌন্দর্য অনেক সময় একটি গাছকে অন্য দেশে পাড়ি জমাতে সাহায্য করে। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মানুষই তাকে বয়ে নিয়ে যায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে। কচুরিপানার ফুলের রঙ আর চেহারায় মুগ্ধ হয়েই একদা মানুষ তাকে বংশবিস্তারে সাহায্য করে ফেলেছে। নদী, নালা, খাল, বিল ভরে আছে কচুরিপানায়—এ দৃশ্য তো গ্রামের স্বাভাবিক দৃশ্য! আমাদের দিক থেকে কচুরিপানা আজ আপদ বলে চিহ্নিত, কিন্তু উদ্ভিদের দিক থেকে এ তার বেঁচে থাকার সংগ্রামে জয়ের নিশানা।

বীজের মধ্যে গাছ ঘুমিয়ে থাকে কত দিন

দূর দূরান্তরে বীজ পৌঁছে যায় তার নতুন জীবন শুরু করার জন্যে। কিন্তু দূর দেশে পৌঁছোলেই শুধু চলে না, তাকে পৌঁছোতে হয় অনুকূল পরিবেশে, যে পরিবেশে সে বেঁচে থাকার রসদ পাবে, নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারবে, আর পারবে সৃষ্টির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে।

অনুকূল পরিবেশ না পেলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, বীজের মধ্যে যে ভবিষ্যৎ গাছের প্রাণ থাকে তা থাকে সুপ্ত। শুধুমাত্র অনুকূল পরিবেশ না পেলেই যে বীজের মধ্যেকার গাছ সুপ্ত থাকে তা অবশ্য নয়। এমনিতেও অনেক বীজ এভাবে একটু জিরিয়ে নেয়।

অঙ্কুরিত হবার আগে বীজের যে বিশ্রাম নেবার বা নিষ্ক্রিয়তার কাল, তা এক-এক বীজে এক-এক রকমের। বীজ-বিশেষে এ সময়টা কখনো কয়েক সপ্তাহ, কখনো একটা ঋতু, কখনো বা কয়েক বছরও হতে পারে। শুষ্কতা, শৈত্য বা বেশি উত্তাপ, এসবই শিশু গাছের শত্রু। এমনি অবস্থায় শিশু গাছের ঘুম ভাঙতে চায়

না তা আগেই বলেছি, কেবলমাত্র অনুকূল পরিবেশ ও আবহাওয়া পেলেই বীজ অঙ্কুরিত হয়।

দীর্ঘ দিন সুপ্ত থেকে, বীজের মধ্যেকার শিশু গাছের বেঁচে থাকার সীমা নিশ্চয়ই একটা আছে। আর তা নির্ভর করে সুপ্তিকাল কী অবস্থায় বীজের কেটেছে তার উপর। বীজপত্রে সঞ্চিত খাদ্যের পরিমাণও একটা নির্দেশক। শুকনো আর ঠাণ্ডা অবস্থায় সঞ্চিত খাদ্যের সুপ্তিকাল কাটলে বীজের অঙ্কুরিত হবার সম্ভাবনা দীর্ঘদিন পরেও থেকে যায়। আর অঙ্কুরিত হবার আশা নষ্ট হয় যদি সুপ্তিকাল কাটে গরমে আর স্যাঁতসেঁতে জায়গায়। নিষ্ক্রিয়তার কালের মতই এ সময়টা হতে পারে একটা ঋতু, বা বেশ কয়েক বছর। দীর্ঘ দিন সুপ্ত থাকার পর অঙ্কুরিত হবার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় ৮০০ বছরের পুরোনো বীজের অঙ্কুরোদ্গমে। চীনদেশে মাঞ্চুরিয়ার এক শুকনো হ্রদের তলায় পদ্মফুলের বীজ পাওয়া গিয়েছিল, যার মধ্যে শিশু গাছ অত দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে ছিল অঙ্কুরিত হবার সম্ভাবনা নিয়ে।

বীজ অনুসারে গাছের নাম

সবুজ গাছপালা (শেওলাকে বাদ দিয়ে) যা আমরা খুব সহজে আমাদের ধারে-কাছে দেখতে পাই, তারা সবাই উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ। উচ্চ শ্রেণীর সব সবুজ উদ্ভিদেই ফুল ফোটে, বীজ হয়। এই শ্রেণীর উদ্ভিদকে বলে স-পুষ্পক উদ্ভিদ (Phanerogams)। কিন্তু স-পুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যেও সব উদ্ভিদ একই রকমের নয়। পাইন গাছ বা বিলিতি ঝাউ গাছে ফুল ফোটে এবং বীজ হয়, কিন্তু ফল ধরে না। বীজগুলো থাকে অনাবৃত। এদের নামকরণ হয়েছে ব্যক্তবীজী (Gymnosperms)। আর অন্য-রকম যে উঁচু শ্রেণীর উদ্ভিদ, তাদের বীজ ফলের মধ্যে আবৃত থাকে বলে এদের নাম গুপ্তবীজী (Angiosperms)।

গুপ্তবীজী গাছেরাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। তাই ধারে-কাছে এ ধরনের গাছই আমাদের চোখে পড়ে সবচাইতে বেশি।

গুপ্তবীজী উদ্ভিদ আবার দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এ বিভাগের মূল ভিত্তিটা অবশ্য বীজের চেহারাকে কেন্দ্র করেই।

একটা ছোলা বা মটরদানা বা চিনেবাদামের দানা ভাঙলে পরিষ্কার দুটি অংশে তা ভাগ হয়ে যায়। এই দুটিকে বলে বীজপত্র (Cotyledon)। এই বীজপত্রের সংখ্যা দিয়েই পুরো গুপ্তবীজী উদ্ভিদকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেসব গাছের বীজে বীজপত্রের সংখ্যা দুই, তাদের বলে দ্বিবীজপত্রী (Dicotyledons)। আর যখন বীজপত্রের সংখ্যা মাত্র একটি তখন তাদের বলে একবীজ-পত্রী (Monocotyledons), যেমন, ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদির বীজ।

অনুকূল অবস্থায় বীজ তার সুপ্তাবস্থা থেকে জেগে উঠেই তার কর্মতৎপরতা শুরু করে দেয়। অনুকূল পরিবেশ মানে, কতগুলো সহায়ক অবস্থার সমষ্টি। তার মধ্যে আছে জল, হাওয়া এবং তাপ। এ সব জিনিস একটা নির্দিষ্ট পরিমাণেই গাছের দরকার। এসব খুব কম বা খুব বেশি হলে তখন যে অবস্থা দাঁড়ায় তা বীজের পক্ষে সহায়ক হয় না। আগে অঙ্কুরোদ্গমকালে আলো অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হত, কিন্তু সাম্প্রতিক পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অঙ্কুরোদ্গমে সহায়ক হয়েছে। অবশ্য এও সত্যি যে, কিছুসংখ্যক বীজ আছে যারা আলোর সংস্পর্শে এলে অঙ্কুরিত হতে পারে না। এদের ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হবার অবস্থা হিসেবে জল, অক্সিজেন ও তাপের সঙ্গে চাই অন্ধকার। উদাহরণ হিসেবে টমেটো, ধুতুরা প্রভৃতি বীজের কথা বলা যায়। এমন কিছু বীজও আছে যাদের ক্ষেত্রে আলো বা অন্ধকার কোন তফাত সৃষ্টি করে না।

সাধারণত বীজ গাছ বা ফল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই অঙ্কুরিত হয়; কিন্তু এমনও বীজ আছে যা গাছ বা ফল থেকে বিচ্ছিন্ন

হবার আগে থেকেই অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করে। সুন্দরবন অঞ্চলের লবণাক্ত মাটিতে এই বিশেষ ধরনের অঙ্কুরোদ্গম দেখতে পাওয়া যায়। সুঁছুরি, বীণা প্রভৃতি গাছে সুন্দরবন অঞ্চল পরিপূর্ণ। এ-সব গাছের ফল থেকেই বীজ ভবিষ্যৎ শেকড়



জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম

(Radicle) বের করে দিয়ে বাড়তে থাকে এবং গাছ থেকে খাদ্যসংগ্রহ করে ফলের মারফত। বীজ যখন বেশ বড় এবং ভারি হয়ে পড়ে, তখন তা গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্যাঁতসেঁতে

কাদায় গেঁথে যায়। কাদায় গেঁথে যাবার পর র‍্যাডিক্যাল শেকড়ে রূপান্তরিত হয়ে মাটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে।

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা। বীজ যদি জল-কাদায় পড়ে অঙ্কুরিত হতে না পারে, তাই আগে থেকেই কিছু পরিমাণ সুবিধে জুড়ে দেওয়া আর কি। এ ধরনের বিশেষ অঙ্কুরোদ্গম ভিভিপ্যারি (Vivipary) বা জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম নামে পরিচিত। সুন্দরবন অঞ্চলে এ ধরনের অঙ্কুরোদ্গম একটা বৈশিষ্ট্য হলেও, স্বাভাবিক অবস্থাতেও এক-আধটা ক্ষেত্রে এর দেখা পাওয়া যায়। শিলং, দার্জিলিং প্রভৃতি শৈলনিবাসে স্কোয়াশ নামের এক ধরনের সব্জি পাওয়া যায়। এদের ফল গাছের সঙ্গে যুক্ত থাকা অবস্থাতে ফলের মধ্যেই অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয়ে যায়। নারকেলের অঙ্কুরোদ্গমও এই ধরনের। প্রচুর জলের সরবরাহ থাকলে ধান গাছের বীজও গাছে লেগে থাকা অবস্থায় অঙ্কুরিত হয়ে পড়ে। যেখানেই 'ভিভিপ্যারি অঙ্কুরোদ্গম', সেখানেই আন্দাজ করা সম্ভব যে, বীজের বিশ্রামের বা নিষ্ক্রিয়তার কাল বলে কিছু নেই। বীজ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এইসব বীজ অঙ্কুরিত হ'তে পারে।

গুপ্তবীজী অথবা ব্যক্তবীজী, একবীজ-পত্রী অথবা দ্বিবীজ-পত্রী, যেকোন বীজই হোক না কেন এবং তার অঙ্কুরিত হবার উপায় স্বাভাবিক হোক কিম্বা অস্বাভাবিকই হোক, সরস মাটিতে বীজ তার পূর্ব-পুরুষের সব সৌন্দর্য, সব বৈশিষ্ট্য নিয়েই অঙ্কুরিত হবে। অবশ্য জল, হাওয়া, তাপ এসবের অভাব যদি না ঘটে।

ক্ষেতময় ধানের বীজ ছড়িয়ে তাই কৃষক অপেক্ষা করে, কবে তার মাঠ ভরে উঠবে ফসলে, আর রাশি-রাশি ধান এনে সে গোলায় তুলবে!

'মাসি গো মাসি, পাচ্ছে হাসি,
নিমগাছেতে হচ্ছে শিম ;
হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাকের বাসায় বগের ডিম।'

কোনদিন ভোরে ঘুম ভেঙে তাকাতেই যদি চোখে পড়ে যে উঠোনের নিমগাছটা অজস্র শিমে ভরে আছে, তবে প্রথমে বিস্মিত হয়ে, পরে অদ্ভুত দিনকাল কি অঘটন ঘটাচ্ছে ভেবে হো হো করে হেসে ওঠায় কোন দোষ নেই। বরং হাসিটাই স্বাভাবিক। কিন্তু না, বৈজ্ঞানিক জগতে সে হাসি হাসবার সুযোগই পাওয়া যাবে না। কেননা, বৈজ্ঞানিক জগতে নিম গাছে নিমই ধরবে, আর শিম ধরতে হবে শিম গাছে। তাই ধানের বীজ বুনলে ধান গাছ গজায়, আমের আঁটি পুঁতলে আমের চারাই বের হয়। মুরগির ডিমে তা দিলে ফুটে যে বাচ্চা বের হয় সেটা মুরগিরই। এই যে নিম গাছে নিম, শিম গাছ থেকে শিম হওয়া, তার মূলে আছে সেই ক্রোমোসোম, (Chromosome), যার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ক্রোমোসোমের সংখ্যা, ক্রোমোসোমের প্রকৃতি, এসব নিয়ে এক নতুন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে, যার নাম 'জেনেটিক্স্' (Genetics)। সন্তানের চেহারায় বাপ মায়ের আদল কেন আসে, সন্তান পিতামাতার কী কী বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং কিভাবে করে, এ সবের রহস্য ভেদ করছে 'জেনেটিক্স্'। কী উদ্ভিদ জগত, কি প্রাণী জগত, সবই এক নিয়মে বাঁধা। 'উত্তরাধিকার বিজ্ঞান' এদের সব রহস্য ভেদ করে চলেছে।

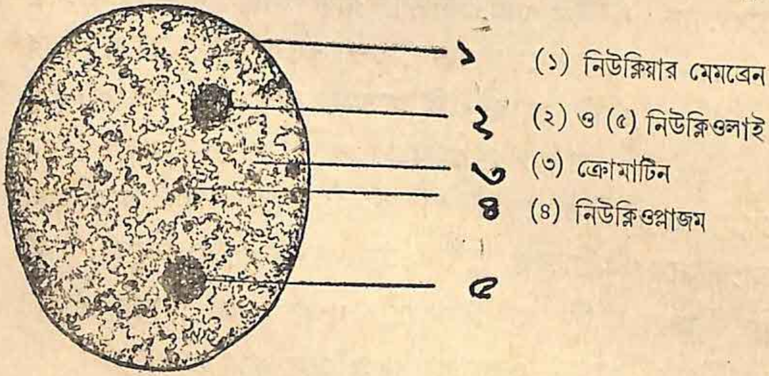
আমরা আগেই জেনেছি যে, 'মিটোসিস' (Mitosis) পদ্ধতিতে যখন একটা কোষ থেকে আর একটা নতুন কোষ তৈরি হয় তখন পুরোনো কোষের যাবতীয় সামগ্রী সমান দু-ভাগে ভাগ

হয়ে দুটি নতুন কোষের সৃষ্টি করে। প্রতিটি কোষে থাকে বংশ-পরম্পরাগত বৈশিষ্ট্যের উপাদান অর্থাৎ ক্রোমোসোম।

ক্রোমোসোমের অবস্থান, তার চেহারা ইত্যাদি জানার সুবিধের জন্যে আমরা আর-একবার 'নিউক্লিয়াসের' চেহারাটা বিশেষভাবে দেখে নেব। আগেই বলেছি, কোষের নিউক্লিয়াসই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ, কোষের সব কাজের জন্যে সে দায়ী। চেহারাটা গোল বা ডিমের মত, এবং কোষের মাঝখানে এর অবস্থান।

নিউক্লিয়াসের অন্যান্য অংশ হল আবরণ, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন (Nuclear membrane), দু-একটি ছোট্ট দানার মত জিনিস, নিউক্লিওলাই (Nucleoli) ও নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm)। এই নিউক্লিওপ্লাজম অংশে থাকে পাকানো সুতোর মত কতগুলো জিনিস, যার নাম 'ক্রোমাটিন' (Chromatin)। ক্রোমাটিনই আসল বস্তু যা উদ্ভিদ বা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বংশ-পরম্পরায় বহন করে নিয়ে যায়। যে কোন একটি উদ্ভিদ বা প্রাণীর সকল কোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমাটিন একই রকমের।

কোষ বিভাগের আগে এই ক্রোমাটিন অত্যন্ত বেশি প্রকটিত হয়ে ওঠে। এগুলো গাঢ় হয়ে কতগুলো লাঠির মত আকার



একটি নিউক্লিয়াস : অনেক গুণ বড় করে দেখানো।

পায়। তখন এদের বলা হয় ক্রোমোসোম (Chromosome)। ক্রোমোসোম নানা চেহারার হতে পারে, নানা মাপেরও। পাতলা

ছড়ির মত, কখনো কখনো ঘোড়ার ক্ষুরের মত, কখনো বা ইংরেজি J বা S অক্ষরের মত। আকার যাই হোক না কেন, একটি নিউক্লিয়াসে এরা থাকে জোড়ায় জোড়ায়। তাই একটি ক্রোমোসোমের সম-আকৃতির ক্রোমোসোম নিউক্লিয়াসের কোথাও না কোথাও থাকবেই।

বিভিন্ন গাছে বা প্রাণীতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা বিভিন্ন, কিন্তু একই জাতের গাছে বা প্রাণীতে এর সংখ্যা নির্দিষ্ট। যেমন, সমস্ত ভুট্টা গাছের ক্রোমোসোমের সংখ্যা কুড়ি, তার মানে দশ জোড়া, বাঁধা কপিতে ১৮ বা ৯ জোড়া, ধানে ২৪ বা ১২ জোড়া, তামাকে ৪৮ বা ২৪ জোড়া, গমে ৪২ বা ২১ জোড়া।

ক্রোমোসোমকে অতিরিক্ত মাত্রায় বড় করে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখলে দেখা যায় যে, কতগুলো গুঁড়ো জিনিস রেখার মত সাজানো, অনেকটা পুঁতির মালার মত। এই গুঁড়োগুলোর মধ্যে আরও সূক্ষ্ম গুঁড়ো যা আছে তারাই হল আসলে এককভাবে দায়ী বংশবৈশিষ্ট্য বহন করার জন্যে। এদের নাম জীন (Gene)। আন্দাজ করতে অসুবিধে নেই যে, একটি ক্রোমোসোমে হাজার হাজার জীন থাকতে পারে—যাদের প্রত্যেকেই সামান্য রকমের বৈশিষ্ট্য চালান দেবার জন্যে দায়ী। কিন্তু কোন্ বৈশিষ্ট্য চালান দেবে কি দেবে না, সেটা অবশ্য অনিশ্চিত। তবে, একটিমাত্র জীন এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য প্রেরণ করতে পারে। যে-কোন বিশেষ গাছ বা প্রাণীর ক্রোমোসোমের মধ্যে জীনের অবস্থান একই রকমের। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক, একটি ক্রোমোসোমের এক প্রান্তে যে জীন আছে তা দায়ী রঙের জন্যে। জোড়ার অন্য যে একটি ক্রোমোসোম আছে, তাতেও সেই প্রান্তদেশের জীনই রঙের জন্য দায়ী হবে।

একটা খটকা লাগতে পারে এই ভেবে যে, প্রত্যেক উদ্ভিদ বা প্রাণীতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা যদি নির্দিষ্ট, তাহলে পুংকেশর আর

গর্ভকেশর মিলে যখন একটি নতুন বীজের সৃষ্টি হয় বা পিতা মাতার মিলনে যে সন্তান হয় সে সন্তানের দেহে তো ক্রোমোসোম দ্বিগুণ হয়ে যাবে, কারণ এক্ষেত্রে দুদিক থেকেই যে ক্রোমোসোম আসছে। কিন্তু তা না হয়ে একই সংখ্যা থেকে যায় কী করে?

দ্বিগুণ না হয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের সংখ্যা একই থেকে যায় কিভাবে, সেটা বুঝতে গেলে নিউক্লিয়াসের আরও একটি প্রক্রিয়ার কথা জানা দরকার। এ প্রক্রিয়ার নাম মিয়োসিস (Meiosis) বা হ্রাস বিভাজন (Reduction division)। এ প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট ক্রোমোসোম সংখ্যার মাত্র অর্ধেক এসে স্ত্রী ও পুরুষ জনন-কোষে পৌঁছোয়। পিতার দিক থেকে অর্ধেক ও মাতার দিক থেকে অর্ধেক-সংখ্যক ক্রোমোসোম পেয়ে সন্তান সম্পূর্ণ ক্রোমোসোমের অধিকারী হয়ে সেই বিশেষ জাতের ধারা বহন করে চলে।

ক্রোমোসোমের সঙ্গে জীন বংশপরম্পরায় বহন করে নিয়ে চলেছে নানান বৈশিষ্ট্য, কিন্তু মজা এই যে, সে সমস্ত বৈশিষ্ট্য হয়ত দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থেকে গেল। তারপর অনেককাল পরে এমন একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করল যেটা হয়ত ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ আগে দেখা গিয়েছিল। এই যে বৈশিষ্ট্যের পুনরাগমন, এতে অবাক হবার কোন কারণ নেই। এতে আকস্মিকতারও কিছু নেই। বংশানুক্রম-বৈশিষ্ট্য দীর্ঘ দিন অপ্রকাশিত হলেও হারিয়ে যায় না, চাপা থাকে মাত্র। আর প্রকাশ হওয়া বা না হওয়া একটি নিয়মের ইতিহাস। এ নিয়ম উদ্ভিদ জগতে ও প্রাণী জগতে সমভাবে প্রযোজ্য।

মেণ্ডেলের আবিষ্কার

প্রকৃতির রাজ্যে এই যে নিয়ম আর শৃঙ্খলার আইন তার দিকে প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি যাঁর পড়েছিল তাঁর নাম গ্রেগর মেণ্ডেল।

অস্ট্রিয়ার ব্রুন গির্জার এক ধর্মযাজক ছিলেন মেণ্ডেল। আজ থেকে একশো বছর আগের ঘটনা। বাগানের এক কোণে মটরশুঁটি নিয়ে দীর্ঘ আট বছর পরীক্ষামূলক কাজ করে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর 'উত্তরাধিকার সূত্র'। সেটা ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের কথা। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, তাঁর এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোন সমাদরই পেল না সেদিন। এমনকি, তাঁর এক বন্ধু, যিনি একজন বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ ছিলেন সেকালের, তিনিও এই কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অসমর্থ হলেন। আশাহত ও বিতৃষ্ণ মেণ্ডেল মারা গেলেন ১৮৮৪ সালে। তাঁর মৃত্যুর ষোল বছর পরে, ১৯০০ সালে, প্রায় একই সঙ্গে পৃথিবীর তিন বিভিন্ন স্থান থেকে তিন বিজ্ঞানী তাঁর কাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁরাই তাঁর কাজের বিস্ময়কর ব্যাখ্যা ও প্রতিভার পরিচয় সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করে দেন। মজা এই, যে, মেণ্ডেলের সেদিনের আবিষ্কার আজও প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

মটর গাছের নানারকম বৈশিষ্ট্য মেণ্ডেল লক্ষ্য করেছিলেন। কোন গাছ হয়ত বেঁটে আর ঝোপড়া ধরনের, আবার কোন গাছ লম্বা আর লতানে, কোন গাছের বীজ হলদে, কোন গাছের আবার সবুজ ; কারো ফুল সাদা আর কারো বা রঙিন। এইভাবে, আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য খুঁজে তিনি মোট সাত রকমের বৈশিষ্ট্যের দেখা পেয়েছিলেন। তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন যে, বংশপরম্পরায় সেই বৈশিষ্ট্যগুলোই ফিরে ফিরে আসে। তার কারণ, মটর গাছের ফুলে পরাগ-সংযোগ ঘটে স্ব-পরাগে (Self Pollination)। অতি সহজে স্ব-পরাগ-সংযোগ এড়িয়ে, কৃত্রিম উপায়ে এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে এনে পরীক্ষা চালানোর সফল সম্ভাবনায় মটরগাছ মেণ্ডেলের চোখে এক আদর্শ গাছ হিসেবে প্রতিভাত হল।

যে সাত প্রকার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তা সবই এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে বর্তায় কি না, সে সম্বন্ধে স্থির-

নিশ্চয় হবার জন্যে প্রথম একটি পরীক্ষা হল। পরীক্ষায় দেখা গেল, তাঁর পূর্ব-অনুমানই ঠিক ; এক পুরুষের বৈশিষ্ট্য পরের পুরুষে ঠিক-ভাবেই এসে পৌঁছেছে। লম্বা গাছ পরের পুরুষে লম্বা গাছেরই সৃষ্টি করেছে ; সবুজ-বীজওয়ালা গাছ সবুজ-বীজওয়ালা গাছই তৈরি করেছে। তিনি এগুলোর নামকরণ করলেন, 'খাঁটি চরিত্র' (Pure characteristic)।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় তিনি বেছে নিলেন দুই বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ দুটি গাছ। যেমন, লম্বা গাছ ও বেঁটে গাছ। এই দুই গাছের মিশ্রণে যে বীজ উৎপন্ন হবে তা থেকে কেমন গাছ হবে ? লম্বা, না বেঁটে ? না মাঝামাঝি ? দেখা গেল সব গাছই হয়েছে লম্বা। লম্বা গাছের পরাগ লেগে বেঁটে গাছে বীজ ধরলেও লম্বা, আর বেঁটে গাছের পরাগ লেগে লম্বা গাছে বীজ ধরলেও তা লম্বাই হল। হলদে বীজ ও সবুজ বীজের গাছের মধ্যে সংযোগ করে পরের পুরুষে পেলেন সব হলদে বীজ। মসৃণ বীজ আর কোঁকড়ানো বীজের সংযোগে পেলেন সব মসৃণ বীজ। এইভাবে সাতটি বিভিন্ন গুণের সংযোগে তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে, একটি করে গুণ পরবর্তী পুরুষে হারিয়ে যাচ্ছে ; যেমন, বেঁটে গুণ, সবুজ রঙের গুণ ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষে উৎপন্ন বর্ণসংকর বীজ নিয়ে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্তেই লুকিয়ে ছিল ইতিহাস সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই পরীক্ষার ফলেই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে দুটি মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল।

প্রথম পরীক্ষা ছিল লম্বা গাছ ও বেঁটে গাছের মধ্যে সংযোগ সাধন। এই সংযোগের ফলে উৎপন্ন বীজ থেকে বর্ণসংকর প্রথম পুরুষে সব গাছই হয়েছিল লম্বা। এইরকম লম্বা গাছের বীজ থেকে যে গাছ জন্মালো, তাদের ফুলে পরাগ-সংযোগ করায় সৃষ্টি হল বীজের। সেই বীজ থেকে যে গাছ জন্মালো তার কিছু লম্বা আর কিছু বেঁটে হল—মাঝামাঝি বলে কিছু নেই।

আনুপাতিকভাবে $\frac{৩}{৪}$ লম্বা, আর $\frac{১}{৪}$ বেঁটে। মেণ্ডেলের চোখে হারানো বৈশিষ্ট্যের (বেঁটে) পুনঃপ্রকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে ধরা পড়ল। একে-একে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং একই সঙ্গে দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে পরীক্ষা (যেমন—লম্বা গাছে লাল ফুল এবং বেঁটে গাছে সাদা ফুল) তাতেও একই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার পুনঃপ্রকাশ হল।

বর্ণসংকর দ্বিতীয় পুরুষের বেঁটে গাছ পরবর্তী সব পুরুষেই বেঁটে গাছেরই সৃষ্টি করল। আর লম্বা গাছের বীজ পরবর্তী পুরুষে আবার যেমন কিছু লম্বা গাছের সৃষ্টি করল তেমনি কিছু বীজ থেকে পুনরায় লম্বা এবং বেঁটে উভয় রকম গাছেরই সৃষ্টি হল সেই একই রকম ৩ : ১ অনুপাতে।

মেণ্ডেল তাঁর পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রতিটি গাছের সমগ্র চরিত্র কতগুলো ছোট-ছোট চারিত্রিক সমষ্টি। লম্বা গাছ ও বেঁটে গাছের মধ্যে সংযোগ করাতে প্রথম পুরুষে সব গাছ লম্বা হওয়ায় এবং দ্বিতীয় পুরুষে আবার বেঁটে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফিরে আসায় তিনি অভিমত দেন যে, গাছের মধ্যে এমন কিছু আছে যা তার বৈশিষ্ট্য (যেমন—লম্বা, বেঁটে ইত্যাদি) নিরূপণ করে। তিনি সেই অজানা বস্তুর নামকরণ করেন নির্ধারক (Factor)। আজ আমরা তাকেই জীন বলি। কতগুলি গাছ লম্বা ও কতগুলি গাছ বেঁটে হওয়ায় তিনি যুক্তি দেখান যে, এই নির্ধারকগুলি থাকে জোড়ায় জোড়ায়।

এই তথ্য থেকে মেণ্ডেলের যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তা হল এই যে, সেকালে জীন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না, এমনকি ক্রোমোসোম সম্পর্কেও তাঁর কোন জ্ঞানই ছিল না।

প্রথম পুরুষের লম্বা গাছ পূর্ববর্তী খাঁটি লম্বা গাছের তুলনায় যে তফাতযুক্ত তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রথম পুরুষের লম্বা গাছে বেঁটে হওয়ার বৈশিষ্ট্যও উপস্থিত, সেই মুহূর্তে প্রকাশ না

পেলেও যা পরের পুরুষে প্রকাশিত হয়। দু-ধরনের বৈশিষ্ট্য একত্রে মিলিত হলে প্রবল গুণ দুর্বল গুণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে দুর্বল গুণকে চাপা দিয়ে রাখে। লম্বা আর বেঁটে গাছের বেলায় লম্বা গুণ 'প্রধান' (Dominant) এবং বেঁটে গুণ 'অস্ফুট' (Recessive) বলেই মেণ্ডেল অভিহিত করেন এদের।

লম্বা ও বেঁটে, এই দু-প্রকার গুণের সমন্বয় সত্ত্বেও কিছু বীজ বংশ-পরম্পরায় কী করে খাঁটি থেকে যায়, তার যুক্তি হিসেবে মেণ্ডেল নিজের পরীক্ষার ফল থেকে এ রকম সিদ্ধান্তে আসেন: একটি গ্যামেটে দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্যের একটি মাত্র উপস্থিত ছিল। সেই হিসেবে একটি গ্যামেটে লম্বা হওয়ার বৈশিষ্ট্য ও অন্য গ্যামেটে বেঁটে হওয়ার বৈশিষ্ট্য যুক্ত ছিল। কিন্তু লম্বা ও বেঁটে এই উভয় গুণ কোন গ্যামেটেই ছিল না। সেইরকম এক-এক গুণসম্পন্ন দুটি গ্যামেটেই যখন মিলন হয়ে জাইগোট সৃষ্টি করল, তখন জাইগোটে দুটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এসে উপস্থিত হল; যদিও লম্বা গুণ প্রধান বলে প্রথম পুরুষে সব গাছই হল লম্বা।

জাইগোটের মধ্যে বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আবার গ্যামেট সৃষ্টির কালে নানাভাবে পৃথক হয়ে গেল (Segregation)। তাই দেখা গেল, প্রথম পুরুষের জাইগোট থেকে যখন নতুন চারা উৎপন্ন হল তখন চারিত্রিক পৃথকীকরণের দরুন লম্বা ও বেঁটে গাছের অনুপাত দাঁড়াল ১ : ২ : ১। তার মানে, ¼ খাঁটি লম্বা (দুই গ্যামেট থেকে লম্বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করার দরুন), ¼ খাঁটি বেঁটে, (একই রকম দুটি বেঁটে বৈশিষ্ট্য অর্জন করার দরুন) এবং বাকি অর্ধেক লম্বা, কিন্তু অখাঁটি, অর্থাৎ লম্বা এবং বেঁটের উভয় গুণ সম্বলিত হয়েও, লম্বা গুণ-প্রধান হওয়ার দরুন গাছগুলো হল লম্বা।

বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পৃথকীকরণ সম্ভব হয় ক্রোমোসোমের হ্রাস বিভাজন কালে। এইভাবে গ্যামেটের অবিমিশ্রতা (Purity of gametes) রক্ষিত হয়।

মেণ্ডেল আবিষ্কৃত 'সূত্রের' উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নানা পরীক্ষা করে আজকের 'জেনেটিক্‌স্‌' বিজ্ঞানকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে নতুন আবিষ্কারের জ্ঞানও সংযোজিত হয়েছে। এর মধ্যে 'পরিবেশের প্রভাব' অন্যতম। কোন একটি উদ্ভিদ বা প্রাণীর গঠন নিয়ন্ত্রণে পরিবেশের প্রভাব আধুনিক জেনেটিক্‌সে স্বীকৃত।

ক্রোমোসোমই যে বংশপরম্পরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করে নিয়ে যায় তা আবিষ্কৃত হয়েছে 'মেণ্ডেল সূত্রের' অনেক পরে। ক্রোমোসোমের ব্যবহার ও মেণ্ডেল সূত্রের মিলিত জ্ঞান এক নব দিগন্তের নির্দেশ এনে দেয়।

বিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের ভূমিকা বিশেষ মূল্যবান। নতুন ধরনের উদ্ভিদের উদ্ভব তখনই সম্ভব হয় যখন কোন কারণে জীনের কোন অংশের পরিবর্তন ঘটে, হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়।

মিউটেশন

আমাদের চেনা জানা গাছপালা ও পশুপাখিদের মধ্যে হঠাৎ করে এক একটা নতুন রকমের চারিত্রিক লক্ষণ ফুটে ওঠে। যে গাছে রঙিন ফুলই ফোটে, হঠাৎ হয়ত দেখা গেল একটি ডালে ফুটে আছে একটি সাদা ফুল। এ বৈশিষ্ট্য তার পূর্ব-পুরুষের ছিল না। কিন্তু মজা এই যে, এই নতুন বৈশিষ্ট্য তার ভবিষ্যত বংশধরদের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক ধারা হিসেবেই ন্যস্ত হতে পারে। এভাবে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির নাম 'মিউটেশন' (Mutation)। আরও পরিবর্তন হতে পারে, হঠাৎ যদি ক্রোমো-সোমের সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে নতুন ধরনের গাছের উদ্ভব হতে পারে। আবার যদি পুরোনো কথা অর্থাৎ নিম গাছে শিম ধরার কথায় ফিরে আসি তাহলে বলা চলে, এমন হতে পারে

যে, নিমের ফলগুলো যেমন আকারে খুব বড় আর সুস্বাদু হয়ে পড়তে পারে, শিমও তেমনি বড় আর ভিন্ন স্বাদের হয়ে পড়তে পারে বৈকি। তফাতও যেমন হল, মিলও কিছু অবশ্যই থাকল। কিন্তু নিম গাছে শিম ধরা—এমনি ধরনের ঘটনা নৈব নৈব চ। 'কাবলি ছোলা' হল মিউটেশনের একটি উদাহরণ। সাধারণ ছোলা ও কাবলি ছোলার তফাত আকারে আর রঙে, কিন্তু দুটোই ছোলা।

মানুষ এখন নকল উপায়ে—কখনো তাপ কমিয়ে বাড়িয়ে, কখনো রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে, কখনো বা এক্স-রে ব্যবহার করে খোদার উপর খোদকারি চালাচ্ছে নতুন আর উন্নত ধরনের উদ্ভিদের সন্ধানে। শাকসব্জি, শস্য, ফল ফলারি, মূল্যবান ও সৌখীন ফুলের গাছ প্রভৃতিতে বেশি উৎপাদন বা উন্নততর ফুল ফল পাতা তৈরি করার জন্যে তাই নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে অনলসভাবে।

কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে শক্তিশালী নতুন গম গাছ পাওয়া গেছে। সেইসঙ্গে রোগ সহ্য করার ক্ষমতাও সে গাছের বেড়েছে। তামাক পাতার আকার আর সংখ্যা বৃদ্ধি করাও সম্ভব হয়েছে। ভুট্টায় বেড়েছে স্বাদ, আকার হয়েছে বড়। আপেল, পীচ, নাসপাতি, লেবু, কমলালেবু প্রভৃতি নানা গাছের ফলের হয়েছে প্রভূত উন্নতি।

এ ধরনের উন্নতি বিদেশে বেশি হলেও, আমাদের দেশেও চাল, গম, আখ, তুলো, পাট ও ফল-ফলারি নিয়ে বেশ কাজ হয়েছে এবং তা থেকে উন্নত ধরনের গাছও অনেক পাওয়া গেছে।

নতুন ও উন্নত ধরনের গাছপালা ও ফলমূল উৎপাদনের ক্ষেত্রে দু-জন বৈজ্ঞানিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর তাঁদের দেশের শস্য, ফুল, ফল আজও বহন করে চলেছে। বৃক্ষ উৎপাদনের সঙ্গে (Plant breeding) এঁদের নাম জড়িত থাকবে চিরদিন।

লুথার বারব্যাঙ্ক (Luther Burbank, ১৮৪৯—১৯২৬) তাঁর ক্যালিফোর্নিয়ার খামারে বহু নতুন ও বিভিন্ন ধরনের গাছের সৃষ্টি করেন। তার মধ্যে যেমন ডেইজি ও পপিফুলের নতুনত্ব ছিল, তেমনি নতুন রকমের ফলও ছিল অনেক রকম। প্লাম ও অ্যাপ্রিকট (Plum & Apricot) এই দুইয়ের মিশ্রণে তৈরি করেন 'প্লামকট' (Plumcot)। নতুন ফলের সৃষ্টি করেন স্কোয়াশ ও কুমড়োর সংমিশ্রণে। আলু আর টম্যাটোর মিশ্রণে তার শেষ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। এমন জাতের গাছ তৈরি করতে তিনি চেয়েছিলেন যে গাছে মাটির উপর ফলবে ফল সারা বছর ধরে, আর মাটির নিচে আলু বছর-ভোর। কিন্তু তাঁর এই পরীক্ষা সফল হয় নি।

সমগোত্রীয় দু-জাতের গাছে বহু সংমিশ্রণ তিনি ঘটিয়েছেন সফলতার সঙ্গে। তাঁর অন্য সফলতা হল পাতলা খোলার আখরোট, বিচিহীন প্লাম, গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে কাঁটাহীন ক্যাকটাস প্রভৃতি বিচিত্র এবং নতুন গাছ সৃষ্টি।

অন্য বৈজ্ঞানিক হলেন রাশিয়ার আই. ভি. মিচুরিন (I. V. Michurin, ১৮৫৫—১৯৩৫)। সারা জীবন নতুন ও উন্নত ধরনের বহুরকম ফল সৃষ্টি করে তিনি তাঁর নিজের বিখ্যাত উক্তির প্রমাণ করেছেন, 'প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না, সে দাক্ষিণ্য আমাদের জয় করে নিতে হবে।' আপেল, পিয়ার, টক ও মিষ্টি চেরি, প্লাম, আঙুর, বাদাম প্রভৃতি কত ফলের যে উন্নতি হয়েছে মিচুরিনের পরীক্ষায় তার শেষ নেই।

মিচুরিনের উদ্ভাবিত পদ্ধতির অনুসরণে সম্প্রতি রাশিয়ায় চেষ্টা হয়েছে দূরবর্তী জাতের সংমিশ্রণে নতুন বর্ণসংকর গাছ সৃষ্টির। চেষ্টা হয়েছে বারো মাস গম ফলবে এমন গাছ তৈরির; সেই-সঙ্গে বড় গাছে বারোমাস মটরশুঁটি ধরবে এমন গাছেরও।

এমনিভাবে যদি বিজ্ঞান এগোতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে পুরোন গাছগুলো চেনা যাবে তো?

উদ্ভিদের খাবার তৈরির কারখানা দেখতে বের হয়েছিলাম। দেখলাম, দিনে রাতে কী নিঃশব্দ ব্যস্ততায় প্রতিটি সবুজ কোষে তৈরি হচ্ছে খাদ্য। তাছাড়া জমা হয়ে থাকছে খাদ্য উদ্ভিদের দেহে। এর প্রয়োজন উদ্ভিদের তক্ষুনি অবশ্য হচ্ছে না। মজুদ খাদ্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে চলছে উদ্ভিদের অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপ। শ্বাস গ্রহণ চলছে, শাখায় শাখায় ফুল ফুটছে, সৃষ্টি হচ্ছে ফলের যার মধ্যে সুপ্ত বীজ নতুন গাছ-সৃষ্টির অপেক্ষায় সুদিনের দিকে তাকিয়ে আছে। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার দায়িত্বও বয়ে চলেছে এরা। উদ্ভিদের পক্ষে সবকিছু সম্ভব হয়েছে উদ্ভিদ জীবন্ত বলেই। প্রাণ আছে বলেই এক উদ্ভিদ থেকে আরও উদ্ভিদের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রাণ থেকে নতুন প্রাণের সৃষ্টি, প্রকৃতির এ সেরা খেলায় তাই উদ্ভিদও এক মস্ত অংশীদার।

প্রাণ কী?

কিন্তু 'প্রাণ' কী? এর কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। কতগুলো অবস্থার ভিতর দিয়ে প্রাণের প্রকাশ পাওয়া যায়, আমরা জানি। জীবন্ত অবস্থার একটা ক্রম-পরিণতি আছে। এতক্ষণের আলোচনায় আমরা দেখেছি উদ্ভিদও প্রাণীদের মতই একটা ক্রম-পরিণতি মেনে চলে। একটা আপাতশুষ্ক বীজের মধ্যে যে প্রাণ লুকোনো থাকে, সরস মাটিতে পড়ে তা অঙ্কুরিত হয়। জীবনের শুরু হয় এভাবে, আবার শেষ হয়ে যায় নতুন বীজ সৃষ্টি হবার পরে; একজনের আবির্ভাবে অন্যজন বিদায় নেয়। জন্ম থেকে মৃত্যু, এই যে ক্রম-পরিণতি, এটা জীবনের লক্ষণ। আর বেঁচে থাকতে গেলে তার যা যা করণীয় তা সবই সে সফলতার সঙ্গে

সম্পন্ন করে। খাদ্য তৈরি করে তা গ্রহণ করে দৈহিক বৃদ্ধি ঘটাতে, আত্মরক্ষা করে, বংশবৃদ্ধি করে, এমনি আরও বহু কাজ।

উদ্ভিদের চলাফেরা

জীবনের আর-এক লক্ষণ গতিশীলতা। এই এক ক্ষেত্রে প্রাণীর সঙ্গে উদ্ভিদের রয়েছে মস্ত গরমিল। শেকড়ের জালে আবদ্ধ গাছপালার গতি খুবই সীমাবদ্ধ। আমরা এমন আশা করি না যে, গাছেরা ছুটোছুটি করে বেড়াবে খাদ্যসংগ্রহের জন্যে কিম্বা শত্রুর আক্রমণ এড়াতে দৌড়ে পালাবে বা তাকে আক্রমণ করতে ছুটে যাবে। এ ধরনের আশা করলে অবশ্যই নিরাশ হতে হবে। তবু এটা সত্যি যে, নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করবার ক্ষমতাও কিছু-সংখ্যক উদ্ভিদের আছে।

অন্যদিকে, আমরা যদি অসমান বৃদ্ধির জন্যে বা বাইরের কোন কারণে নড়াচড়ার কথা ভাবি তাহলে অজস্র উদাহরণ আমরা উদ্ভিদ জগতে পাব। উদ্ভিদের প্রতিটি অংশে—শেকড়ে, কাণ্ডে, পাতায় আছে গতির নমুনা। কাজেই একথা বলা চলে যে, উদ্ভিদ-জগতও প্রাণীজগতের মত সমান গতিশীল, এবং সে গতি সর্বক্ষণ বর্তমান।

উদ্ভিদ জগতে দু-ধরনের গতি আমরা লক্ষ্য করি। এক ধরনের গতির জন্যে দায়ী সে নিজে, অন্য ধরনের গতি বাইরের কোন কারণে সঙ্ঘটিত। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত যে গতি, সেটা প্রাণী জগতে অত্যন্ত প্রকট এবং সেটাই হল প্রাণীর জীবন্ত অবস্থার বহিঃপ্রকাশ। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গতির মধ্যে আছে উদ্ভিদের দেহ-কোষে আবদ্ধ প্রোটোপ্লাজমের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাবার ক্ষমতা। নিম্নশ্রেণীর এককোষী উদ্ভিদ, ইউগ্লেনা (Euglena), জলে সুন্দর ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারে। এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াবার জন্যে এদের কোষে যুক্ত থাকে একটি সরু চুলের মত জিনিস, যার

সাহায্যেই এরা ছুটে বেড়ায়। ছুটে বেড়াবার জন্যে যে বিশেষ চেহারা তাকে বলে ফ্ল্যাজেলা (Flagella)। এই ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে ক্ল্যামিডোমোনাস (Chlamydomonas) নামের শেওলা আলোর দিকে ছুটে আসে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রাখলে কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমের গতি দেখা যায় পাতা-শেওলার পাতায়।

বড় জাতের গাছের বনচাঁড়াল একটি সুন্দর উদাহরণ, যেখানে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত গতির দেখা পাই। বনচাঁড়াল গাছের পাতাগুলো যৌগিক (Compound)। একটি বড় পাতার দুপাশে থাকে দুটি ছোট পাতা, এই ছোট পাতাদুটি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিচে উপরে নড়তে থাকে। যদি যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত থাকে পাতায়, তাহলে অন্ধকার হয়ে গেলেও পাতার নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে। মাঝের বড় পাতাটি কখনই নড়ে না, ওটা স্থির থাকে সর্বদাই। কামরাঙা গাছের পাতায় এবং অন্য আরও কয়েক রকম পাতায়ও স্বতঃস্ফূর্ত গতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

আবার, বাইরের দিক থেকে কোন উত্তেজনার কারণ ঘটলেও উদ্ভিদ তাতে সাড়া দেয়। সেটা হতে পারে কোন বস্তুর সঙ্গে স্পর্শ দ্বারা আলো, তাপ বা রাসায়নিক শক্তির প্রভাবে।

নানারকম লতা বাঁশ, দড়ি প্রভৃতি নানারকম বাইরের জিনিসকে আশ্রয় করে জড়িয়ে ধরে বেয়ে ওঠে। বাঁশ বা অন্য আর কিছু যা পাকিয়ে ধরে গাছ উঠতে চায় তার সংস্পর্শেই এ ব্যাপারটি ঘটে। অনবরত লেগে থাকার দরুন, যে অংশ লেগে থাকে সে অংশের বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়। অন্যদিকের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার ফলে একদিকের অংশ বেড়ে যেতে থাকে এবং আশ্রয়কে পেঁচিয়ে ধরে লতা বেয়ে ওঠে। এও এক ধরনের নড়া-চড়ারই ক্ষমতা।

গাছপালার আলোর প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। আলো না পেলে সবুজ পাতা খাবার তৈরি করতে পারে না। তাই স্বাভাবিক কারণে আলোর প্রতি গাছেদের আকর্ষণ রয়েছে। গাছের সবুজ অংশ

বাড়তে থাকে আলোর উপস্থিতিতে। উল্টোদিকে শেকড় বাড়তে থাকে আলো থেকে দূরে সরে গিয়ে মাটির অন্ধকারে। গাছের পাতাগুলো এমনভাবে সাজানো, আর কাণ্ড পাতাগুলো এমনভাবে ধরে রাখে যাতে করে পাতাগুলো সারা দিন সবচেয়ে বেশি আলো পেতে পারে।

এমন একটা জায়গায় যদি একটা গাছ রাখা যায় যেখানে পুরো জায়গাটাই অন্ধকার আর ছোট্ট একটি ছিদ্রপথে আলো প্রবেশ করছে, তাহলে দেখা যাবে যে, গাছ বেঁকে সেই আলোর উৎসের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাইরের আলো গাছকে প্রভাবিত করছে আলোর দিকে এগিয়ে যেতে।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে শিশু শেকড় যায় শক্তির কেন্দ্রস্থলে। আর একই কারণে শিশু কাণ্ড যায় শক্তির বিপরীত দিকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, একটি অঙ্কুরিত বীজ কঠিন চাপ অগ্রাহ্য করেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে শক্তির কেন্দ্রের দিকেই এগোয়।

রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া দেখায় ড্রসেরার শুঁয়াগুলো। পাতার উপর নাইট্রোজেন-জাতীয় পদার্থের সংস্পর্শ হলেই শুঁয়াগুলো তাতে সাড়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো গুটিয়ে আসে।

রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়াতেই একটি পরাগ গর্ভমুণ্ডে পড়ে পরাগ-নল সৃষ্টি করে ডিম্বকের দিকে অগ্রসর হয়। গর্ভমুণ্ড, গর্ভদণ্ড ও গর্ভকোষ থেকে নির্গত শর্করা দ্বারাই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

আলোর মত জলের প্রয়োজনও উদ্ভিদের অত্যন্ত বেশি। জলের প্রয়োজনে শেকড় তাই কাতরতা দেখায়। এমন সব জায়গায় গাছ জন্মায় যেখানে জল সমানভাবে এবং নিয়ম-মাফিক থাকে না। সেসব জায়গায় জলের প্রয়োজনে শেকড় বেঁকে চুরে জলের কাছাকাছি নিজেকে নিয়ে হাজির করে।

দিনের আলোয় ফুল ফোটে আর রাতের অন্ধকারে অনেক ফুল গুটিয়ে বুজে আসে। এ সবই তাদের নড়াচড়া করতে পারার ক্ষমতারই নিদর্শন। এসব নির্ভর করে তাপ আর আলোর উপরে। কতগুলো ফুল তাপ বৃদ্ধি পেলে ফোটে, আবার তাপ যখন কমে যায় ফুলগুলোও বুজে আসে। যে-সব ফুল অন্ধকারে ফোটে আর আলোয় বন্ধ করে রাখে পাপড়ির থাক, তারা প্রভাবিত হয় উল্টোভাবে। পাতার বায়ুপথ (Stomata) ততক্ষণই খোলা থাকে যতক্ষণ রৌদ্র থাকে বর্তমান। সূর্যের আলো নিভে গেলে বায়ুপথও বন্ধ হয়ে যায়।

শিরীষ, আমলকি, কৃষ্ণচূড়া, তেঁতুল প্রভৃতি গাছের পাতার ছোট-ছোট পত্রকগুলো, কখনো বা পুরো পাতাটাই, আলো নিভে আসার সঙ্গে সঙ্গে নুয়ে পড়ে। ভোরের আলো ফুটলে তবেই আবার পাতা মেলে দেয় এসব গাছ। ঘুমিয়ে আমরা যেমন বিশ্রাম নিই এও ঠিক তেমনি। এসব গাছ পাতাগুলো ভাঁজ করে রাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় আর কি। রাতের বেলা যাতে তাপক্ষয় বেশি না হয় তাই এই ব্যবস্থা।

বিভিন্ন গাছপালার নড়চড়ার মধ্যে সবিশেষ পরিচিত হল লজ্জাবতী লতার স্পর্শকাতরতা। পাতার গায়ে খুব আস্তে হাত ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট-ছোট পাতাগুলো টুপ-টুপ করে শুয়ে পড়ে। সামান্য স্পর্শে যাদের এই অবস্থা, একটু জোরে আঘাত করলে তাদের যে কী অবস্থা হবে তা ভাবলে অবাক হতে হয় বৈ-কি! তাপের কাছে ধরলে বা বিজলির স্পর্শ করালেও লজ্জাবতী পাতা নিজেকে নুইয়ে ফেলে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবে যে, লজ্জায় তারা কিন্তু পাতা নোয়ায় না। লজ্জাবতী লতার পাতাগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পাতার গোড়া, যেখানটা ডালের সঙ্গে জোড়া, সে জায়গাটা একটু ফোলা মতন দেখতে। পাতার এ রকম ফোলা গোড়ার নাম পালভাইনাস, (Pulvinous)। ফোলা

গোড়ার তলার দিকে যে কোষগুলো তা ভর্তি থাকে জলে। কোষগুলো বেশ টান-টান হয়ে থাকে সব সময়ে। যখনই উপরের পাতায় হাত পড়ল, গোড়ার কোষগুলো থেকে অমনি কিছু জল বেরিয়ে গিয়ে কোষগুলোকে দুর্বল করে দিলে। ফলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সে উপরের পাতাগুলোকে ধরে রাখতে পারল না। ফলে, আমরা দেখলাম পাতাগুলো নুয়ে পড়েছে।

দৌড়-ঝাঁপ ছুটোছুটি করতে না পারলেও গতির মধ্যে যে প্রাণের প্রকাশ, উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাও দেখাচ্ছে।

প্রাণীর কাছে গতি তার বংশরক্ষার সহায়ক। এক জায়গায় থাকে বলে উদ্ভিদের বংশরক্ষার উপায় তাই নানাবিধ। একদিকের অসুবিধে প্রকৃতিই পূর্ণ করে দিয়েছে অন্যভাবে।

প্রতিটি উদ্ভিদের জীবনবৃত্ত সীমাবদ্ধ, আসলে প্রতিটি জীবনই সীমাবদ্ধ, তা সে উদ্ভিদই হোক বা প্রাণীই হোক না কেন। অতীত ইতিহাসের সাক্ষী-স্বরূপ 'অক্ষয় বট' বা দীর্ঘজীবী 'রেড উড ট্রি' কোন অমরতার বর নিয়ে বিরাজ করছে না। একদিন-না-একদিন পৃথিবীর বুক থেকে সকলকেই বিদায় নিতে হবে। কিন্তু বেঁচে থাকার ইচ্ছে সবাইয়ের অন্তরে। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকামাকড়, গাছপালা সকলেরই সেই একই ইচ্ছার প্রকাশ। সীমাবদ্ধ জীবনে বংশধর সৃষ্টি করে নিজের নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করে যাওয়া আর কি।

সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে, যুগ থেকে যুগান্তরে সে ধারাকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এবং এক থেকে বহু হবার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্যে প্রকৃতি বিভিন্ন উপায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে উদ্ভিদ জগতে। একটি গাছের প্রতিটি অঙ্গ থেকে নতুন জীবন সৃষ্টির উপায়ই হল প্রকৃতির একটি বিশেষ দান।

অঙ্গজ জনন (Vegetative multiplication) উদ্ভিদ জগতে এক থেকে বহু হবার সর্বাপেক্ষা সহজ এবং সরল উপায়। উদ্ভিদের এক অংশ ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আদি উদ্ভিদ থেকে শুরু করে সে নতুন জীবনযাত্রা। আবার ঘটে পুনরাবৃত্তি। অঙ্গজ জননের এই এক প্রক্রিয়া। 'ঈস্ট" (Yeast) নামক ছত্রাকের আমরা দেখেছি এই উপায়ে বহু হবার সফল প্রয়াস। একটি ঈস্ট কোষের ধারে একটি ছোট্ট কুঁড়ি দেখা দিল, ক্রমে তা বৃদ্ধি পেয়ে বড় হল, তারপর তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে নতুন ঈস্ট হিসেবে জীবন শুরু করল। এরকম একাধিক কুঁড়ি একই সময়ে তৈরি হতে পারে আর একই সঙ্গে এক থেকে অনেক জীবনের সৃষ্টি হতে পারে।

একে বলে 'কুঁড়ি থেকে ভাগ হওয়া' (Budding)। জীবাণু, ছত্রাক ও শেওলার মধ্যে এককোষী উদ্ভিদ একটি কোষকেই দু-ভাগে ভাগ করে দুটি নতুন এককোষী উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। এর নাম বিভক্ত-করন (Fission)।

ফার্ন নামে যে উদ্ভিদ তারা সাধারণত অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে মূল থেকে নতুন চারার সৃষ্টি করে। কিন্তু এমন অনেক ফার্ন আছে, যাদের নাম 'চলমান ফার্ন' (Walking fern),



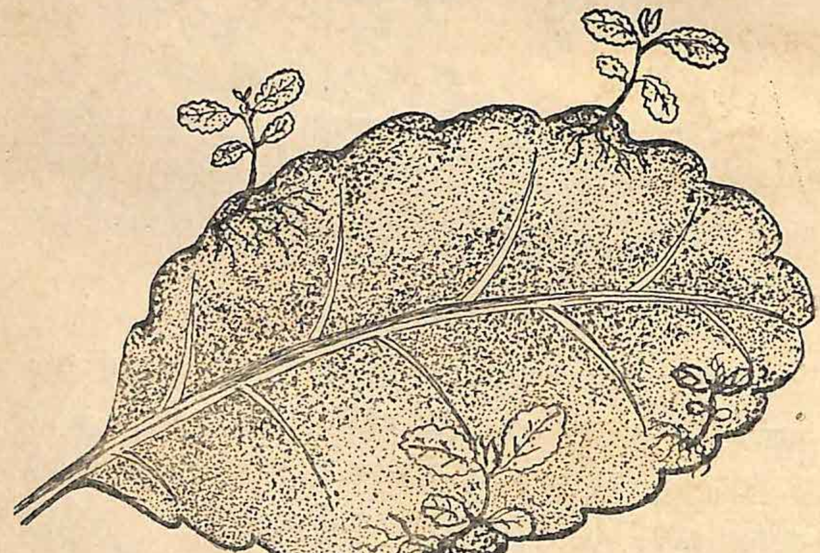
চলমান ফার্ন

এরা পাতার ডগায় অবস্থিত কুঁড়ি থেকে নতুন গাছের সৃষ্টি করে। পাতার ডগা নুয়ে পড়ে মাটিতে, আর নুয়ে-পড়া ডগার মাথার কুঁড়ি অঙ্কুরিত হয়ে সৃষ্টি করে শেকড়ের। এ শেকড় মাটিতে গেঁথে গিয়ে জন্ম দেয় নতুন ফার্ন গাছের।

আলু, পেঁয়াজ এবং আদা যে অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে তা আমাদের জানা। আলু, পেঁয়াজ, আদা কিন্তু আসলে শেকড় নয়, কাণ্ডেরই পরিবর্তিত রূপ। বাড়তি খাদ্য জমিয়ে রেখে চেহারাগুলো ভারি ভারি করে তুলেছে, আর আশ্রয় নিয়েছে মাটির নিচে। এদের গা-ভর্তি অনেক কুঁড়ির সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি কুঁড়ি থেকে নতুন নতুন চারা সুসময়ে মাটি ফুঁড়ে মাথা তোলে।

কাণ্ডে অবস্থিত কুঁড়ি থেকে যেমন নতুন গাছের সৃষ্টি হয়, তেমনি শেকড়ে অবস্থিত কুঁড়ি থেকেও নতুন গাছ গজাবে তাতে আর আশ্চর্য কী? শেকড়ের কুঁড়ি শুনতে একটু অবাক লাগতে পারে। শেকড় যেখানে স্বাভাবিক চেহারাকে পরিবর্তিত করে ফেলে, যেমন—রাঙা আলু, তখন সে শেকড়ে অনেক কুঁড়ি সুপ্ত অবস্থায় থাকে (Adventitious bud)। এসব থেকেই পরে নতুন নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। পটল গাছও শেকড়ের কুঁড়ি থেকে জন্মায়।

পাতা থেকে নতুন গাছ জন্মায় পাথরকুচিতে। পাথরকুচির পাতার ধার ঘেঁষে (Margin) অনেকগুলো কুঁড়ি জন্মায় আর প্রতিটি কুঁড়ি থেকে এক একটি নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। পাথর-



পাথরকুচির পাতা

কুচির গাছ যেখানে জন্মায়, তার ধারে-কাছে তাই অজস্র ছোট ছোট নতুন চারার দেখা পাওয়া যায়। মোটা রসালো পাতা থেকে আরও অনেক গাছেরই এই একই উপায়ে নতুন চারা-সৃষ্টির ব্যবস্থা আছে।

সবকটি কুঁড়ি ফুল না ফুটিয়ে, তলার দিকের কিছু হয়ত পরিবর্তিত হল একটি গোল চেহারায়। একে বলে 'বালবিল' (Bulbil)। এই বালবিল মাটিতে পড়ে অঙ্কুরিত হবার ক্ষমতা পায়। অঙ্কুরিত হলেই নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। বালবিল শুধু-মাত্র মঞ্জরী থেকেই জন্মায় না, কোন-কোন গাছে পাতার কোণা থেকেও তৈরি হয় বালবিল, যেমন সেঞ্চুরি প্ল্যান্ট। মঞ্জরী থেকে বালবিল তৈরির উদাহরণ দেখা যায় রসুন বা গ্লোব্বার মঞ্জরীতে।

আনারসের মাথার উপর যে পাতার মুকুট, তা থেকে প্রায়ই নতুন গাছ হয়। এইরকম পাতার সাজ কিছুসংখ্যক আনারসের গোড়ার দিকেও সাজানো থাকে। এ থেকেও নতুন নতুন চারা জন্ম নেয়।

কোন কোন গাছের আবার ডাল কেটে মাটিতে লাগিয়ে দিয়ে তা থেকে অতি সহজেই কতগুলো নতুন গাছ তৈরি করা যায়। গোলাপ, জবা প্রভৃতি গাছ এভাবে আমরা নিজেরাই বাড়িয়ে নিতে পারি। মূল্যবান ফলের গাছের ডালে ডালে কলম বেঁধে নতুন গাছ তৈরি করা সম্ভব। আম, জাম, পেয়ারা, লিচু প্রভৃতি গাছে কলম বাঁধার রেওয়াজ বহুল প্রচলিত।

অযৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি

'রেণু' (Spore) তৈরি করে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি অযৌন উপায়ে বংশ-বৃদ্ধির প্রক্রিয়া (Asexual Reproduction)। শেওলা আর ছত্রাকের এই উপায়ে বংশবৃদ্ধির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। রেণুগুলো কখনো-কখনো সরু চুলের মত বস্তুর উপস্থিতিতে (Cilia) গতিসম্পন্ন হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে। আর যখন রেণুতে 'সিলিয়া' থাকে না তখন এদের গতিও থাকে না, তখন তারা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। রেণু সাধারণত এককোষী এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি। ছত্রাকের যে রেণু

হয় সেগুলো অত্যন্ত হালকা এবং খটখটে শুকনো থাকে। রেণুর আবরণ হয় বেশ শক্ত। হালকা হওয়ার দরুন রেণুগুলো বাতাসে ভেসে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যায়। তাছাড়া আবরণ কঠিন হওয়ার দরুন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তন সহ্য করে রেণুগুলি অনেকদিন সজীব থাকে। এছাড়া ফার্ন ও মস্ গাছে তাদের জীবন-বৃত্তের একটা বিশেষ অবস্থায় রেণুর সৃষ্টি হয়, যা থেকে শুরু হয় তাদের পরবর্তী জীবন।

যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু উদ্ভিদ বংশবৃদ্ধি করে যৌন উপায়ে এবং সেজন্যে দুই বিভিন্ন প্রকারের 'গ্যামেট' সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। গ্যামেট সর্বদাই এককোষী, এবং আকারে খুবই ছোট। একক-ভাবে একটি গ্যামেটের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার কোন আশাই নেই। কেবলমাত্র যখন দুই বিপরীত ধরনের গ্যামেট মিলিত হয়ে 'এক' হয়ে যায় তখনই তারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষমতার অধিকারী হয়। দুই বিপরীত গ্যামেটের মিলনে যে নতুন বস্তুর সৃষ্টি হয় তাকে বলে 'জাইগোট' (Zygote)। জাইগোটই নতুন উদ্ভিদে পরিণত হয়।

দুই মিলনকারী গ্যামেট যখন দেখতে একই রকমের কিন্তু গুণে ভিন্ন তখন তাদের মিলনকে 'কনজুগেশন' (Conjugation) বলে উল্লেখ করা হয়। আর যখন দুই মিলনকারী গ্যামেট ভিন্ন চেহারার, স্ত্রী ও পুরুষ বলেই যখন তাদের সনাক্ত করা যায়, তখন তাদের মিলনকে বলে 'ফার্টিলাইজেশন' (Fertilisation) বা নিষিক্তকরণ। এমনিভাবেই বীজ তৈরি হয়।

আর বীজ-সৃষ্টি মানেই নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি।

ধরণীর বুকে প্রকৃতির রূপায়ন চলে দিন থেকে দিনে, ঋতু থেকে ঋতুতে। সবুজ অরণ্যানীর দিকে তাকালে সে পরিবর্তন কতই না স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উদ্ভিদের দেহে রঙ-বদল

বসন্তকালে সবুজ গাছপালা তাদের পুরোনো পোশাক বদলে নতুন সাজে সেজে নেয়। অনেক দায়িত্ব রয়েছে নতুন পাতার উপরে। তাই তারা সারা বছরের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। তখন কচি পাতার সবুজ রঙ ও ফুলের বর্ণবৈচিত্র্যে চোখ জুড়িয়ে যায় আমাদের।

বসন্তকালে কোন-কোন গাছে কচি নতুন পাতার রঙ থাকে লাল। পাতা লাল হয় অ্যান্থোসায়ানিন (Anthocyanin) নামে এক রঙিন কণিকা পাতায় তৈরি হওয়ার দরুন। অ্যান্থোসায়ানিন তৈরি হয় পাতার কোষগহ্বরে সঞ্চিত খাদ্য থেকে। ক্লোরোফিলের আবির্ভাবে লাল পাতাগুলো পরে স্বাভাবিক সবুজ হয়ে ওঠে।

ঋতুচক্র ঘুরে চলে। ক্রমে আসে হেমন্তের শেষে শীত। পাতা ঝরার সময় আসে। তার আগে জীর্ণ হয়ে আসে পাতা ; চাকচিক্য হারিয়ে, রঙের গাঢ়তা হারিয়ে ফিকে হয়ে যায়, কখনো রঙ হয় হলদে।

পাতায় রঙের পরিবর্তন নির্ভর করে আলো, তাপ ও আর্দ্রতার উপরে। গাছের বৃদ্ধিকালে পাতার রঙ থাকে গাঢ় সবুজ। সে সময় সবুজ কণিকাগুলো আলোর তীব্রতায় নষ্ট হলেও তক্ষুনি-তক্ষুনি আবার নতুন কণা তৈরি হয়ে যায় পাতার কোষের

তৎপরতায়। পাতার ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে সবুজ ছাড়াও অন্য রঙের কণিকা থাকে। এরা হল কমলা রঙের কণিকা ক্যারোটিন (Carotene) ও হলদে রঙের কণিকা 'জ্যান্থোফিল' (Xanthophyll)। সবুজ কণিকা ক্লোরোফিলের প্রাচুর্যে এই রঙ ঢাকা পড়ে থাকে তখনকার মত। শীতের শুরুতে যখন তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে, তখন নতুন করে ক্লোরোফিল তৈরি করা সম্ভব হয় না, এবং সামান্য যেটুকু ক্লোরোফিল অবশিষ্ট থাকে সূর্য-কিরণে তাও নষ্ট হয়ে যায়। তখন পাতায় দেখা দেয় হলদে রঙ বা কমলা রঙ।

বাদামি রঙ দেখা দেয় পাতার কলার মৃত্যু হলে বা পাতার মধ্যে ট্যানিক অ্যাসিড (Tannic acid) উৎপন্ন হলে।

বিবর্ণ ও শুকনো পাতা ঝরে যায় ডাল থেকে। পাতা ঝরার ব্যাপারটা ঘটে পাতার বোঁটার নিচে একসারি কোষ-সৃষ্টির ফলে, যাকে বলে 'অ্যাব্‌সিশান লেয়ার' (Abscission layer)। এই স্তর-সৃষ্টির ফলে ডাল আর পাতার বোঁটার মাঝে একটা ব্যবধান ঘটে, খাদ্য পৌঁছতে পারে না পাতায়, পাতাগুলো কেবলমাত্র মাঝের সামান্য অংশের সাহায্যে ডালে লেগে থাকে। সামান্য নড়াচড়ায় কিম্বা দমকা বাতাসে এক-এক করে পাতাগুলো ঝরে পড়ে। বনতল ঢাকা পড়ে যায় শুকনো পাতায়।

পাতা ঝরে গেলে ডালের যে জায়গায় পাতা জোড়া ছিল সে জায়গাটা ঢাকা পড়ে যায় একসারি কর্ক কোষ তৈরির ফলে। চিরহরিৎ গাছে (Evergreen) সব পাতা একসঙ্গে না ঝরে, ভাগে ভাগে ঝরে যায় বছরে বছরে। ঝরা পাতার বদলে নতুন পাতা গজিয়ে ওঠে বসন্তের সমাগমে।

নবীন বসন্ত আসে নবীন প্রাণের সাড়া জাগাতে। শীত-শেষে যে বনস্থলী রিক্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, তা প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরে ওঠে। শুকনো ডালে ডালে অসংখ্য কচি কিশলয় উঁকি মারে। শুকনো

ডালে এত সজীবতা কোথায় লুকোনো ছিল ভাবতেও অবাক লাগে! সব সাজে সেজে ওঠে উদ্ভিদকুল। শুরু হয় প্রতিটি অঙ্গের কর্ম-চঞ্চলতা। গাছে গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে, বীজের মধ্যে সৃষ্টি হয় নতুন প্রাণ। পুরাতন বিদায় নেয়, স্থান করে দেয় নতুনকে। সৃষ্টি চলে অব্যাহত।

জীবজন্তুর কথা

বিশ্বনাথ মিত্র

১

প্রাণের প্রকাশ

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল। সকাল হয়েছে। আলো ফুটে উঠেছে পৃথিবীর বুকে। সুয্যিমামা উঁকি দিচ্ছেন পুব আকাশে। মুখ হাত ধুয়ে চা খাবার খেয়ে বসলে টেবিলের সামনে চেয়ারে। লেখাপড়া শুরু হবে এবার। বই বেরুল—খাতা-পেন্সিল দোয়াত কলমও বেরুল। এ সময়ের মধ্যে কতগুলো জিনিস তোমার চোখে পড়ল। প্রথমেই খাট থেকে নামা অর্থাৎ খাট, তারপরে কলঘরে মগ, বালতি, টুথব্রাশ, কাপ, প্লেট, ডিম, চেয়ার, টেবিল, বই,দোয়াত, কলম, খাতা, পেন্সিল, আরও কত কি! তোমার ভাই বোন, মা বাবা, পাখি, পোষা কুকুর-এ সবও তোমার চোখে পড়েছে। টেবিলের সামনে পোকা মাকড়, কাপ বা ডিশে দু-একটা পিঁপড়ে দেখতে পাওয়াও বিচিত্র নয়। এই যে এত সব জিনিস দেখলে এদের মধ্যে তফাত কী ধরতে পারছ? তুমি উঠলে, চললে, খেলে। কুকুরটা নড়ছে-চড়ছে, ঘেউ ঘেউ করছে; পাখিগুলো উড়ে গেল—কিচির মিচির করল। তাই নয় কি? আর একদিকে, খাটটা যেখানে যেমন ছিল তেমনিই আছে। দাঁত মাজার পর ব্রাশটা যেখানে রাখলে, সেটা সেখানে তেমনিই রইল। কাপ ডিশগুলোও মেঝের উপর ঠিকই বসানো রয়েছে। টেবিল চেয়ার যেখানকার সেখানেই। বই খাতা পেন্সিল কলম যেখানে যেমনি বার করে রাখা হয়েছে—সব তেমনিই রয়েছে। ঠিক তো? তুমি বলবে, 'তা হবে না কেন? ওগুলোর কি প্রাণ আছে যে নড়বে চড়বে!' আর মানুষ, পাখি, কুকুর—এদের যে প্রাণ আছে তাই। কথাটা ঠিকই। এক দলের প্রাণ আছে, আর এক দলের প্রাণ নেই। একদল সজীব, আর একদল নির্জীব বা জড় পদার্থ। এখন

কথা হচ্ছে, প্রাণ বা জীবনটা কী! খুবই সহজ প্রশ্ন। প্রশ্নটা সহজ সত্যি, কিন্তু জবাবটা প্রশ্নের মত অত সহজ নয়। আর, এক কথায় তার সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা করা যাবে না। বিজ্ঞানী বা দার্শনিকদের বহু চেষ্টাতেও এর সঠিক সংজ্ঞা বা উত্তর আজও মেলেনি। তবে. ঠিক কথায় বা কতকগুলো শব্দ দিয়ে একে বাঁধতে না পারলেও কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ আছে যা দিয়ে প্রাণকে প্রকাশ করা যায়। আর এই লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশই হচ্ছে জীবন। এইগুলো দিয়েই মোটামুটিভাবে সজীব আর জড়পদার্থকে পৃথক করা যায়। প্রাণ বা জীবনের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—সজীব পদার্থের চলার ক্ষমতা আছে, বাইরের আঘাতে সে সাড়া দেয়, মানিয়ে নেয় নিজেদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায়। নিজেদের করে সংরক্ষণ, করে খাদ্য গ্রহণ ও বংশবিস্তার। এমনি আরও অনেক। আর এসবের অভাবেই জড় পদার্থ প্রাণহীন, নির্জীব। অতএব এ সব লক্ষণ থেকেই আমরা বলতে পারি, এক দলের প্রাণ আছে, আর এক দলের প্রাণ নেই।

প্রাণ এল কিভাবে

এখন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, প্রাণ কিভাবে এল পৃথিবীতে? কিভাবে সৃষ্টি প্রাণের—কেমন করে—কোথায়—কখন? এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বললেন, ভগবানই সৃষ্টি করেছেন সব। বাইবেলে গল্প আছে, এ পৃথিবী, গাছপালা, পশুপক্ষী, মায় মানুষ—সবই সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর। আর তা করতে সময় লেগেছিল ছ-দিন। তৃতীয় দিনে নানা রকমের গাছপালা, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে জন্তু জানোয়ার, আর সব-শেষে মানুষ তৈরি হল। সে মানুষ পুরুষ মানুষ। সেই আদি মানুষের একটি পাঁজর নিয়ে ভগবান তৈরি করলেন নারী। এই নারী আর পুরুষেরই সন্তান সন্ততিতে এ পৃথিবী ভরে আছে। এমনি সব রূপকথার গল্পের মতন। হিন্দুদের

ধর্মপুস্তকে আছে যে, ঘোর তমসার মাঝে একদিন হল হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সৃষ্টি। ব্রহ্মা বসলেন তপস্যায়। তপস্যার ফলে শরীরের এক-এক অংশ থেকে সৃষ্টি হল এক-একটি প্রাণীর। এমনি সব অপরূপ গল্প। এখানে সৃষ্টির পেছনে কল্পনা করা হয়েছে অলৌকিক শক্তির। সেই অদৃশ্য শক্তি বা ভগবান—যাই বলি না কেন—তাঁরই সৃষ্টি সব। কিন্তু বিজ্ঞান তা মেনে নেয় নি।

আবার আর এক মতে, প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে এ পৃথিবীতে নয়। প্রাণের উৎপত্তি অন্য কোন গ্রহ উপগ্রহ থেকে। কিন্তু এ যুক্তিও নানা কারণে মেনে নেওয়া হয় নি। কেউ বলেছেন, ইথারে আছে মহাজাগতিক কণা। সেই কণা ধীরে ধীরে পৃথিবীতে তৈরি করেছে নানা রকমের প্রাণী আর উদ্ভিদ। এরও বিপক্ষে আছে বহু যুক্তি। যাই হোক, প্রাণের সৃষ্টি নিয়ে প্রথমে ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া হল। তারপর সেই আলৌকিক শক্তিতে আস্থা হারিয়ে গ্রহ উপগ্রহে অভিযান। কিন্তু সেখানেও মিলল না সন্ধান। এবার দেখা যাক আর কোন মতবাদ আছে কি না। জানতে পারা যায় কি না, অন্য কোন উপায়ে প্রাণ-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে কি না! অনেকের মতে, অজৈব পদার্থ থেকেই প্রাণের প্রকাশ—আপনা আপনিই। এর নাম স্বতঃজননবাদ (Spontaneous creation)। এই মতের সমর্থকদের ধারণা ছিল, মাটি থেকে হয় কীট পতঙ্গ ও ব্যাঙাচির সৃষ্টি, আর শবদেহ থেকে মাছি। কেউ বললেন, একটা সাপকে কুচি কুচি করে কেটে মাটির তলায় রেখে তার উপর জল ঢেলে যাও, দেখবে সেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে নানা রকমের পোকা। এখন ওই পোকাদের দুধ খাওয়াও, পাবে সাপ। অনেকে এও ভাবতেন যে, মিঠে জলে যে সব জীব দেখা যায়, তারা প্রতি বছরেই মরে যায়। আবার বসন্তসমাগমে তারা আপনা-আপনিই বেঁচে ওঠে। স্বতঃজনন-বাদ নিয়ে এমনি সব অবাস্তব গল্প আছে। আসলে এ ভুল—হয়ত দেখার ভুল। মহামতি গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল—যাঁকে জীব-

বিজ্ঞানের জনক বলা হয়—তিনি এটা অসম্ভব বলে ঘোষণা করেন। ইটালির বৈজ্ঞানিক রেডি দেখিয়েছেন, পচা মাংসের উপর মাছিরা ডিম পাড়লে তবেই তা থেকে মাছির সৃষ্টি হয়। আপনা-আপনিই পচা মাংস থেকে মাছি তৈরি হতে পারে না। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তরের আবিষ্কার—অজৈব বা জড় পদার্থ থেকে আপনা-আপনি প্রাণের প্রকাশ—এই মতবাদের মূলে এক কুঠারাঘাত করল। তাঁর পরীক্ষায় দেখা গেল এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি প্রমাণ করলেন, পচা জিনিসের উপাদান থেকে কীট পতঙ্গের সৃষ্টি হয় না। জীবদেহে জীবাণুর সৃষ্টিও আপনা থেকে হয় না। তাদের প্রকাশ জীবাণুরই বংশবৃদ্ধি দ্বারা। তবে এ মতবাদও নানা কারণে মেনে নেওয়া হয় নি। এ সব মতবাদ প্রাণের প্রকাশ কী করে হল সে সমস্যার সমাধান করতে পারল না। প্রাণের উৎপত্তির ব্যাপারটা যে আঁধারে সেই আঁধারেই রয়ে গেল। কিন্তু তাই বলে কি প্রাণের সৃষ্টি এক সময় হয়নি ? তা যদি না হবে তবে কী করে হল প্রাণের এত বিচিত্র রূপায়ণ ? তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, কখন, কিভাবে হল প্রাণের প্রথম প্রকাশ—জীবনের মহা আবির্ভাব ?

প্রাণের আবির্ভাব কতদিন আগে

সে হল বহুদিন আগের কথা। এখন থেকে প্রায় আড়াইশো কোটি বছর আগের কথাই হবে। সে দিনই পৃথিবী পেয়েছিল প্রাণের প্রথম পরশ। সে এক পরম বিস্ময়! অনেকের ধারণা, এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে নানা পরমাণুর মিলনে সৃষ্টি হয় প্রাণের। অথবা আকস্মিক কোন দুর্ঘটনাই হয়ত ঘটিয়েছে সেদিন প্রাণের আবির্ভাব। যে সময় সে ঘটনা ঘটেছিল তখন পৃথিবী ছিল না আজকের মত। বৈজ্ঞানিকদের মতে, প্রায় তিনশো কোটিরও বেশি বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে সূর্যের অংশ থেকে। সেদিনের

পৃথিবী ছিল বিভীষিকাময়ী—উত্তপ্ত, অশান্ত, জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড একটা। তারপর বহু দিন ধরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী তার বর্তমান রূপ পেয়েছে। উত্তপ্ত সেই পৃথিবী থেকে তাপ কমতে কমতে গ্যাসপিণ্ড ঘনীভূত হয়ে তরল অবস্থার সৃষ্টি হল। আরও দিন যায়, বছর যায়—তাপও কমতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে। ধীরে ধীরে কঠিন আবরণ পড়তে থাকে ধরার বুকে। এ যেন গরম দুধ ঠাণ্ডা হতে হতে সর পড়ার মত। সেই আদিম পৃথিবীর জলীয় বাষ্প ক্রমে উপরের দিকে উঠতে লাগল। তারপর উপরের হাওয়ার স্পর্শে ঘনীভূত হয়ে তা থেকে মেঘের সৃষ্টি হল। তারপর শুরু হল বৃষ্টি—পৃথিবী জলে জলময়। সেই জল সৃষ্টি করল সমুদ্র। তখনো কিন্তু প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় নি পৃথিবীর বুকে। কিন্তু তারপর একদিন প্রাণের আবির্ভাব ঘটল। সে এক অভূতপূর্ব, পরমাশ্চর্য ঘটনা। কোন এক মন্ত্রবলে যেন জড়ের বুকে জাগল সাড়া।

জীবসৃষ্টির উপযোগী সব রকমের উপাদানই ছিল সেদিনকার সেই নবজাত পৃথিবীতে। সেদিন অসংখ্য পরমাণু ছুটোছুটি করছিল পৃথিবীর বুকে। তারপর কোন এক শুভক্ষণে তাদের এই ঘোরা-ঘুরির পালা শেষ হল। এল তারা কাছাকাছি। কোন এক অদৃশ্য শক্তি সেদিন বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ায় তৈরি করল জীবন। সৃষ্টি হল আদি প্রাণের ভিত্তি—প্রাণের অণু অর্থাৎ প্রাণ-কণা বা প্রোটোপ্ল্যাজম। কী তার অপরূপ রূপ! বর্ণহীন সাদা চঞ্চল থলথলে জেলির মত হল প্রাণের সে প্রথম রূপ। হয়ত সেদিন চাপ, তাপ ও সূর্যের শক্তি প্রাণসৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। হয়ত বা বজ্রপাতের ফলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়েছিল। সে যাই হোক, বৈজ্ঞানিকদের ধারণা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে প্রোটোপ্লাজম। তাছাড়া প্রাণের প্রথম প্রকাশ হয়েছিল সমুদ্রে। সমুদ্র যেন জীবনের আদি জননী। ভূতত্ত্বও প্রমাণ দিচ্ছে, জলেই হয়েছে প্রাণের প্রথম প্রকাশ। প্রাণের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রায়

শতকরা পঁচাত্তর ভাগই তো জল। যে সব উপাদানে প্রোটোপ্লাজমের সৃষ্টি তার মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস প্রধান; তার সঙ্গে আছে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি। যাই হোক প্রাণের প্রথম রূপ ওই অর্ধস্বচ্ছ চিরচঞ্চল প্রোটোপ্লাজম। জীবনের প্রথম প্রকাশ এমনিভাবেই ঘটল।

২

প্রাণ থেকে প্রাণী

যেমন করেই হোক এবং যে সময়েই হোক প্রাণ প্রকাশিত হল পৃথিবীর বুকে। এই প্রাণেরই দুটি ধারা—উদ্ভিদ আর প্রাণী। এক দলের গায়ে লাগল সবুজের ছোঁয়া। সবুজ ক্লোরোফিল উদ্ভিদদের একটি বিশেষত্ব। এটা তো আগেই বলা হয়েছে উদ্ভিদ সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে। এই ক্লোরোফিল গাছের খাদ্য তৈরি করতে সাহায্য করে। অবশ্য সব উদ্ভিদই সবুজ নয়। আর অপর ধারার নাম প্রাণী যারা পায়নি সবুজের ছোঁয়া, তাই খাদ্য প্রস্তুত করতে তারা অপারগ। তারা খাদ্যের জন্যে উদ্ভিদ আর অন্য প্রাণীদের উপর হল নির্ভরশীল।

এককোষী প্রাণী

আমরা এবার সেই প্রাণী কিভাবে বিকশিত হল নানা রূপে নানা ভঙ্গিমায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করব এখানে। প্রথম যে প্রাণী সৃষ্টি হল তার রূপ হল সরল সহজ ; একটি কোষেই আবদ্ধ রইল তার দেহ। বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রায় ৯০ কোটি বছর আগে এককোষী প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। ছোট এককোষী হলে কী হবে, সব কিছু কাজ চলে তাদের ওই একটি কোষের মাধ্যমে। খাদ্যগ্রহণ, নিজেদের সংরক্ষণ, বংশবিস্তার—সবই। একের মাঝেই অনেক লীলা—অনেক খেলা। এমনি এককোষী ছোট প্রাণী আজও আছে। বহুকাল পূর্বে প্রাণীর প্রথম সৃষ্টিকাল থেকেই এরা এখনো টিকে আছে।

এমনি প্রাণী হল অ্যামিবা। অ্যামিবা আর তার এককোষী জাতভাইদেরই তখন প্রাণীজগতে একাধিপত্য। আর কোন প্রাণীর তখন সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু তাতেই বন্ধ রইল না প্রাণের গতি। তারপর

বহু কোষের সমষ্টিতে হল প্রাণীর নতুন প্রকাশ। এককোষী প্রাণী থেকেই ক্রমে বহুকোষী প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। এককোষী প্রাণী থেকে প্রথমে এল স্পঞ্জ-জাতের প্রাণীরা। তারপর এল এক ধরনের প্রাণী যাদের কোষগুলো দুটি স্তরে সাজানো। জেলি ফিশ, হাইড্রা ইত্যাদি হল সেই জাতের প্রাণী।

প্রাণের গতি কিন্তু এখানেই শেষ হল না। কালের গতির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলল প্রাণের গতি। তিনটি স্তর-যুক্ত কোষের আবরণ গায়ে দিয়ে দেখা দিল ভিন্ন জাতের প্রাণী। এরাই আবার সৃষ্টি করল নানা ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের। এল কৃমিজাতের প্রাণীরা—এল কেঁচো, জোঁক, এল চিংড়ি-কাঁকড়া, কেন্নুই, বিছে। পতঙ্গের দল, শামুক, ঝিনুক, অক্টোপাস প্রভৃতিও বাদ গেল না। বাদ গেল না তারা-মাছ, সামুদ্রিক শশা প্রভৃতি প্রাণীরা। এমনি করেই বহুকোষী প্রাণী আসর জমালো পৃথিবীতে। এইসব অমেরু-দণ্ডী প্রাণীদেহে অগণিত কোষরাশি নানা কাজের জন্যে একই দেহে নানা অঙ্গ বিকশিত করল। এক-একটি অঙ্গের এক-একটি কাজ—ভোজন পর্ব, চলাফেরা, শ্বাস প্রশ্বাস, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা, আরও কত কি।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব

কালক্রমে অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে সৃষ্টি হল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের। কিভাবে অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণী এসেছে তার সঠিক ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। কিন্তু এ সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রচলিত আছে। অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকেই মেরুদণ্ডী প্রাণীর উৎপত্তি—এ সম্বন্ধে সব বিজ্ঞানীই একমত। আনুমানিক পঞ্চাশ কোটি বছর আগে মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল এই পৃথিবীতে। প্রথমেই অবশ্য পুরোপুরি মেরুদণ্ডী প্রাণীর সৃষ্টি হয় নি। প্রথমে এক ধরনের প্রাণীর সৃষ্টি হল যাদের মধ্যে প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর

সৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। বলা যায়, এরা নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী জীব। অর্থাৎ এদের দেহে শিরদাঁড়া তখনো তৈরি হয়নি। শিরদাঁড়া নিয়ে প্রথম আবির্ভূত হল বলতে গেলে মাছ। সে আজ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ কোটি বছর আগের কথাই হবে। এদের জলেই বসতি। এরা সাঁতার কাটে এদের পাখনা দিয়ে। তাছাড়া শ্বাস প্রশ্বাস নেবার জন্যে এদের ফুলকো থাকে। মাছের পর হল উভচর প্রাণীদের প্রকাশ। এরা জল ছেড়ে চলে এল ডাঙায়, যদিও জীবনের প্রথম ভাগ জলেই তাদের কাটাতে হয়। ব্যাঙ এই-জাতের জীব। এরা ফুলকো দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় জলে থাকবার সময়, অর্থাৎ জীবনের প্রথম অবস্থায়। আর পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা ডাঙায় চলে আসে—নিশ্বাস নেয় ফুসফুস দিয়ে। ডাঙায় এসে এরা চলাফেরা করতে শিখল। খাবারও জোগাড় করতে শিখল ওই ডাঙাতেই। কিন্তু পুরোপুরি তারা জলের মায়া ত্যাগ করতে পারল না, কারণ ডিম দিতে জলে তাদের আসতেই হয়। তার উপর আবার ছোট অবস্থায় তাদের সেখানেই কাটে।

এরপর এল সরীসৃপ

এরপর এল সরীসৃপ জাতের প্রাণী এখন থেকে প্রায় আঠারো কোটি বছর আগে। সে যুগটাকে সরীসৃপ প্রাণীর যুগ বলা যেতে পারে। এযুগে বিরাট বিরাট সরীসৃপের আবির্ভাব হয়েছিল। যেমন ছিল এদের বিরাট চেহারা তেমনি ছিল এরা হিংস্র। এরা হচ্ছে ডাইনোসর। এদের কেউ-কেউ সত্তোর-আশি ফুটের মত লম্বা ছিল। ওজনেও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টন। সরীসৃপদের মধ্যে এক ধরনের প্রাণী আকাশেও উড়তে পারত। সাপ, টিকটিকি, কচ্ছপ প্রভৃতি নানা ধরনের সরীসৃপরাও ওই যুগে ছিল। কিন্তু জয়-জয়কার তখন ডাইনোসরদেরই। এদের ভয়ে তখন অন্যদের ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ার অবস্থা। শুধু কি অন্য প্রাণী! নিজেদের মধ্যেও

মারামারি রক্তারক্তিতে কম যেত না এরা। কিন্তু এ অবাধ আধিপত্য তাদের চিরকাল রইল না। নামল পৃথিবীর বুকে দারুণ দুর্যোগ। সে অবস্থায় তাদের অনেককেই বিদায় নিতে হল। কেউ মরল দারুণ ঠাণ্ডায়। তৃণভোজীরা গাছপালার অভাবে না খেতে পেয়ে প্রাণ হারাল। আর মাংসাশীরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কামড়া-কামড়ি করেই শেষ হয়ে গেল। এমনিভাবে এরা লোপ পেল চিরদিনের মত। আজ তাদের দেখা মিলবে না। এদের জীবাশ্ম বা ফসিল অবশ্য আছে। সেকালের প্রাণী বা উদ্ভিদ দীর্ঘদিন মাটির নিচে চাপা থেকে কালক্রমে পাথরে পরিণত হয়ে যায়। একেই বলে জীবাশ্ম বা ফসিল। তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এরা এককালে পৃথিবীতে রাজত্ব করে গেছে। অতিকায় সরীসৃপরা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হল বটে, কিন্তু ছোট-ছোট অনেকেই টিকে রইল ঐ আবহাওয়ায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে। তাদের কথা পরে বলা হবে।

এই সরীসৃপ থেকেই দুটি বিপরীতমুখী প্রাণের ধারা দু-দিকে প্রবাহিত হল। এক, পাখির দল, দুই, স্তন্যপায়ীদের দল। মাঝে মাঝে অবশ্য কয়েকটি প্রাণীর ঠিকানা পাওয়া গেল যাদের মধ্যে সরীসৃপদের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল বর্তমান। কিন্তু তারা পুরোপুরি সরীসৃপ নয়। তাদের কারোর মধ্যে চিহ্ন পাওয়া গেল এমন একজাতের প্রাণীর যাদের রূপ হল সরীসৃপ ও পাখির মাঝামাঝি। দু-দলেরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত রয়েছে তাদের মধ্যে। এতেই প্রমাণ হয় যে, সরীসৃপ থেকেই পাখির উদ্ভব। এমনি প্রাণীও আজ লুপ্ত, কিন্তু তাদের জীবাশ্ম তাদের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিচ্ছে। এমনি দুটি প্রাণীর নাম আরকিওপ্‌টেরিক্স (Archaeiopteryx) ও আরকিওর্নিস (Archaeornes)। এমনি আধা-সরীসৃপ আধা-স্তন্যপায়ী প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে স্তন্যপায়ী আর সরীসৃপদের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান।

থিরিওডন্‌সিয়া এমনি একটি নাম। এদেরও আজ আর দেখা মিলবে না। স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপদের মধ্যবর্তী শ্রেণীর আরও কয়েকটি প্রাণীর অস্তিত্ব জানা গেছে। এরা পিপীলিকাভুক প্রাণী, নাম হংসচঞ্চু ছুঁচো।

একটা কথা এখানে বলে রাখি। সরীসৃপ পর্যন্ত যে-সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব দেখতে পাওয়া গেল তারা সকলেই ঠাণ্ডা-রক্তওয়ালা প্রাণী। ঠাণ্ডা-রক্তওয়ালা মানে এই নয় যে তাদের রক্ত বরফের মত ঠাণ্ডা। আসলে ঠাণ্ডা-রক্তওয়ালা প্রাণীদের দেহের তাপ বাইরের আবহাওয়ার তাপের ওঠা-নামার সঙ্গে ওঠা-নামা করে। কিন্তু পাখি আর স্তন্যপায়ীদের ঠিক উল্টো। এরা গরম-রক্তওয়ালা প্রাণী। এদের দেহের তাপ সব সময় একই থাকে, বাইরের আবহাওয়া যাই হোক না কেন। আমাদের দেহের তাপও বাইরের গরম বা ঠাণ্ডা পরিবেশে পরিবর্তিত হয় না। এটাই হচ্ছে উষ্ণ শোণিত বা গরম-রক্তওয়ালা প্রাণীদের বিশেষত্ব। পাখি আর স্তন্যপায়ী ছাড়া আর কোন গরম-রক্তওয়ালা প্রাণী নেই।

যাই হোক, ধীরে ধীরে অসংখ্য পাখির সৃষ্টি হল পৃথিবীতে। কত রঙের বাহার তাদের দেহে! গায়ে তাদের পালক ঢাকা। এরা ওড়ে আকাশের তলায়। অবশ্য মৃত্তিকা-বিহারী পাখির সংখ্যাও কম নয়।

স্তন্যপায়ী প্রাণী

স্তন্যপায়ীরাও নানান বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশিত হল ধরার বুকে। লোম বা চুলের বাহার উঠল, তাদের সঙ্গে সৃষ্টি হল অতি প্রয়োজনীয় একটি অঙ্গ তাদের শরীরে। এই অঙ্গের নাম স্তন। স্তন্যপায়ী ছাড়া আর কোন প্রাণীদেহে এই অঙ্গটি দেখা যাবে না। স্তন-দুগ্ধে বর্ধিত হয় শিশু। তাই এরা স্তন্যপায়ী। এই স্তন্যপায়ীরাও নানা বৈচিত্র্য নিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে লাগল। গরু, ভেড়া, ছাগল,

বাঘ, সিংহ, ইঁদুর, বাঁদর, মায় মানুষ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মানুষ এসেছে সবথেকে পরে। কোটি কোটি বছর আগে যে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল তারই শ্রেষ্ঠ রূপ হল মানুষ। আর, একদিনেই মানুষ আজকের এই তোমার আমার মত রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসেনি, এসেছে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে, বহু ভাঙা গড়া বহু পরিবর্তনের মাঝখান দিয়ে।

মানুষের পূর্বপুরুষ

মানুষের আবির্ভাব নিয়ে, অথাৎ ঠিক কার পরেই মানুষের সৃষ্টি বা মানুষের ঠিক পূর্বপুরুষ কে এ নিয়ে নানা মত আছে। অনেকে মনে করেন, মানুষের সৃষ্টি বানর থেকে। অর্থাৎ বানর মানুষের পূর্বপুরুষ এটাই চালু কথা। কিন্তু এ কথাটা ভুল। আসলে বানর ও মানুষ একই পূর্বপুরুষের ভিন্ন ধারা। অনেকের মতে, পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব এখন থেকে প্রায় দশলক্ষ বছর আগে।

আগেই বলেছি, প্রথম মানুষের রূপ আজকের মত ছিল না। ভারি কদাকার ছিল সেদিনের মানুষের রূপ। মানুষ আবির্ভাবের প্রথম স্বাক্ষর পাওয়া যায় জাভা দ্বীপে। সেখানে পাওয়া গেছে আদি মানুষের জীবাশ্ম। ইউজীন ডুবোয়া (Eugene Duois) বলে এক ওলন্দাজ ডাক্তারের প্রচেষ্টায় পাওয়া গেল সেদিনের মানুষের মাথার খুলি, পায়ের কিছু হাড় আর দাঁত। এ সব দেখে জানা গেল যে, সে প্রাণীর সঙ্গে রয়েছে মানুষের মিল। এই আদি মানুষের নাম পিথেক্যানথ্রপাস (Pithecanthropus) বা বানর-মানুষ। তবে, এদের কোঁচকানো ভুরু, চোখের গর্ত আর নেমে-আসা কপাল দেখে বানরের সঙ্গেই মিলটা বেশি চোখে পড়ে। এরা সোজা হয়ে চলতে পারত, পারত অস্ত্র বানাতে। এরপর পাওয়া গেল আর এক নিদর্শন চীনের রাজধানী পিকিং-এর কাছে। এই জীবাশ্মগুলো প্রমাণ দিল যে এরাও মানুষ। দাঁত, মাথার খুলি,

কব্জি, পায়ের হাড়, মেরুদণ্ডের অংশ প্রভৃতির মালিকের নাম দেওয়া হল—সিনানথ্রপাস (Sinanthropus) বা পিকিং মানুষ। পিকিং মানুষ পিথেক্যানথ্রপাসদের থেকে লম্বায় ছিল ছোট। এরাও হাঁটতে পারত। পিথেক্যানথ্রপাসদের থেকে পরিমাণে বেশি হলেও এদের মাথার ঘিলু ছিল মানুষদের চেয়ে কম। এরাও অস্ত্র ব্যবহার করত। আগুনের ব্যবহারও এদের অজানা ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের ইতিহাসে আগুনের ব্যবহার একটা বড় কৃতিত্ব।

এরপর জার্মানির হাইডেলবার্গ শহরের কাছে পাওয়া গেল আর একটি জীবাশ্ম। এটি শুধু নিচের চোয়ালের। এটি হচ্ছে হাইডেলবার্গ মানুষের (Heidelberg man) স্মৃতিচিহ্ন। দাঁতগুলো এদের মানুষের মতই ছিল, কিন্তু চোয়ালটা একেবারে বনমানুষের মত।

নিয়ান্ডারথল মানুষ

তারপর আরও সময় এগিয়ে গেছে। কত ভাঙাগড়া, কত অদল-বদল হয়েছে মানুষ তৈরির প্রকৃতির কারখানায়। সে সব চিহ্ন পাওয়া যাবে শিলায় শিলায়, গুহায় গহ্বরে।

মানুষের আবির্ভাবের মহা ইতিহাস কিন্তু এখানেই শেষ হয় নি। এরপর জার্মানির ডুসেলডর্ফ (Dusseldorf) থেকে আর একটি মানুষের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হল যার নাম দেওয়া হয়েছে নিয়ান্ডারথল মানুষ বা হোমো নিয়ানডারথালেনসিস (Homo Neanderthalensis)। ডুসেলডর্ফ শহরটি জার্মানির নিয়ান্ডারথল উপত্যকায় অবস্থিত থাকার জন্যে সেই উপত্যকার নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়েছে। এদের জীবাশ্ম থেকে দেখা যায় যে, এ জাতীর মানুষের দেহের গঠন ছিল আজকের দিনের মানুষের অনেকটা কাছাকাছি। অবশ্য আরও নানা দেশ থেকেও এমনি

ধরনের বহু জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। অনেকের ধারণা, এরা প্রায় দু-লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বসবাস করে গেছে। এদেরও রূপে ছিল না কোন লালিত্য। থ্যাবড়া নাক, বাঁকা হাঁটু, শক্ত পায়ের উপর খাটো শরীর, মোটা গর্দান, মাথাটা ছোট গলার উপর বসানো —এমনি ছিল তাদের দেহের গড়ন। তবে, মাথার ঘিলু ও মস্তিষ্ক-গহ্বরটা ছিল বেশ বড়, অনেকটা আধুনিক মানুষের কাছাকাছি। তাদের বুদ্ধির মাত্রাও বেশি ছিল। এটাই তাদের ক্রমোন্নতির সুস্পষ্ট লক্ষণ। এরা অস্ত্র তৈরি করে পশু শিকার করত বলে জানা যায়। নিরাবরণ অঙ্গে তুলে দিল পশুচর্ম ; অঙ্গাবরণ ধারণ করে তারা সভ্যতায় আর একধাপ যেন এগিয়ে গেল। তাছাড়া তারা তৈরি করেছে গৃহস্থালীর সাজ-সরঞ্জাম, করেছে নানা শিল্পকাজ। এদের তৈরি নানান প্রাণীর চিত্র তাদের সুকুমার বৃত্তির পরিচয় দেয়।

অনেকে মনে করেন যে, এই নিয়ান্ডারথল মানুষ থেকেই আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু আবার অনেকের মতে ক্রো-ম্যাগনন (Cro-Magnon) জাতের মানুষই আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ। ক্রো-ম্যাগননদের জীবাশ্ম প্রথম পাওয়া যায় ফরাসী দেশ থেকে। ইউরোপের নানা জায়গায়ও এদের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এদের জীবনযাত্রা ছিল উন্নত, ছিল বুদ্ধির দীপ্তি। মস্তিষ্কের গহ্বর ছিল খুব বড়। এরা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে পারত। শীতের কবল থেকে রক্ষা পেতে পশুচর্ম দিয়ে তৈরি আবরণ গায়ে দিয়েছে ; এরা ছবি এঁকেছে পাহাড়ের গায়ে। নিত্য ব্যবহারের জন্য তারা বানিয়েছে নানা জিনিস। পরিশ্রম করেছে তারা প্রচুর। এদের দেহের গঠন অনেকটা আধুনিক কালের মানুষেরই মত। এ-সব দেখেই মনে হয় যে আধুনিক মানুষের ঠিক পূর্বপুরুষ এরাই। মোট কথা ক্রমবিকাশের ধারা বেয়েই যেমন এককোষী আদি প্রাণী থেকে নানা রকম প্রাণীর বিকাশ হয়েছে, তেমনি মানুষও নানা রূপ বদল করে ধাপে ধাপে বর্তমান অবস্থায়

এসে পৌঁছেছে। এ-সব পরিবর্তন ঘটতে যে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে তা বলাই বাহুল্য।

আমরা আগেই জীবাশ্ম বা ফসিল কথাটির ব্যবহার করেছি। অনেক সময় পৃথিবীর শিলাস্তরে প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ প্রস্তরীভূত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এদেরই বলা হয় ফসিল বা জীবাশ্ম। প্রাচীনকালের উদ্ভিদ বা প্রাণী সম্বন্ধে আলোচনা করার কাজে বিজ্ঞানীদের হাতে জীবাশ্ম একটি প্রধান অস্ত্র। বিভিন্ন সময়ের জীবাশ্ম থেকে প্রাচীন এবং নবীনকালের প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে একটি যোগসূত্র পাওয়া যায়। এক কথায়, জীবাশ্মকে প্রাচীন কালের সাক্ষী বলা যেতে পারে।

বিলুপ্তিবাদ

প্রত্নজীববিদ্যার যাঁকে জনক বলে অভিহিত করা হয় তাঁর নাম ক্যুভিয়ার। তিনি যে মত প্রচার করেন তা হল বিলুপ্তিবাদ বা থিওরি অব্ ক্যাটাক্লিজম্। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু জীবাশ্ম সংগ্রহ করে দেখালেন যে, উঁচুস্তরের জীবাশ্মের সঙ্গে নিচুস্তরের জীবাশ্মের কোন যোগসূত্র নেই। তিনি আরও বলেন যে, কোন এক সুদূর অতীতে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিল এক প্রচণ্ড দুর্যোগ। এর ফলে সে সময়কার প্রাণী ও উদ্ভিদ—সব কিছুই লুপ্ত হয়ে যায় পৃথিবীর বুক থেকে। দুর্যোগ অবসানে আর এক-প্রস্থ প্রাণী আর উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে দুর্যোগের আগের ও পরের প্রাণী আর উদ্ভিদের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিভাবে প্রাণী আর উদ্ভিদ সৃষ্টি হল তার কোন সদুত্তর মেলে না বিলুপ্তিবাদ থেকে। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, অলৌকিক শক্তির প্রভাবে প্রাণী বা উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়েছে—এ মতে ক্যুভিয়ারেরও বিশ্বাস ছিল।

বিবর্তনবাদ

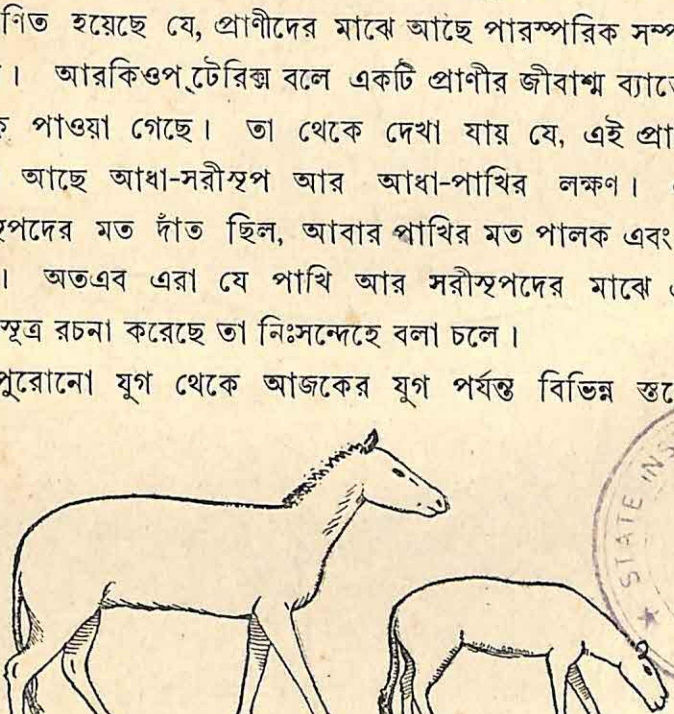
যাক সে কথা। এই যে অগণিত উদ্ভিদ আর প্রাণী—এদের মধ্যে কি তাহলে কোন যোগসূত্র নেই? নেই কোন সম্পর্ক? আছে। আর সেটা প্রমাণ করবে বিবর্তনবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশই হচ্ছে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি। বহু তথ্য, বহু ঘটনা আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এই বিবর্তনবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ (Evolution)। ক্রমবিকাশের পথ বেয়েই বিভিন্ন উদ্ভিদ আর প্রাণীর সৃষ্টি। এরা তাদের পূর্বপুরুষ থেকে স্থান কাল পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক রূপে রূপায়িত হয়েছে। বিবর্তনবাদ থেকে বলা যায় যে, বিভিন্ন জাতের জীবের মাঝে একটা যোগসূত্র আছে—আছে তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক।

জীবাশ্ম থেকেই প্রথমে প্রমাণগুলো কী তা দেখা যাক। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর উপরকার আবরণটা, যাকে বলা হয় ভূত্বক, তা শিলাস্তর দিয়ে তৈরি হয়েছে। উৎপত্তি অনুসারে শিলা তিন রকম। এরা হল আগ্নেয় শিলা, রূপান্তরিত শিলা আর পাললিক শিলা। এই পাললিক শিলাস্তরেই জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। যে যুগে এই শিলাস্তর তৈরি হয়েছিল সেই যুগের জীবের কিছু না কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে সেই স্তরে। বহু দিন ধরে এই স্তরের তলায় চাপা থাকার ফলে তার চাপে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহ প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। এই প্রস্তরীভূত জৈব পদার্থই জীবাশ্ম। এমনিভাবে প্রাণীদেহের কঙ্কাল বা তার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীবাশ্মে পরিণত হয়েছে। ভূবিজ্ঞানীরা পাললিক শিলার স্তর-বিন্যাস দেখে তাদের বয়স ঠিক করেছেন। তা ছাড়া সবথেকে নিচু স্তর থেকে বর্তমান স্তর পর্যন্ত তৈরি হতে যে সময় লেগেছে সে সময়কে কয়েকটা যুগ ও মহা যুগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি মহা যুগ ও যুগের নাম এবং তার বয়সের হিসেবও বৈজ্ঞানিকরা মোটামুটি ঠিক করেছেন।

বাইরের আর ভিতরের আঙ্গিক লক্ষণগুলোকে ভিত্তি করে সকল রকম প্রাণীকে কতগুলো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এমনিভাবে প্রাণীদের সাজিয়ে নিলে তাদের মাঝে বিরাট শূন্যতার আভাস পাওয়া যায়। এই শূন্যতা অনেক পরিমাণে পূর্ণ করেছে জীবাশ্ম। জীবাশ্মই সেইসব নিখোঁজ প্রাণীর সন্ধান দিয়েছে। আর এই নিখোঁজ প্রাণীদের নাম দেওয়া হয়েছে নিখোঁজ যোগসূত্র বা মিসিং লিঙ্ক।

কয়েকটি বিশেষ জাতের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হবার পর এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাণীদের মাঝে আছে পারস্পরিক সম্পর্ক বা যোগ। আরকিওপ্‌টেরিক্স বলে একটি প্রাণীর জীবাশ্ম ব্যাভেরিয়া থেকে পাওয়া গেছে। তা থেকে দেখা যায় যে, এই প্রাণীটির মধ্যে আছে আধা-সরীসৃপ আর আধা-পাখির লক্ষণ। এদের সরীসৃপদের মত দাঁত ছিল, আবার পাখির মত পালক এবং ঠোঁট ছিল। অতএব এরা যে পাখি আর সরীসৃপদের মাঝে একটা যোগসূত্র রচনা করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

পুরোনো যুগ থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে যে-

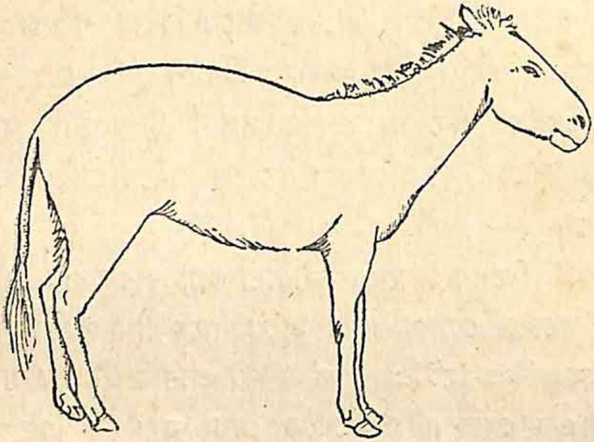


২ ১

ঘোড়ার ক্রমবিকাশ

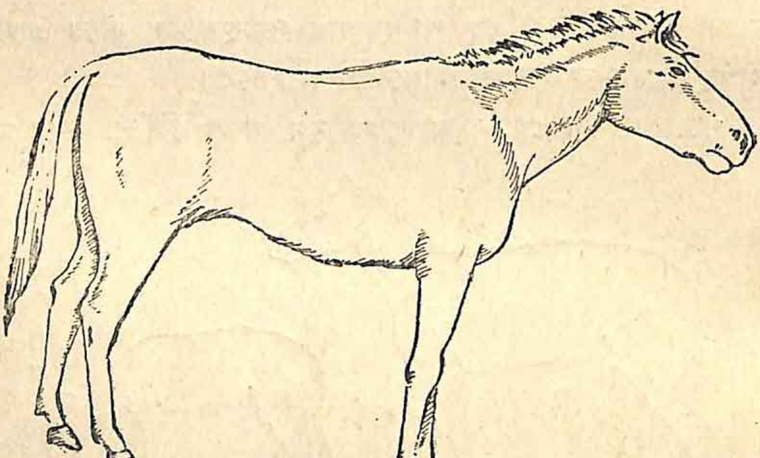
সব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা যদি পর-পর সাজিয়ে রাখা হয় তবে দেখা যাবে তাদের মাঝে রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক। বিভিন্ন যুগে

পাওয়া হাতি ও ঘোড়ার জীবাশ্মগুলো সাজালে তাদের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস পাওয়া যাবে। আধুনিক হাতি বা ঘোড়া



৩

ঘোড়ার ক্রমবিকাশ

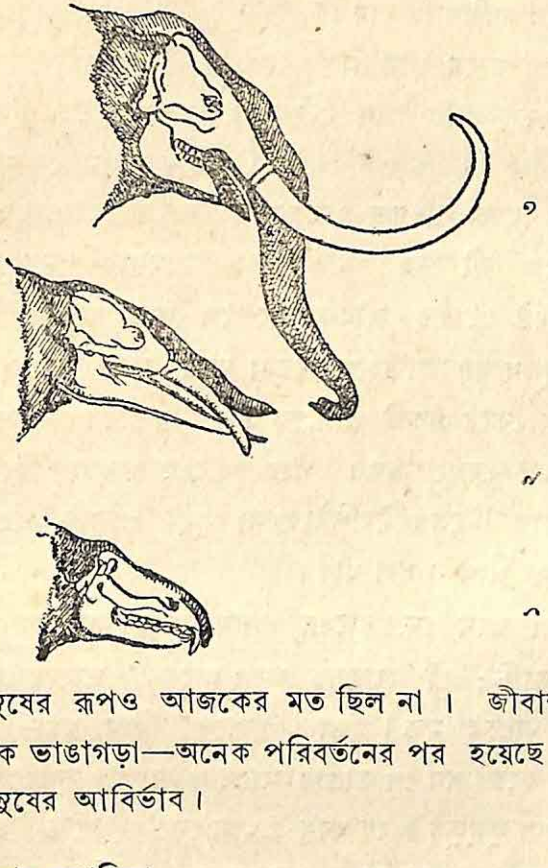


৪

ঘোড়ার ক্রমবিকাশ

একদিনেই এমনিভাবে সৃষ্টি হয় নি। ঘোড়ার আদিপুরুষটি ছিল আকারে অতি ছোট। তারপর ক্রমে নানা পরিবর্তনের পর

বর্তমান ঘোড়ার সৃষ্টি। তেমনি হাতির পূর্বপুরুষের না ছিল মুলোর মত দাঁত, না ছিল বিরাট লম্বা শুঁড়। এরও বহু পরিবর্তন হল। কোটি কোটি বছর লেগেছে তার আধুনিক হাতির রূপ পেতে।



হাতির ক্রমবিকাশ

আদিম মানুষের রূপও আজকের মত ছিল না। জীবাশ্ম প্রমাণ দিচ্ছে, অনেক ভাঙাগড়া—অনেক পরিবর্তনের পর হয়েছে বর্তমান আধুনিক মানুষের আবির্ভাব।

ক্রমবিকাশ আর ভ্রূণবিদ্যা

ভ্রূণবিদ্যা ক্রমবিকাশের আর একটি প্রমাণ। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জীবনের প্রথম অবস্থা হচ্ছে ভ্রূণ। মাছ, ব্যাঙ, সাপ, টিকটিকি, পাখি, গরু, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীদের এবং মানুষের ভ্রূণ যদি পাশাপাশি রেখে দেখা যায় তবে তাদের দেখতে মোটামুটি একরকমই মনে হবে। কোন্‌টা যে কার তা বোঝার সাধ্য থাকে না। ভন্ বেয়ার (Von Baer) নামে এক জার্মান বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রাণীর

কতকগুলো ভ্রূণ পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক হয়ে যান। তিনি দেখেন, তাদের মধ্যে রয়েছে একটা অদ্ভুত মিল। কোন্‌টা যে কোন্ প্রাণীর তা তাঁর চোখে ধরা পড়ে না। কেন এই মিল? এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে অভিব্যক্তিবাদ (Evolution)-এর সাহায্যে। হেকেল (Haeckel) নামে জার্মানির আর এক জীববিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণের মাঝে এমনি মিল দেখে প্রচার করেন তাঁর পুনরাবৃত্তিবাদ (Theory of Recapitulation)। তিনি বলেন, কোন জীব যখন ভ্রূণ অবস্থা থেকে পরিণত এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছোয় তখন তাদের পূর্বপুরুষদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে। কোন নির্দিষ্ট প্রাণীর জীবন সংক্ষেপে তার অতীত ইতিহাস বা তার পূর্বপুরুষদের ইতিহাস রচনা করে। তার মানে, অপরিণত অবস্থায় যে-কোন একটি প্রাণীকে তার নিম্নস্তরের প্রাণীর অপরিণত অবস্থার মত দেখতে হয়। পরে পরিণত অবস্থার দিকে এগোতে থাকলে তার নিজের বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে ওঠবার পরই বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য ধরা যায়।

তোমরা জান যে, বাঙের প্রথম অবস্থা বা অপরিণত অবস্থা হচ্ছে ব্যাঙাচি; এই ব্যাঙাচি জলে থাকে। তাদের দেখতে তখন অনেকটা মাছের মত। তারা ফুলকো দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। কিন্তু ব্যাঙ হয়ে যখন সে ডাঙায় আসে তখন তার ফুলকো থাকে না। এ-সময় এরা ফুস্‌ফুস্ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। ব্যাঙ উভচর প্রাণী। উভচর প্রাণীরাই মাছের উপরের স্তর। পাখি আর স্তন্যপায়ীরা উভচরের থেকে আরও উপরের স্তরের। কিন্তু পাখির ভ্রূণ অবস্থার মধ্যে মাছের অনেক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ভ্রূণ অবস্থায় সকল প্রাণীই দেখতে এক, কিন্তু পরে পরিবর্তনের মাঝ দিয়েই তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে ওঠে। এ-ও দেখা যায় যে, তিমির ভ্রূণে দাঁত ও লোম থাকে। কিন্তু জন্মের আগে বা পরে তা আর থাকে না। তাহলে ভ্রূণে এই

দাঁত বা লোম কেন থাকে ? তার কারণ হল যে, তিমির পূর্বপুরুষের দাঁত ছিল। তারই নিদর্শন ভ্রূণে দেখা দেয়। এরা যে স্তন্যপায়ী, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওদের ভ্রূণে লোম আছে বলে। এ ধরনের আর একটি উদাহরণ অ্যাসিডিয়া। এরা কর্ডাটা পর্বের প্রাণী। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অ্যাসিডিয়ার নটকর্ড দেখা যায় না। তবে এরা যে কর্ডাটা পর্বের তার প্রমাণ হল যে, ভ্রূণ অবস্থায় নটকর্ড বর্তমান থাকে। নটকর্ড থাকাটাই কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের প্রধান লক্ষণ। অতএব ভ্রূণবিদ্যা প্রমাণ করছে যে, অ্যাসিডিয়া কর্ডাটা এবং তিমির পূর্বপুরুষের দাঁত ছিল।

এ সম্বন্ধে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। প্রতিটি তিন স্তরের কোষ-বিশিষ্ট বহু কোটি প্রাণীর জীবনের শুরু একটি মাত্র কোষ দিয়ে। আর সে জীবনপর্ব অনেকটা এককোষীদের মতই। তারপর ওই একটি কোষ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৈরি করে দুটি স্তরবিশিষ্ট কোষের। এ অবস্থার নাম গ্যাসট্রুলা স্টেজ। এই গ্যাসট্রুলা অবস্থা কিন্তু হাইড্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সব প্রাণীরই এই অবস্থা পার হতে হবে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবার আগে। এছাড়া পথ নেই। এই পথ অতিক্রম করবার পর তারা বিভিন্ন অবস্থার পথ দিয়ে শুরু করে জীবনযাত্রা। জীবের মাঝে পরস্পর যত মিল দেখা যাবে—তাদের ভ্রূণের মধ্যে গরমিল হবে তত কম। ভ্রূণবিদ্যা থেকেও তাহলে কিছু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, প্রাণীদের মাঝে আছে পারস্পরিক সম্পর্ক, আছে তাদের মাঝে যোগসূত্র।

মেরুদণ্ডী প্রাণী দেহের গঠন-বৈচিত্র্য

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহগঠন থেকেও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় প্রাণীদের মধ্যে গভীর আত্মীয়তা। মানুষের হাত, ঘোড়ার সামনের পা, পাখির ডানা, বাদুড়ের ডানা, তিমির সামনের পাখনা প্রভৃতি উপর উপর দেখলে তার মাঝে

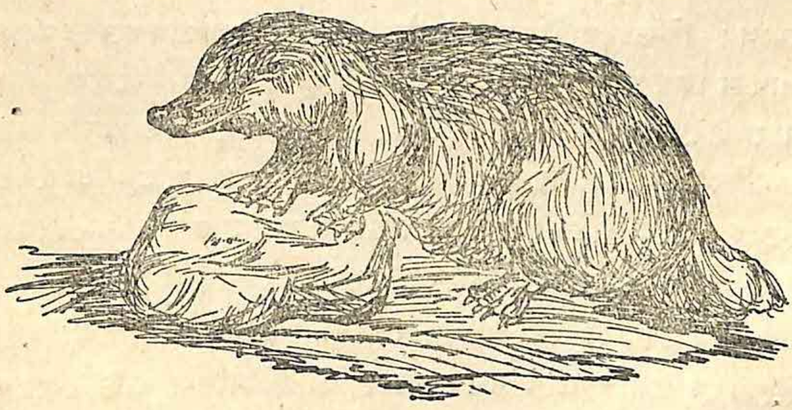
পাওয়া যাবে এক বিরাট গরমিল। কিন্তু এইসব অঙ্গের কাজ এক নয়। এক এক অঙ্গ এক এক কাজ করে। মানুষ হাত দিয়ে এক-রকম কাজ করে। ঘোড়ার পা ছোটবার জন্যে। আবার পাখি আর বাদুড়ের ডানা এদের উড়তে সাহায্য করে। এই ডানা পাখিকে দিয়েছে খোলা হাওয়ায় উড়ে বেড়াবার ক্ষমতা। আর তিমি থাকে জলে। তাই এদের এই পাখনাগুলো নৌকোর দাঁড়ের মত জলে সাঁতার কেটে চলার হাতিয়ার। আকৃতি বা প্রকৃতির মধ্যে এগুলোর যতই প্রভেদ থাক না কেন এদের মধ্যে একটা যে মিল আছে তা তাদের প্রত্যেকের হাড়গোড় দেখলেই বোঝা যাবে। এদের গঠন-বিধি একই, শুধু কাজগুলো আলাদা। ভ্রূণ অবস্থায় এ অঙ্গগুলো একই পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে একটা রূপ পায়। তারপর জীব অনুসারে নানা রূপ নিয়ে কাজ করে নানা ধরনের।

এ তো গেল একটা ব্যাপার। প্রাণীদেহে লুপ্তপ্রায় এমন কতকগুলো অঙ্গ থেকে গেছে যার কোন কাজই নেই। এই অঙ্গগুলো বিবর্তনবাদের আর একটা প্রমাণ। ব্যাঙের চোখে থাকে একটি বিশেষ পর্দা যার নাম নিক্‌টিটেটিং মেমব্রেন বা তৃতীয় অক্ষি-পল্লব (Nictitating membrane)। মানুষের চোখের কোণে ঠিক নাকের দিকটায় উঁচু ছোট লাল মাংসপিণ্ডের মত একটা জিনিস থাকে। এটাই হচ্ছে ওই নিক্‌টিটেটিং মেমব্রেনের ছোট অবস্থা। আসলে এ জিনিসটির কোন কাজই নেই এখন। ব্যাঙ বা মানুষের বহু আগের পূর্বপুরুষের এ অঙ্গটি ছিল। তাছাড়া এর কোন নির্দিষ্ট কাজও হয়ত ছিল। কিন্তু আজ তারা তাদের পূর্বপুরুষদের চিহ্নস্বরূপ এ অঙ্গটি শুধু-শুধুই বয়ে নিয়ে চলেছে। খরগোস, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণীদের কান নাড়াবার ক্ষমতা আছে। এই কান নেড়ে তারা মশা মাছি তাড়ায়। এদের কানের সুগঠিত পেশী তাদের কান নাড়াতে সাহায্য করে। মানুষের কানের গড়ন মোটামুটি একই রকমের হলেও

তারা কান নাড়াতে পারে না। কারণ মানুষের কানের পেশী ছোট ও অকেজো হয়ে গেছে। মানুষের লেজ দেখেছ কি? কিন্তু গরু, বাঁদর, কুকুর, প্রভৃতির লেজ আছে। অথচ এরা সকলেই একই শ্রেণীর প্রাণী। মানুষের লেজ না থাকলেও তাদের পিছনের অংশে ককসিস বলে হাড়টি আজও আছে। আর সেটিই সাক্ষী দিচ্ছে যে বহু বছর আগে তার পূর্বপুরুষদের লেজ ছিল। আজও তারা সেই অকেজো জিনিসটি বয়ে বেড়াচ্ছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, এই লুপ্তপ্রায় নিষ্ক্রিয় অঙ্গগুলোর কোন কাজ নেই সত্যি, কিন্তু এসব অঙ্গই প্রাণীদের মাঝে আত্মীয়তার প্রমাণ দেয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্কের গঠন পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, তা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। মাছ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত সকলের মস্তিষ্কের গঠন অনেকটা প্রায় একই। কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্যও বিদ্যমান। মাছ থেকে আরম্ভ করে স্তন্যপায়ী ও মানুষের এই অঙ্গটি তুলনা করলে ক্রমবিকাশের চিহ্ন মিলবে। হৃদয়-যন্ত্রটির তুলনা করলেও ওই একই কথা বলা যায়।

এমন কয়েকটা প্রাণী আছে যাদের ঠিক কোন একটা দলে



হংসচঞ্চু ছুঁচো

ফেলা যায় না। আরকিওপ্‌টেরিক্সের কথা আগে বলেছি যারা পাখির মত হয়েও ঠিক পুরো পাখি নয়। কারণ সরীসৃপের মত

কিছু-কিছু লক্ষণ তাদের রয়েছে। কাঁটাওয়ালা পিপীলিকাভুক প্রাণী বা হংসচঞ্চু ছুঁচো—এরাও স্তন্যপায়ী হয়েও আধা-স্তন্যপায়ী। সরীসৃপদের লক্ষণও এদের দেহে আছে। পেরিপেটাস (Peripatus) বিজ্ঞানীদের কাছে এক সমস্যা। কী এরা? চিংড়ি পতঙ্গদের জাতভাই, না কেঁচো জোঁকের জাতভাই? অঙ্গুরীমাল ও সন্ধিপদ—এই দুই জাতের প্রাণীর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এদের আছে। কিন্তু কেন এমন হয়েছে? এর জবাব দেবে অভিব্যক্তি। এই মাঝামাঝি-গোছের প্রাণীরা বা সংযোগকারী প্রাণীরা তো মস্ত বড় সাক্ষী। এরা বেশ ভালভাবেই জানিয়ে দিচ্ছে এক প্রাণী থেকে আর এক প্রাণীর সৃষ্টি-রহস্য।

যে-কোন দু-তিনটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহ-কাঠামো তুলনা করলে বোঝা যাবে, তাদের দেহের মধ্যে খুব একটা মিল না থাকলেও বেশ কিছু মিল আছে। বেড়াল, বাঘ, সিংহদের মধ্যে কেউ বড়, কেউ ছোট। বাইরে থেকে অমিলও আছে প্রচুর। কিন্তু দেহগঠনের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে এদের মধ্যে রয়েছে বেশ মিল। এই দেহগঠন থেকেই, তারা যে এক জাতের তার প্রমাণ মেলে। বিভিন্ন প্রাণীর শরীর-গঠন ও নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে পার্থক্য কিছু থাকলেও তাদের মধ্যে যে মুলগত ঐক্য রয়েছে এটা সহজেই বোঝা যায়। এই যে ঐক্য, এই যে মিল—এও প্রমাণ দেয় ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে। তাহলে বোঝা গেল যে, ক্রমবিকাশের ফলেই হয়েছে বিভিন্ন জীবের উৎপত্তি। জীবজগতের এত যে বৈচিত্র্য তাও সম্ভব হয়েছে ক্রমবিকাশের ফলেই। আকস্মিকভাবে কোন জীব এসে উদয় হয় নি এই পৃথিবীতে। এক জীব থেকে অন্য জীবের যে প্রকাশ, তাও সম্ভব হয়েছে ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে। আর এ ঘটনা এক দিনেও ঘটেনি—অনেক সময়, অনেক দিন লেগেছে এ পরিবর্তন হতে।

যাই হোক, বিজ্ঞানীরা নানা প্রমাণ থেকে স্বীকার করেছেন যে,

বিবর্তনের ফলেই নিম্নস্তরের জীব থেকে উচ্চস্তরের জীবের উৎপত্তি। কিন্তু কিভাবে, কোন্ প্রণালীতে একটি জীব থেকে আর একটি জীবের সৃষ্টি হল সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। বহু বিজ্ঞানী এ বিষয়ে তাঁদের মতবাদ ব্যক্ত করেছেন।

পরিবেশই বিবর্তনের মূল

জঁ্যা বাপতিস্ত ডি ল্যামার্ক নামে এক ফরাসি বৈজ্ঞানিকের নাম অভিব্যক্তিবাদের (Evolution) ইতিহাসে স্মরণীয়। কিন্তু হলে কী হবে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কেটেছে বহু দুঃখের মাঝ দিয়ে। জীবিতকালে তিনি কোন সমাদর পান নি। ল্যামার্কের মৃত্যুর পর তাঁর প্রচারিত মতবাদ চিন্তাশীল মানুষের মাঝে স্থান পেল। তিনি বললেন, জীবের মধ্যে পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট প্রকট। পরিবেশের রকম-ফেরের উপরই জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্ভর করে। কোন প্রাণী যদি কোন পরিবেশের আওতায় তার কোন অঙ্গ ক্রমাগত ব্যবহার করতে থাকে তবে সে অঙ্গটির পরিবর্তন হতে থাকে এবং তা একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয়। আবার যদি প্রয়োজনের অভাবে কোন অঙ্গ ব্যবহার করা না হয় তবে তা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে একটি অকেজো অঙ্গে রূপান্তরিত হয়। অতএব ব্যবহার করা, আর ব্যবহার না করা—এটা নির্ভর করছে পরিবেশের উপর। তাই পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে অঙ্গের পরিবর্তন হয় এবং কালক্রমে তা সন্তান সন্ততিদের ভিতরও প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ একটি জীবের জীবদ্দশায় নতুন-পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তান সন্ততিদের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়ে নতুন জীবের সৃষ্টি করে। এর সপক্ষে তিনি কতকগুলো দৃষ্টান্তও দিয়েছেন।

জিরাফের গলা খুব লম্বা। কারণ দিয়েছেন ল্যামার্ক। প্রাচীনকালের জিরাফের গলা ছিল খাটো। সেই খাটো গলা নিয়ে উঁচু গাছ থেকে গলা বাড়িয়ে পাতা খাবার জন্যে ক্রমাগত তাদের

চেষ্টা করতে হয়েছে। এই ক্রমাগত চেষ্টা বা ব্যবহারের ফলেই তাদের গলা লম্বা হয়ে গেছে। এর সামনের পাও হয়েছে বেশ লম্বা। এই লক্ষণগুলোই পুরুষানুক্রমে বাড়তে বাড়তে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। উটপাখিরা উড়তে পারে না। সাপের পা নেই। কেন? তার কারণ হচ্ছে যে, উটপাখিদের ডানার কোন প্রয়োজন নেই। ব্যবহার না থাকার জন্যেই এদের ডানা অকেজো ও দুর্বল হয়ে গেছে। ওড়ার ক্ষমতাও হারিয়েছে এরা। আর সাপেরা বুকে হেঁটে চলে। তারা থাকে গর্তে বা ফাটলে। পা থাকলে তো এদের অনেক অসুবিধে। গর্তের ভিতর ঢুকতে বা চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করত এরা। তাই তাদের পায়ের কোন প্রয়োজন নেই। অব্যবহারের ফলেই ধীরে ধীরে সাপের পা ছোট হতে হতে এক সময় তা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে।

ভাইসম্যানের মতবাদ

এবার আমরা জার্মানির বৈজ্ঞানিক ভাইসম্যানের (Weissmann) মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব। ভাইসম্যান বলেছেন, জীবদেহে দু-রকম কোষ দেখা যায়। যে কোষগুলো দেহ নির্মাণ করে তাদের বলা হয় সোমাটিক কোষ। এই কোষে যে জেলির মত পদার্থ বা প্রোটোপ্লাজম থাকে তার নাম হচ্ছে সোমাটোপ্লাজম। দেহ নষ্ট হলে এই সোমাটোপ্লাজমও বিনষ্ট হয়। আর একরকম কোষ হচ্ছে জনন-কোষ বা জার্ম সেল। জননকোষের প্রোটোপ্লাজমকে তিনি বলেছেন জার্মপ্লাজম। এই জার্মপ্লাজম অমর—অক্ষয় হয়ে থাকে পরবর্তী বংশধরের মধ্যে গিয়েও। এটা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয়ে নতুন জীবনের সূচনা করে। কিন্তু সোমাটোপ্লাজমের কোন পরিবর্তন হলে তা পরবর্তী বংশধরের মধ্যে যায় না। ইংরেজিতে লেখা চিঠি বাংলা দেশে গিয়ে তা যেমন বাংলা হয়ে যায় না—এ যেন অনেকটা তাই। আসলে উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতামাতার

কাছ থেকে যে-সব বৈশিষ্ট্য আমরা পাই তা থাকে জার্মপ্লাজমে। তা-ই আবার পরের পুরুষে চলে যায়। সোমাটোপ্লাজমের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। জীবের সৃষ্টি পুরুষ ও স্ত্রী জার্ম-সেলের মিলনে। এই মিলনের ফলে প্রথমে সৃষ্টি হয় জাইগোট। জার্ম-প্লাজমে থাকে জীবের আকৃতি ও স্বভাবগত গুণাবলী। জাইগোটে এই গুণগুলো সংগ্রাম করে নিজেদের মধ্যে আত্মপ্রকাশের জন্যে। সংগ্রামে জয়ী গুণগুলোই থেকে যায় সন্তানদের মাঝে। যদি সেই সংগ্রামের ফলে গুণগুলো কোন পরিবর্তন আনে তাহলে সেই নতুন গুণগুলো দেখা যায় সন্তানদের মধ্যে। ভাইসম্যানের মতবাদ মোটা-মুটি এই।

ডারউইনের মত

এবার একটি বিখ্যাত মতবাদের কথা বলব। ইংরেজ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) এই মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদটির নাম হল প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection)। ডারউইন ১৮৩১ সালে কেমব্রিজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বাইশ বছর বয়সে জাহাজে চাকরি নিয়ে রওনা হলেন পৃথিবী ভ্রমণে। এই ভ্রমণের সময়ে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে তিনি নানা জীবজন্তু, গাছপালা, পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করতে থাকেন। তারপর ফিরে এসে বহুদিন ধরে সেগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা শেষ হলে পর তিনি তৈরি করলেন তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ। সে সময় অ্যালফ্রেড ওয়ালেস রাসেল নামে অন্য এক বিজ্ঞানীও এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। পরে এ মতবাদটি ডারউইন এবং ওয়ালেস উভয়ের নামেই প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। মতবাদটি পরে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন-তত্ত্ব' নামে জনপ্রিয় হয়। এরই পরের বছর অর্থাৎ ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হল ডারউইনের বিখ্যাত পুস্তক 'অরিজিন অব্ স্পিসিস বাই ন্যাচরাল

সিলেকসন' (Origin of Species by Natural Selection)। চিন্তাশীল পণ্ডিত মহলে ডারউইন স্মরণীয় হলেন। এবার দেখা যাক তাঁর এই মতবাদটি আসলে কী ধরনের।

প্রাকৃতিক নির্বাচন বলতে সোজা কথায় এইটে বোঝায়, জীবন-সংগ্রামে যাদের যোগ্যতা আছে তারাই বাঁচে। আর সেই যোগ্যতাই বংশপরম্পরায় প্রজাতি বয়ে নিয়ে যায়। কতগুলো তথ্যের উপর নির্ভর করেই এই মতবাদ বিকাশ লাভ করে। দেখা গেছে, বহুল পরিমাণে বংশবৃদ্ধি জীবের একটা মহা কাজ। মশা, মাছি ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ডিম দেয়। আর সব ডিম যদি ফুটে বাচ্চা বেঁচে থাকত এবং সেগুলোও যদি পূর্ণ পরিণতি লাভ করে আবার ডিম দিত তবে একদিন সমস্ত পৃথিবী এরাই ছেয়ে ফেলতে পারত। অন্য কোন জীবের জায়গাই হত না এ পৃথিবীতে। মাছও অনেক ডিম দেয়। মাছের সব ডিম ফুটে যদি বাচ্ছা হত এবং সব বাচ্চাই যদি বেঁচে থাকত তাহালে কয়েক পুরুষ পরেই ওই মাছের বাচ্চাতেই সমস্ত জলভাগ ভরে যেত। হাতির বংশবৃদ্ধির হার খুবই কম। প্রায় তিরিশ বছর বয়স থেকে হাতির সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এরা প্রায় একশো বছর বাঁচে। এই দীর্ঘ জীবনে একটি স্ত্রী-হাতির গড়ে ছ-টার বেশি সন্তান হয় না। ওইসব সন্তান যদি বেঁচে থেকে পূর্ণাঙ্গ হাতিতে পরিণত হয়ে সন্তান প্রসব করতে থাকে তবে সাতশো পঞ্চাশ বছরে উনিশ লক্ষ হাতি জন্মাবে। ব্যাপারটা কী ভয়াবহ তা চিন্তা করে দেখ। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয় না। আমরা দেখি পিঁপড়ে, মাছ প্রভৃতির সব ডিমই রক্ষা পায় না। যেগুলো পায় তাদের অনেককেই আবার পূর্ণাঙ্গ হবার আগেই বিদায় নিতে হয় পৃথিবী থেকে। খুব অল্পসংখ্যকডিম থেকেই পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। হাতির বাচ্চারাও সবাই বেঁচে থাকে না। অনেকে পূর্ণাঙ্গ হবার আগেই মরে যায়। এমনিভাবে প্রকৃতির হাতে মার খায় প্রাণীরা। প্রতিকূল পরিবেশ, স্থান, খাবার প্রভৃতির জন্যে প্রাণীদের

মাঝে তাই চলে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অনেকেই হেরে যায়, টিকে থাকতে পারে না। এরই নাম হচ্ছে জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence)। এই সংগ্রাম বা প্রতিযোগিতা একই রকমের প্রাণীদের মধ্যে হতে পারে, আবার বিভিন্ন রকমের প্রাণীদের মধ্যেও হতে পারে। যেমন, মানুষে মানুষে যে প্রতিযোগিতা সেটা নিজেদেরই মধ্যে বা একই প্রজাতির মধ্যে। জীবন-সংগ্রামে বাঁচবার জন্যে মানুষকে কতভাবেই না মানুষেরই সঙ্গে লড়তে হয় তার ঠিক নেই। এই যে যুদ্ধ তা মানুষে মানুষেই যুদ্ধ।

আবার এও দেখা যায় যে, একটা গাছের তলায় অসংখ্য বীজ পড়ল। সে বীজ মাটিতে পড়ে বেশ কিছু অঙ্কুরিত হল। তাদের অনেকগুলো ভালভাবে বাড়ল, আবার অনেকগুলো নষ্ট হল ঘেঁষা-ঘেঁষির জন্যে, আলোর অভাবে, খাবারের অভাবে, জায়গার অভাবে। তাছাড়া বেড়ালে ইঁদুর ধরে খায়—বাঘে হরিণ ধরে খায়—সাপে ব্যাঙ ধরে। এটা হচ্ছে ভিন্ন-ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে লড়াই বা ভিন্ন প্রজাতির সঙ্গে সংগ্রাম। ইঁদুর চেষ্টা করছে বেড়ালের হাত থেকে বাঁচতে, হরিণ বাঘের হাত থেকে কী করে রক্ষা পাবে তার চেষ্টা করছে—ব্যাঙ বাঁচতে চাইছে সাপের কবল থেকে। এই সংগ্রামে কেউ সফল হয়—কেউ হয় না। শুধু তাই নয়, প্রাণীদের আবার পরিবেশের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হচ্ছে। বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, এমনি কত কী! এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গেও জীবকে সংগ্রাম করতে হয়। তাতে হয় কারোর জয়, কারোর পরাজয়। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষের কবলে আমাদের সুজলা সুফলা বাংলা দেশে কত লোক যে প্রাণ দিয়েছে তার সঠিক হিসেব পেলে অবাক হতে হবে। ১৯২৩ সালে জাপানের ভূমিকম্পে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই যে সংগ্রাম তা চলছে প্রায় সর্বত্র। এই সংগ্রামে

যাদের যোগ্যতা আছে তারই বাঁচবার অধিকারী। আর যাদের নেই তাদের বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই যে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা একেই বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)। প্রকৃতি অযোগ্যদের আমল দেয় না। যোগ্যতা যাদের আছে তারাই যেন প্রকৃতির আদরের দুলাল। প্রকৃতির বুকে তারাই টিকে থাকে। এটাই হল যোগ্যতমের জয় (Survival of the fittest)। যোগ্যতমরা বেঁচে থাকে তাদের কতকগুলো গুণ ও উপযোগী বৈশিষ্ট্যের জন্যে। যারা বেঁচে রইল তাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ-গতির প্রক্রিয়ায় সন্তান সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। ফলে তারা প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এমনি করে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে প্রাণীদের মাঝে আসে পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয় নতুন প্রাণীর। ডারউইন বলেছেন যে, জীবন সংগ্রামে যারা বেঁচে থাকে তাদের মাঝে আসে পরিবর্তন। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে দেহের নানা প্রয়োজনীয় অংশ পরিবর্তিত হয়। সেই পরিবর্তিত অংশগুলো সন্তান-সন্ততির মধ্যেও কালক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। যে অঙ্গের প্রয়োজন নেই বা বেঁচে থাকবার জন্যে যে অঙ্গগুলো অনুকূল নয় তা লুপ্ত হয়ে যায়। আর যে অঙ্গগুলো অনুকূলও নয় আবার প্রতিকূলও নয় তারা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে যায় জীবদেহে। যাই হোক, প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই নতুনের সৃষ্টি,—এটাই হল এই মতবাদের মূল কথা।

কিন্তু এই মতবাদকে সকলে মেনে নেন নি। এর বিপক্ষে ও সপক্ষে বহু তর্ক ও বিতর্ক রয়ে গেছে। কিন্তু তাহলেও এই মতবাদ অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন ক্রমবিকাশের একমাত্র কারণ হয়ত নাও হতে পারে। কিন্তু এটা যে একটা পথ, এটা যে একটা নতুন প্রজাতির সৃষ্টির কারণ, তা মেনে নিতে বাধা কী!

মিউটেশন বা পরিব্যক্তিবাদ

সবশেষে আর একটি মতবাদের উল্লেখ করা হচ্ছে। হল্যাণ্ডের এক বৈজ্ঞানিক হ্য. ভ্রীস (Hugo De Vries) এই মতবাদের জনক। এই মতবাদকে বলা হয় মিউটেশন (Mutation) তত্ত্ব বা পরিব্যক্তিবাদ। এ মতবাদের মূল কথা হল যে, হঠাৎ একটা পরিবর্তন এসে নতুন জীবের সৃষ্টি করে। এ পরিবর্তন ধাপে ধাপে আসে না। আসে অলক্ষিতে। নিজের খেয়ালে সে আসে, আসার কোন হদিশ না দিয়েই। তার ফলে নতুন আকৃতি, নতুন লক্ষণ দেখা দেয়। এই নতুন লক্ষণগুলো বংশানুক্রমে পাকা হয়ে যায়। হঠাৎ-আসা এই পরিবর্তনের নাম দিলেন তিনি মিউটেশন (Mutation) বা পরিব্যক্তি। তাহলে এই মিউটেশন মতবাদ থেকেও আমরা ক্রমবিকাশের একটা ব্যাখ্যা পাই।

৩

প্রাণী রাজ্য

প্রাণীদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রাণী রাজ্য। কত যে মজার মজার প্রাণী আছে এ রাজ্যে তা জানলে অবাক হতে হয়। আর কত যে কাণ্ডকারখানা এদের তাও বলে শেষ করা যায় না। কত বিচিত্র এদের রূপ—কত রকমফের! রঙ বেরঙের নানা রঙে রাঙানো এদের দেহ। কারো একটা, কারো আবার একাধিক রঙ। আরও আশ্চর্যের কথা যে, এরা কেউ-কেউ অতি ক্ষুদ্র, আবার কেউ-কেউ অতি বিরাট। ছোটদের মধ্যে অনেকে এত ছোট যে তাদের খালি চোখে দেখাই যায় না। তাদের দেখতে হয় মাইক্রোসকোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। আর বড়দের মধ্যে কোন-কোন প্রাণী এত বড় এবং এত লম্বা যে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তুমি কত লম্বা? এরা কেউ কেউ তোমার থেকে বিশগুণ বড় হতে পারে। ছোট বড় নানা রকমের জন্তু জানোয়ার নিয়েই এ-রাজত্ব।

প্রাণীদের আকৃতির যেমন রকমফের আছে তেমনি আবার তাদের থাকা খাওয়াও নানা রকমের। কোন-কোন প্রাণী থাকে জলে—কেউ ডাঙায়—কেউ মরুভূমিতে। নদী, সমুদ্র, পাহাড়, গাছ, বনজঙ্গল—এমনি নানা জায়গায় তারা বাস করে। কেউ ভালবাসে ঠাণ্ডা জায়গা, কেউ গরম, কেউ আবার মাঝামাঝি। কোন-কোন প্রাণী আবার জীবনের কতকটা সময় জলে, কতকটা সময় ডাঙায় বাস করে। কেউ কেউ আবার যাযাবর। শুধু তাই নয়। কোন কোন প্রাণী অপর আর এক প্রাণীর দেহের ভিতরে বাস করে, আর সেখান থেকেই খাবারও সংগ্রহ করে। খাবারও প্রাণীদের নানা রকম। কোন প্রাণী আমিষ জাতের খাবার

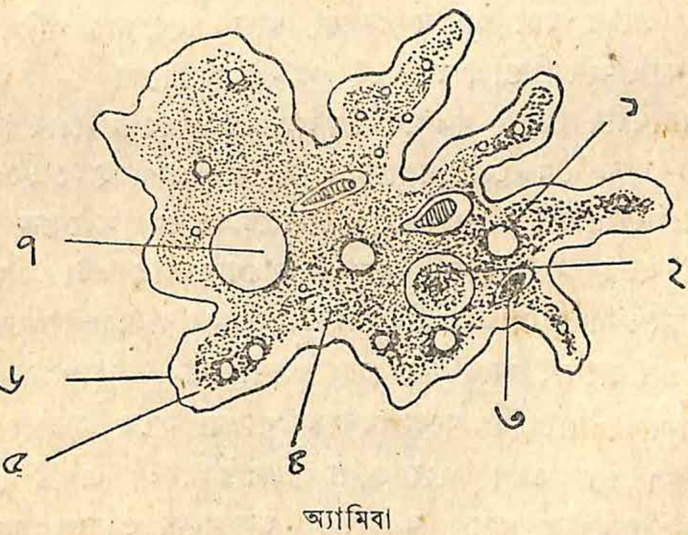
খায়, কেউ ভালবাসে নিরামিষ খেতে। ছু-রকমই খাবার খায় কেউ কেউ। এমনি নানা রকমের তাদের আকৃতি প্রকৃতি।

প্রাণীজগতে প্রকার-ভেদ

কিন্তু পরিচয় করবার আগে আবার অসুবিধে হতে পারে। কার সঙ্গে আগে পরিচয় করি—কে বা কারা একই জাতের, কেই বা ভিন্ন জাতের, এ নিয়ে রয়েছে গণ্ডগোল। এ পৃথিবীতে কত অসংখ্য প্রাণী আসর জমিয়ে আছে। গরু, ভেড়া, বিছে, কেন্নো, জেঁাক, কেঁচো এমনি সব। কত নাম আর করব! বিজ্ঞানীরা এই প্রাণী-জগৎটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছেন তাদের সাদৃশ্য আর বৈসাদৃশ্য দেখে। প্রাণীদের এক-একটা দলের সঙ্গে পরিচয় করতে করতে এগিয়ে যাব আমরা। তাতে প্রাণী-রাজ্যের পরিচয় পেতে খুব অসুবিধে হবে না।

অ্যামিবা

প্রথমেই পরিচয় করা যাক অ্যামিবার সঙ্গে। এরা অতি ক্ষুদ্র।



অ্যামিবা

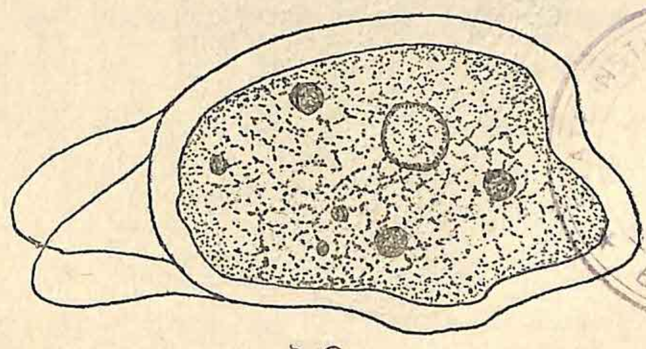
প্রায় এক ইঞ্চির একশোভাগের এক ভাগ মাত্র এদের দেহের

মাপ। খালি চোখে একে ভালভাবে দেখা যায় না। এদের কোন স্থায়ী আকৃতিও নেই। প্রতি মুহূর্তেই এদের দেহের আকৃতি বদলে যেতে পারে। আঙুলের মত কতগুলো অংশ দেহের এক-একটা জায়গা থেকে এই হয়ত বেরুল, পরক্ষণেই আবার তা মিলিয়ে গেল। অন্য আর-এক জায়গা থেকে আবার তা বেরুল, তারপরেই সেও মিলিয়ে গেল। এমনি ব্যাপার। এইগুলোর নাম হচ্ছে ক্ষণ-পদ সিউডোপোডিয়া। গল্পে আছে যে, গ্রীক দেবতা প্রোটিয়ুস নাকি ইচ্ছে করলেই নিজের রূপ বদল করতে পারতেন। তাই এই ক্ষুদ্র প্রাণীদের গ্রীক দেবতার নামানুসারে বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে অ্যামিবা প্রোটিয়ুস (Amoeba proteus)। এরা এককোষী প্রাণী। কেউ বলেন অকোষী। কোন কোষ-প্রাচীর নেই অ্যামিবার কোষে। একটি কোষেই এদের দেহ। কিন্তু তা হলে কী হবে, জীবনের যা কিছু করণীয় তা এরা ওই একটি কোষ দিয়েই করে। সত্যিই এটা আশ্চর্যের। আমরা খাই—খেয়ে হজম করি—চলি ফিরি— তার জন্যে আমাদের নানা অঙ্গ। কিন্তু এরা ? এদের শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া, খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য পরিপাক, রেচন কার্য, বংশ বিস্তার, সবই ওই একটি কোষ দিয়ে।

অ্যামিবার দেহটি থলথলে জেলির মত অর্ধস্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরি। এর নাম প্রোটোপ্লাজম। সমস্ত প্রাণীরই দেহকোষ এই প্রোটোপ্লাজম দিয়ে তৈরি। প্রোটোপ্লাজমের সবথেকে ঘন অংশটি হচ্ছে নিউক্লিয়াস। মোটামুটি গোলাকার এটা। আর বাকি অংশ সাইটোপ্লাজম। এই সাইটোপ্লাজমের বাইরের অংশকে বলে এক্টোপ্লাজম, আর ভিতরের অংশের নাম অ্যাণ্ডোপ্লাজম। এছাড়া সাইটোপ্লাজমের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে কতকগুলো গহ্বর বা ভ্যাকুওল। গহ্বরগুলো তিন রকমের। একটি বেশ বড় সঙ্কোচনশীল গহ্বর, কতকগুলো জল-গহ্বর ও খাদ্য-গহ্বর। তাছাড়া এদের দেহে তৈলবিন্দু ও অন্য পদার্থও দেখতে পাওয়া

বিচিত্র নয়। প্রচুর জলজ উদ্ভিদপূর্ণ পুকুর, পাঁক, নর্দমা, ডোবা, নালা প্রভৃতি জায়গায় এরা থাকে। শ্যাওলা ও জলের গাছপালার পাতার উপরও এদের দেখা যায়। যদি পুকুরের তলার বা নালার ময়লা বা পাঁক অথবা জলজ উদ্ভিদের পাতার উপরের হড়হড়ে কিছু অংশ নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় তবে অনেক সময় এদের দেখা পাওয়া যায়।

এই অ্যামিবা প্রাণীরাজ্যের মধ্যে প্রোটোজোয়া পর্বের অন্তর্গত। প্রোটোজোয়া সরলাকৃতির প্রাণী। একটি কোষেই তাদের চেহারার যা কিছু রকমফের। আরও অনেক প্রাণী আছে এই পর্বে। মোটামুটি প্রায় তিরিশ হাজার প্রাণী এ পর্ব জুড়ে আছে। যে আমাশয় রোগে মানুষ ভোগে তাও একটি প্রোটোজোয়ার কাণ্ড। এই প্রাণীটির নাম এণ্ট্যামিবা হিস্টোলিটিকা। আর ম্যালেরিয়া? তাও সৃষ্টি করে আর একটি ক্ষুদ্র প্রাণী, নাম প্লাস্মোডিয়াম। এটিও আর একটি প্রোটোজোয়া। প্যারামেসিয়াম বলে একটি প্রোটোজোয়া-পর্বের প্রাণী আছে। খুব ছোট্ট চটি-জুতোর মত অনেকটা দেখতে। এদের দেহের চারদিকে সরু চুলের মত অনেকগুলো সিলিয়া থাকে। সেগুলো এদের চলা ফেরায় সাহায্য করে। ইউগ্লেনা ও ভলভক্স বলে আরও দুটি প্রাণী এই পর্বের অন্তর্গত। এদের থাকে খুব সরু লম্বা দড়ির মত ফ্লাজেলা



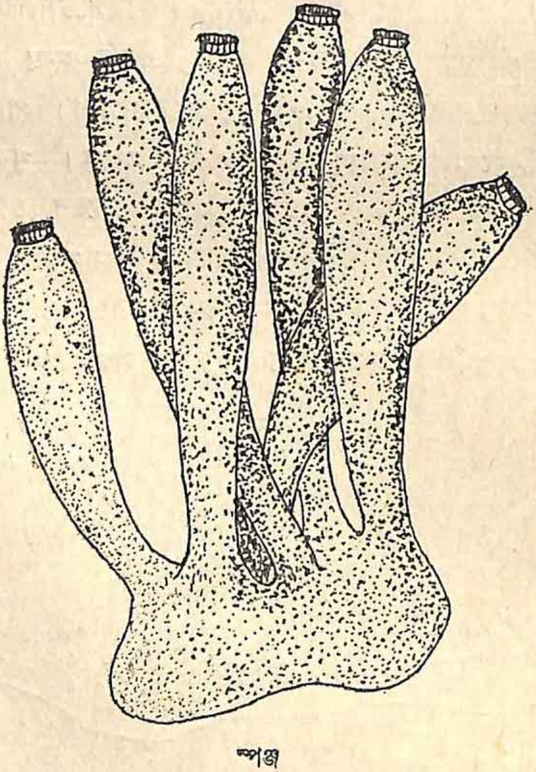
এণ্ট্যামিবা

যা দিয়ে এরা নড়াচড়া ও চলাফেরা করে। এদের নিয়ে প্রাণী

বিজ্ঞানী আর উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মধ্যে বড্ড টানাটানি। কারণ উদ্ভিদ আর প্রাণী এই দু-দলের বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাওয়া যায় এদের মধ্যে। প্রোটোজোয়া পর্বের প্রাণী পরজীবীও হয়, অর্থাৎ এরা অন্যের দেহে বসবাস করে আর সেখান থেকেই খাদ্য শোষণ করে বেঁচে থাকে। কেঁচোর মধ্যে এমনি একটি পরজীবী প্রোটোজোয়া থাকে; তার নাম মনোসিসটিস। প্লাসমোডিয়াম এবং এণ্ট্যামিবাও পরজীবী। যাই হোক, এমনি নানা ধরনের এককোষী প্রাণীরাই প্রোটোজোয়া পর্ব জুড়ে আছে।

বহুকোষী প্রাণী

এককোষী প্রাণীদের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় হল। এবার বহুকোষী প্রাণীদের সঙ্গে পরিচয় করা যাক। বহুকোষী প্রাণীদেহ



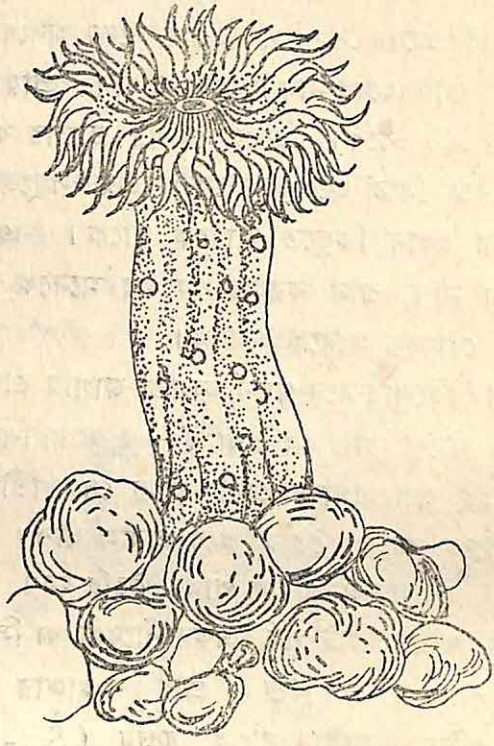
স্পঞ্জ

বড় অবস্থায় যদিও অনেকগুলো কোষ দিয়ে তৈরি, কিন্তু তাদের

জীবনের সূচনা কিন্তু সেই একটি কোষ দিয়েই। আর খানিকটা তা আমাদের পরিচিত প্রোটোজোয়ার মতই। এই বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে ছিদ্রাল প্রাণী বা পরিফেরা পর্বের প্রাণীর কথাই প্রথমে বলি। স্পঞ্জ জাতের প্রাণীরা এই পর্বের অন্তর্গত। বহু কোষে তৈরি এদের দেহ। সমস্ত দেহ এদের অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্রে ভরা। তাই এদের নাম ছিদ্রাল প্রাণী। প্রায় পাঁচ হাজার প্রাণী আছে এই পর্বে। এদের বেশির ভাগের বাসই সমুদ্রে। তু-একটি অবশ্য মিঠে জলেও থাকে। এরা সমুদ্রে বা পুকুরের জলের তলায় কোন কিছুতে আটকে থাকে। এরা চলাফেরা করতে পারে না। স্নান করবার সময় যে অনেকে স্পঞ্জ ব্যবহার করেন এটা বোধহয় অনেকেই জান।

শিশু আর কিশোর মনে স্বপ্ন-বিহ্বলতা জাগায় প্রবাল। 'স্বপন দেখি প্রবাল দ্বীপে তুলব আমি বাড়ি'—এ কল্পনা শিশু ও কিশোর প্রাণের। এই স্বপ্ন-জাগানো প্রবাল হচ্ছে সেইজাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী যাদের স্তূপীকৃত কঙ্কাল তৈরি করে প্রবাল দ্বীপ। প্রবাল নানা রঙের হয়। এ-থেকেই প্রবাল পাথর তৈরি হয়। প্রবাল হচ্ছে প্রাণীরাজ্যের আর একটি পর্ব, একনালীদেহী বা সিলেনটারেটার (Coelenterata) অন্তর্ভুক্ত। প্রায় ন-হাজার প্রাণী নিয়ে এই পর্বটি গঠিত। হাইড্রা, সাগর কুসুম (Sea-anemone), জেলি-ফিশ প্রভৃতি এই পর্বে আছে। নামে ফিশ হলেও জেলি-ফিশ কিন্তু মাছ নয়। মাছের যা বৈশিষ্ট্য আছে তার একটাও এদের নেই। এই একনালীদেহী প্রাণীদের দেহে একটি মাত্র নালী আর একটি মাত্র ছিদ্র-মুখ থাকে। খাদ্য গ্রহণ, আর যে সব খাবার জীর্ণ হয় না তাও বর্জন করে এই একটি মুখ দিয়েই। এদের দেহ তুইস্তরবিশিষ্ট কোষ দিয়ে তৈরি। আর সেই তুটি কোষের মাঝে থাকে থলথলে জেলির মত একটি পদার্থ। বাইরের স্তরের নাম এক্টোডার্ম ও ভিতরেরটি এণ্ডোডার্ম। মাঝের থলথলে জিনিসটির

নাম মেসোগ্লিয়া। এদের প্রায় সকলেই সাগরের বাসিন্দা। এদের একটি শ্রেণীর নাম হাইড্রা। এরা থাকে পুকুরে বা নদীতে। সাধারণত এই পর্বের প্রাণীদের মুখের চারদিকে শুঁড়ের



সাগর-কুসুম

মত কতগুলো অঙ্গ থাকে যার নাম টেনট্যাকল বা কর্ষিকা। এই অঙ্গগুলোর সাহায্যেই এরা খাবার মুখের ভিতর প্রবেশ করাতে পারে। এগুলোকে এদের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের হাতিয়ারও বলা যেতে পারে। সমুদ্রের তীরে যারা বেড়াতে গিয়েছ তারা জেলি ফিশ বোধহয় দেখে থাকবে। এরা সাগরের জলে মনের সুখে ভেসে বেড়ায়। থলথলে এদের চেহারা। আর সাগর-কুসুম দেখতে যেন এক একটি ফোটা ফুল।

নানা জাতের কৃমি

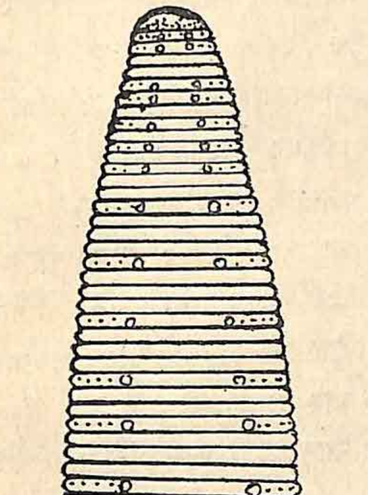
এতক্ষণ এককোষী থেকে আরম্ভ করে দুইস্তরবিশিষ্ট প্রাণীদের কিছু পরিচয় পেলাম। এবার তিনস্তরবিশিষ্ট কোষওয়ালা প্রাণীদের সঙ্গে পরিচয় করব। এদের মধ্যে প্রথমেই বলছি কৃমি জাতের প্রাণীদের কথা। অবশ্য তোমাদের অনেকের সঙ্গেই এদের কারো কারো পরিচয় হয়েছে। কৃমি রোগে যারা ভুগেছ তারাও মর্মে মর্মে এর পরিচয় পেয়ে গেছ কিছুটা। এই কৃমিদের রয়েছে দুটো দল। একদল হচ্ছে চ্যাপ্টা কৃমি (Platyhelminthes), আর অন্যদলে আছে গোল-কৃমিরা (Nemathelminthes)। প্রায় ছ-হাজার রকমের চ্যাপ্টা কৃমির কথা জানা যায়। বেশির ভাগই এরা পরজীবী। তার মধ্যে ফিতে-কৃমি (Tape worm), যকৃত-কৃমি (Liver fluke) প্রভৃতি বিখ্যাত। প্ল্যানেরিয়া (Planaria) বলে এক ধরনের চ্যাপ্টা কৃমি আছে। এরা কিন্তু পরজীবী নয়। এরা মিঠে জলের কৃমি। পুকুর, নালা ইত্যাদিতে এদের বাস। কিন্তু পরজীবীরা মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর দেহের মধ্যে বাস করে। যকৃত-কৃমি অনেকটা গাছের পাতার মত দেখতে। ভেড়া এবং আরও অনেক গৃহপালিত পশুর যকৃতে বাস করে এরা। ফিতে কৃমিরা দেখতে ফিতের মত। তবে, মাথার দিকটা অনেকটা আলপিনের মত। মাথার চারদিকে থাকে এদের হুকের মত কাঁটা। গোল-কৃমিদের মধ্যে অ্যাসক্যারিস (Ascaris), সুতো-কৃমি (Thread worm), হুক-কৃমি (Hook worm) প্রভৃতির নাম করা যায়। এই জাতের কৃমি আছে প্রায় দশ হাজারের মত। এরাও বেশির ভাগ পরজীবী। সরু নলের মত লম্বা এদের দেহ। অ্যাসক্যারিসরা শুয়োর, ঘোড়া বা মানুষের পেটের মধ্যে থাকে। হুক-কৃমিরা জীবনের প্রথম ভাগে মাটিতে থাকে। তারপর পায়ের চামড়া ভেদ করে অন্য প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে। এরপর রক্তবাহী নল, হৃদয় এবং

ফুসফুসে চলে বায়, সেখান থেকে পেটে। পেটের মধ্যে গিয়ে তারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাহলে বুঝে দেখ কী বিপজ্জনক এই কৃমিরা!

অ্যানিলিডা

এবার আমরা অঙ্গুরীমাল বা অ্যানিলিডা (Annelida) পর্বের প্রাণীদের খোঁজখবর নেব। এই পর্বের প্রাণীদের দেহ সরু নলের মত। একসারি আংটির মত খণ্ড-খণ্ড অংশ দিয়ে এদের দেহ গঠিত। তাই এ-পর্বের নাম হয়েছে অঙ্গুরীমাল বা অ্যানিলিডা। এরা কেউ থাকে মিঠে জলে, কেউ নোনা জলে, আবার কেউ-কেউ থাকে ডাঙায়। প্রায় সাত হাজার প্রাণী এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। বাগানে বেড়াচ্ছ বা ভিজে মাটির উপর দিয়ে চলেছ, এমন সময় চোখে পড়বে বা পায়ে লাগবে কতগুলো মাটির কুণ্ডলী। এগুলো কী জান? এগুলো হচ্ছে বিষ্ঠা-কুণ্ডলী। আর তা হচ্ছে কেঁচোর। কেঁচোও এই পর্বের প্রাণী। এরা নরম মাটিতে গর্ত করে বাস করে। আর মাটির সঙ্গে মেশানো ছোট গাছের বীজ, পচা গলা পাতা, মরা পোকা মাকড় ইত্যাদি এদের খাদ্য। জৈব পদার্থ মেশানো মাটি এদের প্রিয় খাবার। আর তা খাবার পর কুণ্ডলী আকারে মাটির উপর নিক্ষিপ্ত হয়। সেগুলোই আমরা দেখি। কেঁচোর এহেন কাজের ফলে তলার মাটি উপরে, আর উপরের মাটি তলায় চলে যায়। এতে প্রায় লাঙল দেওয়ার মত কাজ হয়। জমি হয় উর্বর। তাই কেঁচোকে বলা হয় স্বাভাবিক কর্ষক (Natural tillers of the soil)। এ-কাজ এরা করে আসছে বহু যুগ আগে থেকেই। তাই তাদের পৃথিবীর প্রথম চাষী বললে ভুল হয় না। শীত বা বেশি গরমে এরা মাটির বুকে গর্ত করে অনেক তলায় চলে যায়। কিন্তু বর্ষার জলে গর্ত ভরে গেলে এরা উপরে উঠে আসে। জোঁকও এই পর্বের প্রাণী। এ-কথা হয়ত অনেকেই জান যে এরা মানুষ,

গরু, মোষ প্রভৃতির দেহ থেকে রক্ত চুষে খায়। পুকুর, জলা জায়গা এবং জলপূর্ণ ধান-ক্ষেতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। ধান-ক্ষেতে যারা কাজ করে তাদের উপরই জোঁকের আক্রমণ হয় সবচেয়ে বেশি। এরা একবারে নিজের দেহের থেকেও বেশি ওজনের রক্ত চুষে নিতে পারে। কী সাজ্মাতিক ব্যাপার! এরা বহুদিন না খেয়েও বেঁচে থাকে। একটা জোঁক ধরে যদি বাড়িতে জলভরা কোন কাচের পাত্রে রেখে দাও তা হলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে তোমাদের কাছে। এই পর্বের আর একটি প্রাণী হচ্ছে টিউব-ওয়ার্ম। এদের সাগরের বাসিন্দা বলা যেতে পারে। সাধারণত এরা নিজেদের দেহ থেকে বার করা একরকম আঠাল পদার্থ ও সাগরের বালুকণা ইত্যাদি দিয়ে নিজের দেহের চারদিকে একটা নলের আকারের আবরণ তৈরি করে তার মধ্যে বাস করে। নেরিস বলে এই পর্বের আর একটি প্রাণী সমুদ্রের বেলাভূমিতে সাধারণত গর্ত করে বাস করে।

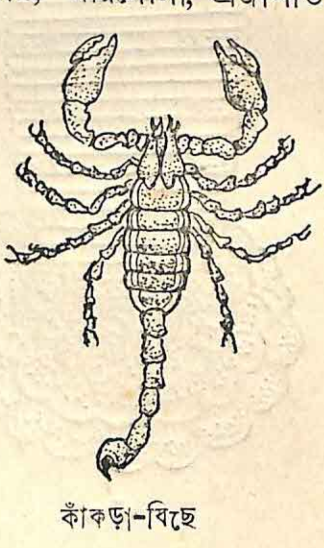


জোঁক

এদের দেহের দু-দিকে কতগুলো সরু সরু অঙ্গ থাকে যা দিয়ে এদের চলাফেরা করার সুবিধে হয়।

আরথ্রোপোডা

এরপর আর এক পর্বের প্রাণীর সঙ্গে মোলাকাত করা যাক। এরা হচ্ছে সন্ধিপদ বা আরথ্রোপোডা। এই পর্বটি প্রাণীজগতের প্রায় সবথেকে বড় পর্ব। প্রাণীরাজ্যের প্রায় এক পঞ্চমাংশ জুড়েই এরা। প্রায় নয় লক্ষেরও বেশি প্রাণী আছে এই পর্বের মধ্যে। এই পর্বের একটি শ্রেণী পতঙ্গ। এদের সংখ্যাই প্রায় আট লক্ষের মত। এই পর্বের প্রাণীদের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এরা জোড়া পা বা জোড়া উপাঙ্গওয়ালা প্রাণী। সাধারণত এদের দেহ চুনজাতীয় পদার্থে তৈরি খোলস বা আবরণী দিয়ে ঢাকা থাকে। জলে ও স্থলে এরা বাস করে। এই পর্বের মধ্যে যে সব প্রাণীর নাম করব তার মধ্যে অনেক প্রাণীই তোমাদের চেনা। প্রথমেই বলি চিংড়ি মাছের কথা। চিংড়িকে মাছ বললে কী হবে, এরা কিন্তু মাছের জাতভাই নয়। তারপরে ধর কাঁকড়া, এও তোমরা অনেকেই দেখেছ। পিঁপড়ে, বোলতা, মশা, মাছি, আরসোলা, প্রজাপতি প্রভৃতি তো আমাদের প্রায় প্রতিদিনেরই চেনা জানা। তেঁতুলে বিছে বা কাঁকড়া বিছের কথাও আমরা জানি। এদের ভয় পায় না এ রকম লোক খুব কমই আছে। এই পর্বের প্রাণীরা কেউ উড়তে পারে, কেউ-কেউ আবার মাটির বুকেই চলাফেরা করে। এদের অনেকে আবার আমাদের নানা উপকারও করে। অনেকে কিন্তু ক্ষতি করতেও ছাড়ে না। বোলতা, মৌমাছি প্রভৃতি হুল ফুটিয়ে দেয়। নানা পতঙ্গ জমির ফসল ও গাছপালা নষ্ট করে। কেউ কেউ নানা রোগ

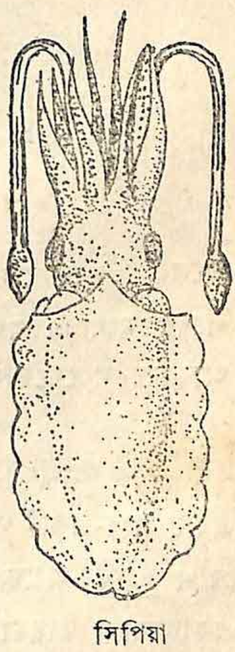


কাঁকড়া-বিছে

ছড়িয়ে আমাদের ক্ষতি করতেও ছাড়ে না। অন্যদিকে আবার মৌমাছির মৌ-ভাণ্ডার আমাদের মধু জোগায়, তাছাড়া মোমও পাই তা থেকে। সিল্কের জামা কাপড় পরি আমরা। সেও তো এক পতঙ্গের দান। এই পর্বের প্রাণীদের কেউ কুৎসিত, আবার কারো কারো চেহারা সুন্দর। আকৃতি, প্রকৃতি, রঙ প্রভৃতির কত যে বৈচিত্র্য এই পর্বের প্রাণীদের তা বলে শেষ করা যায় না। এই পর্বের পতঙ্গ-শ্রেণীর কথা পরে বলা হবে।

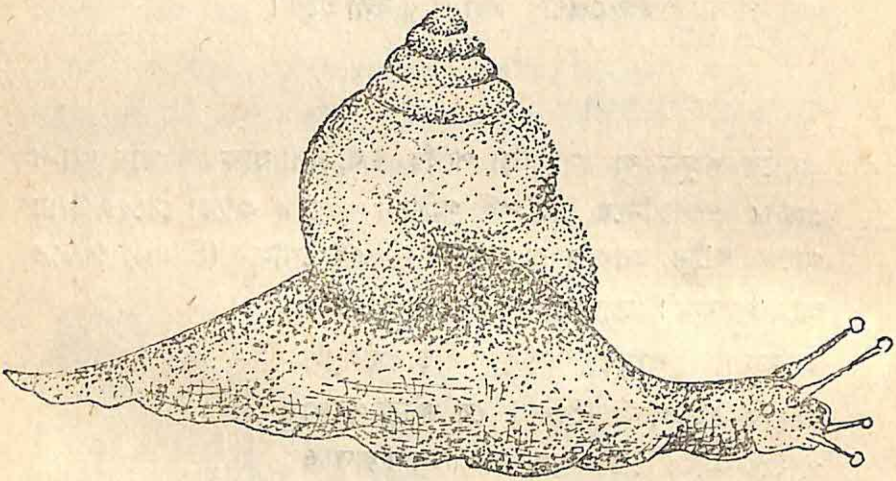
শামুক-জাতীয় প্রাণী

এবারে শম্বুক বা মোলাস্কা পর্বের কথা বলা যাক। প্রায় আশি হাজার প্রাণী নিয়ে এই পর্ব গঠিত। এদের কারো দেহের উপর থাকে কঠিন আবরণ বা খোলক। এই খোলক (Shell) দেখতে অনেক রকম। তাছাড়া এতে রঙের বাহারও অনেক। শামুক, ঝিনুক, গেঁড়ি, গুগ্‌লি প্রভৃতি এই পর্বের প্রাণী। যে শাঁক পুজো পার্বণে, নানা শুভ কাজে বাজানো হয় তাও এক ধরনের শামুকের খোলক। মুক্তো এক জাতের সামুদ্রিক ঝিনুকের দান। মুক্তো তৈরি হয় সামুদ্রিক ঝিনুকের দেহের ভিতর খোলকের তলায়। তাছাড়া বোতাম ও নানা সৌখিন জিনিসও তৈরি হয় ঝিনুকের খোল থেকে। কড়ি নিয়ে খেলার এখনো প্রচলন আছে আমাদের দেশে। সেই কড়িও একজাতের শামুকের খোলক।


সিপিয়া

অক্টোপাস, সিপিয়া, ললিগো প্রভৃতিও এই পর্বের অন্তর্গত। অবশ্য এদের দেহের বাইরে খোলক থাকে না। এরা সমুদ্রের বাসিন্দা। কারো কারো দেহ বেশ বড়।

এদের মুখের চারদিকে আট থেকে দশটা শুঁড় থাকে। মাথায় এদের দুটি বেশ স্পষ্ট ও বড় বড় চোখ। শুঁড়গুলো এদের খাবার ধরা, শত্রুর আক্রমণ ও বিপদে আত্মরক্ষার হাতিয়ার বলা যেতে পারে। সিপিয়ার দেহের ভিতর থাকে একরকম গ্রন্থি। কোন শত্রুর সন্ধান পেলে এরা সেই গ্রন্থি থেকে রস বার করে দেয় জলে। ফলে জল হয়ে যায় ঘোলা। এতে করে আক্রমণকারী



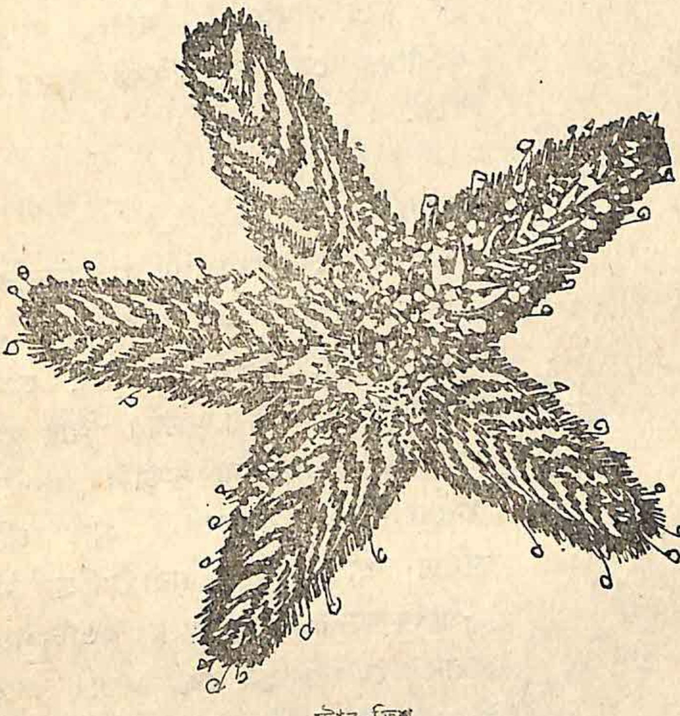
শামুক

জলের ভিতরে কোথায় কি আছে তা দেখতে পায় না। এই পর্বের মধ্যে একরকম প্রাণী আছে যা অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে আকারে সবথেকে বড়।

কণ্টক-ত্বক প্রাণী

এবার আর-একটি পর্বের কথা বলছি। এই পর্বে চার হাজারেরও বেশি প্রাণী আছে বলে জানা যায়। পর্বটির নাম কণ্টক-ত্বক বা একাইনো ডারমাটা। তারা মাছ (Star fish), সামুদ্রিক শশা (Sea-cucumber), সামুদ্রিক আরচিন (Sea-urchin), পালক তারা (Feather star) প্রভৃতি প্রাণীরা এই পর্বেরই

অন্তর্গত। সাধারণত এদের দেহ কাঁটা বা গুটিতে ভরা। তাই নাম হয়েছে কণ্টক-ত্বক প্রাণী। এরা সমুদ্রে বাস করে। নামে মাছ হলেও কিন্তু আসলে তারা মাছ বা স্টার-ফিশ মোটেই নয়। এদের দেহ অনেকটা তারার মত দেখতে। এদের পাঁচটি বাহু পাঁচ দিকে

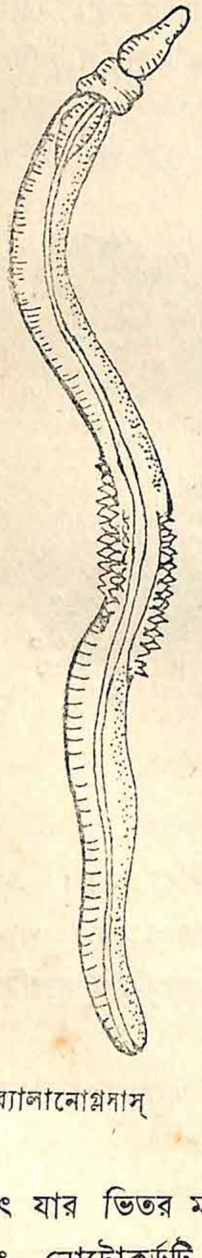


স্টার-ফিশ

প্রসারিত। সামুদ্রিক শশা দেখতে অনেকটা শশার মত। এদের সামনে মুখের চারদিকে বাহুগুলি বৃত্তের মত থাকে। পালক-তারার বাহুগুলি কিন্তু পাখির পালকের মত। সামুদ্রিক আরচিনের দেহে রয়েছে অনেক গুটি ও কাঁটা।

এতক্ষণ যে-সব প্রাণীর পরিচয় পাওয়া গেল তারা সকলেই অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের কারোর দেহের ভিতর আমাদের মত শিরদাঁড়া নেই। মোটামুটি ন-টি পর্বে এই অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা বিভক্ত হয়েছে। তার মধ্যে প্রোটোজোয়া ছাড়া আর

সব পর্বের প্রাণীদের দেহ বহু কোষ দিয়ে তৈরি। আরও দেখা গেছে যে, প্রথমে এক-কোষী প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে, তারপর হয়েছে বহু-কোষী প্রাণীদের উদ্ভব। বহু-কোষীদের মধ্যে আবার কারো-কারো কোষগুলি দুটি স্তরে সাজানো। আবার অন্যদলের প্রাণীদের কোষগুলো তিনটি স্তরের সৃষ্টি করেছে।



ব্যালানোগ্লসাস্

কর্ডাটা

এবার যে পর্বের কথা বলব তাও তিনকোষী প্রাণী দিয়ে তৈরি। এই পর্বের মধ্যে মাছ, ব্যাঙ, সাপ, টিকটিকি, পাখি, ছাগল, গরু ইত্যাদি প্রাণীরা আছে। আর আছে মানুষও। এ পর্বটির নাম কর্ডাটা। এ-পর্বেও অসংখ্য প্রাণীর সমাবেশ। প্রায় চল্লিশ হাজার প্রাণী তাদের নানা বৈচিত্র্য নিয়ে এ-পর্বের আসর জমিয়ে আছে। কর্ডাটা পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, এদের দেহের ভিতর নরম ও মজবুত একটি দণ্ড থাকে যার নাম নোটোকর্ড। আর এটির জন্যেই এদের পর্বটির নাম হয়েছে কর্ডাটা। জলে, স্থলে, আকাশে—সর্বত্র এদের গতিবিধি। এই পর্ব দু-টি ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগের নাম প্রোটোকর্ডাটা বা অ্যাক্রেনিয়া। এদের কোন জোড়া প্রত্যঙ্গ নেই বা করোটি অর্থাৎ যার ভিতর মস্তিষ্ক থাকে তা নেই। এদের এই অঙ্গটি অর্থাৎ নোটোকর্ডটি কারো ছোট, আর তা দেহের সামান্য

অংশ মাত্র অধিকার করে আছে ; যেমন, ব্যালানোগ্লসাস্ বলে একটি প্রাণী। এই প্রাণীটির দেহ অনেকটা কেঁচোর মত নরম। এরা সমুদ্রের বালির তলায় থাকে। আয়োডোফর্ম নামে একরকম রাসায়নিক দ্রব্যের গন্ধ ছড়ায় এরা। সাগরের ধারে এই গন্ধ পেলে বুঝতে হবে যে এরা কাছাকাছি আছে। আর এক ধরনের প্রাণীর নাম অ্যাসিডিয়া। এরাও এই পর্বের প্রাণী। এদের দেহে নোটোকর্ডটি খুবই ছোট, কখনো বা ভ্রূণ অবস্থায় থাকে মাত্র। কিন্তু বড় বা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এটির দেখা মেলে না। জীবনের প্রথম দিকে ছোট অবস্থায় এরা চলা-ফেরা করতে পারে। বড় অবস্থায় এদের দেহটি অনেকটা ব্যাগ বা থলির মত দেখতে হয় এবং একটি আবরণী দিয়ে ঢাকা থাকে ; এসময়ে এদের চলাফেরা করারও ক্ষমতা থাকে না। অ্যাম্ফি অক্সাস বলে আর-এক ধরনের প্রাণী আছে। এরাও কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত। এই প্রাণীটি দেখতে অনেকটা মাছের মত। লেজটিও লম্বা। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত জুড়ে আছে নোটোকর্ড। একটি পাখনা আছে পিঠ থেকে লেজ পর্যন্ত।

মেরুদণ্ডী প্রাণী

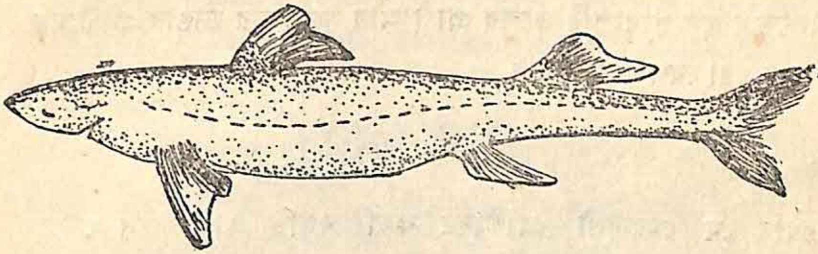
কর্ডাটা পর্বের অপর ভাগটির নাম হচ্ছে ক্রেনিয়াটা বা মেরুদণ্ডী (Vertebrate)। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নোটোকর্ডটি সাধারণত ভ্রূণ বা ছোট অবস্থায় থাকে, কিন্তু বড় অবস্থায় এটি মেরুদণ্ডে পরিণত হয়। এদের করোটি থাকে, যাকে বলা হয় মস্তিষ্কের বাক্স। এইসব থাকে বলেই এই ভাগটির এমন নামকরণ হয়েছে। এই প্রাণীদের মধ্যে একদলের চোয়াল নেই, নেই জোড়া পাখনা বা জোড়া উপাঙ্গ। নলের আকৃতি-বিশিষ্ট দেহে একটি পাখনা অবশ্য আছে। ল্যাম্প্রে ও হ্যাগ ফিশ হল এই জাতের প্রাণী। এদের দেখলে অনেকটা সাপ বলে ভুল হতে পারে। বর্মযুক্ত মাছ বলে

এক জাতের মাছ এককালে আমাদের পৃথিবীতে ছিল। কিন্তু আজ তারা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই আজ আর এদের দেখা মিলবে না। বর্মযুক্ত মাছ বা হ্যাগ ফিশও কিন্তু মাছ নয়। কারণ মাছের যে সব বৈশিষ্ট্য আছে এদের তা নেই। মাছের বৈশিষ্ট্যের কথা পরে বলা হবে।

চোয়ালহীন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কথা কিছু বলা হল। এখন চোয়ালওয়ালা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কথায় আসা যাক। এ প্রাণীরা পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে, মৎস্য বা পিসিস (Pisces)। রুই, কাতলা, মাগুর, ইলিশ, ভেট্‌কি, পুঁটি, কই, তপ্‌সে প্রভৃতি মাছ, এমনকি হাঙর পর্যন্ত এই শ্রেণীতে পড়ে। মাছের বিশেষত্ব হল, সকল মাছের দেহেই দেখতে পাওয়া যাবে কাঁটাওয়ালা জোড়া পাখনা। এক মাছ ছাড়া কাঁটাওয়ালা জোড়া পাখনা আর কোন প্রাণীর নেই। এছাড়া এদের দেহ সাধারণত আঁশে ঢাকা থাকে। জোড়া পাখনা ছাড়া বিজোড় পাখনাও কখনো-কখনো দেখা যায়। মাছের মধ্যে অনেকেরই আবার আঁশ থাকে না, যেমন সিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি। সমুদ্র, পুকুর, খাল বিল, নদী প্রভৃতি জলাশয়ে এদের পাওয়া যায়। মাছই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সংখ্যায় সবথেকে বেশি। মাছ জলচর ; কিন্তু একই রকম জলে সবাই থাকে না। কেউ মিঠে জলে থাকে, কেউ থাকে নোনা জলে। নোনা জলের মাছকে মিঠে জলে বা মিঠে জলের মাছকে নোনা জলে হঠাৎ যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে সেগুলো বাঁচতে পারে না।

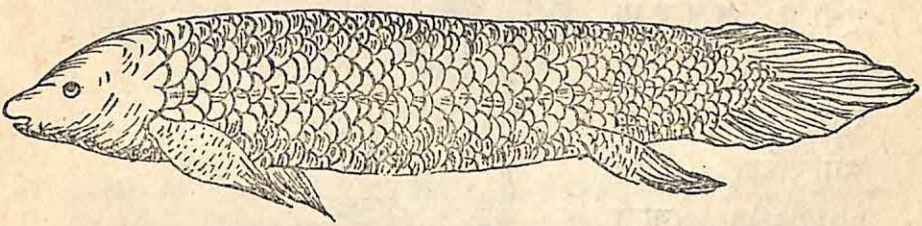
একজাতের মাছের অন্তঃকঙ্কাল নরম। এদের বলা হয় তরুণাস্থি বা কোমলাস্থি-বিশিষ্ট মাছ। ক্যালসিয়াম কার্বনেট কম থাকে এদের কঙ্কালে। হাঙর, শঙ্কর মাছ প্রভৃতি এইজাতের মাছ। শঙ্করমাছের লেজ দিয়ে চাবুক তৈরি হয়, সে কথা হয়ত তোমাদের জানা আছে। এদের দেহেও আঁশ থাকে। তবে,

আঁশগুলো ছোট ছোট, আর শক্ত। এই আঁশকে বলে প্ল্যাকোয়েড। হাঙরের এমনি আঁশওয়ালা চামড়া দিয়ে শিরিস কাগজের মত



হাঙর

ঘসার কাজ হয়। কঠিনাস্থি বা শক্ত-হাড়ওয়ালা মাছের মধ্যে রুই, মৃগেল, ল্যাটা, মউরলা, আড়, ট্যাংরা আমাদের খুবই পরিচিত। জলে বাস করে বলে মাছের শ্বাসকার্য চলে ফুলকোর সাহায্যে। কয়েকটি মাছের ফুলকো ছাড়াও আর একটি আলাদা শ্বাসযন্ত্র



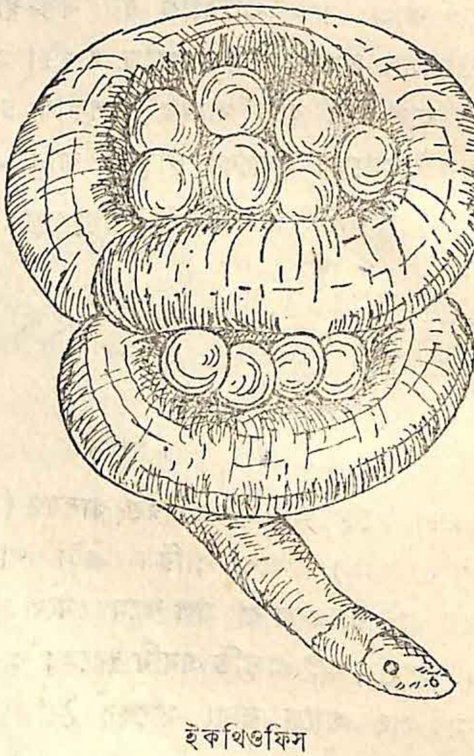
ডিপনয়

থাকে। একে আমরা অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র (Accessory respiratory organ) বলতে পারি। এটা থাকার ফলে এ-সব মাছ জলের বাইরে এলে বা জল কমে গেলে হঠাৎ শ্বাসকষ্টে মারা যায় না। মাগুর, কই প্রভৃতি এমনি ধরনের মাছ। আবার আর-এক ধরনের মাছ আছে যারা মাছের বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী তো বটেই, উপরন্তু তাদের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্যে উভচর প্রাণীদের সঙ্গে এদের অনায়াসে তুলনা করা চলে। মাছ হলেও স্থলচর প্রাণীর মত এদের ফুসফুসও আছে। তাই দু-রকম ভাবেই এরা শ্বাসকার্য চালায়। জলে এবং স্থলে দু-জায়গাতেই

এদের সুবিধে। জলে ফুলকো দিয়ে আর ডাঙায় ফুসফুস দিয়ে এরা শ্বাসকার্য চালাতে পারে। এদের নাম হল ডিপ্‌নয় (Dipnoi)। বলতে গেলে,পুরোপুরি জলের প্রাণী আর পুরোপুরি ডাঙার প্রাণীদের মধ্যে এরা যেন যোগসূত্র।

উভচর প্রাণী

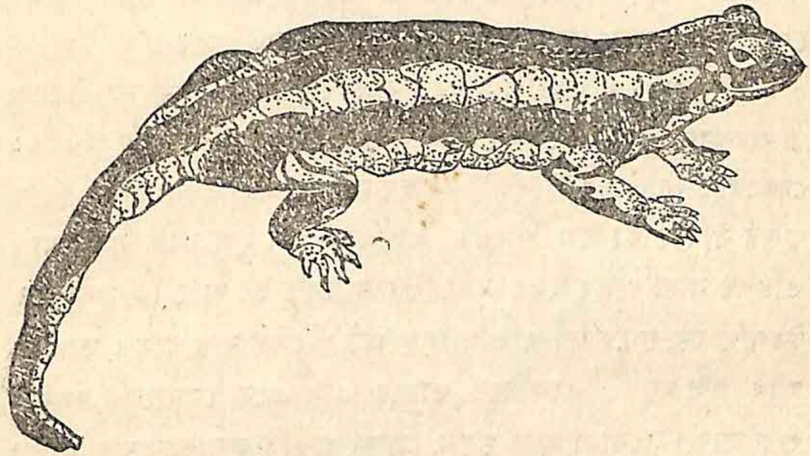
এবার যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কথা বলছি তারা জল ছেড়ে ডাঙার অধিবাসী হয়ে গেছে। অবশ্য জলের মায়া তারা একেবারে ত্যাগ করতে পারে নি। জীবনের প্রথম অবস্থায় তারা জলেই বাস করে, তারপর পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ডাঙায় আসে। এরা হচ্ছে উভচর বা অ্যাম্ফিবিয়া (Amphibia)। সোনা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, স্যালামানডার, ইকথিওফিস (Ichthyophis) প্রভৃতি প্রাণী উভচর শ্রেণীর। স্যালামানডার অনেকটা টিকটিকির



ইকথিওফিস

মত। দু-জোড়া পা আছে এদের। আর আছে একটি বড় লেজ। ইকথিওফিস প্রায় সাপের মত দেখতে। হাত পা নেই। মাটির তলায় গর্ত করে এরা বাস করে। এদের মজা হচ্ছে যে, স্ত্রী-

ইকথিওফিসরা ডিম পেড়ে তা রেখে দেয় তাদের দেহ কুণ্ডলী পাকিয়ে সেই কুণ্ডলীর মধ্যে। ডিমগুলো রক্ষার একটা ব্যবস্থা আর কি। আর ব্যাঙ তো তোমাদের সকলের পরিচিত। বর্ষার



স্যালম্যান্‌ডার

জল পেলে ব্যাঙের সুমধুর সঙ্গীতের জ্বালায় বিব্রত হওয়ার অভিজ্ঞতা তোমাদের আছে। তবে একমাত্র পুরুষ-ব্যাঙই কিন্তু ও-জাতীয় শব্দ করতে পারে; স্ত্রী-ব্যাঙ সঙ্গীত-চর্চায় একেবারেই বিমুখ। কুনো ব্যাঙ মাটি বা আবর্জনার স্তূপের মধ্যে, স্যাঁতসেতে জায়গায়, ভাঙা দেওয়ালের ফাটলে, গর্ত প্রভৃতিতে বাস করে। এরা বেশ জোরে লাফাতে পারে। সাধারণত রাত্রে এরা শিকারের জন্যে বেরোয়। কীট, পতঙ্গ, কেঁচো প্রভৃতি এদের খাদ্য।

ব্যাঙের শিকার প্রণালীটি বেশ মজার। এদের জিভটা থাকে মুখের ভিতর সামনে আটকানো, কিন্তু পেছনের দিকটা খোলা। জিভটা বেশ আঠাল। শিকারের সন্ধান পেলে মুখ থেকে ওই আঠাল জিভটা বার করে শিকারের দিকে ছুড়ে দেয় এরা। শিকার আটকে যায় জিভে। এরপর শিকার সমেত জিভটাকে মুখের ভিতর পুরে নেয় এরা।

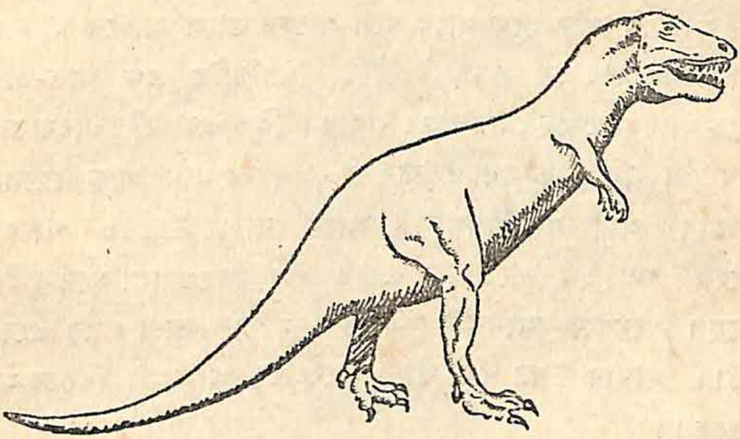
বর্ষাকালে ব্যাঙেরা বেশ সক্রিয় হয়ে উঠে। সে সময় এরা ডিম দেয়। কিন্তু শীতে এরা নির্জীব হয়ে পড়ে। সে সময় এরা গর্তের মধ্যে গিয়ে সেখানেই সারা শীতটা কাটিয়ে দেয়। না খাওয়া, না দাওয়া। শ্বাসকার্য চলে খুব ধীরে। একেই বলে শীত-ঘুম। শীত-শেষে ঠাণ্ডা কমে গেলে এরা বেরিয়ে আসে গর্ত থেকে।

বর্ষার সময় ব্যাঙের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। পুকুরেই এদের এ অবস্থাটা কাটে। সেই শৈশব অবস্থার নাম হল ব্যাঙাচি অবস্থা। দেখতে তখন এদের অনেকটা মাছের মত। এরা তখন লেজ দিয়ে সুন্দর সাঁতার কাটতে পারে। শ্বাসকার্য চলে ফুলকোর সাহায্যে। তারপর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যাঙাচি হয় ব্যাঙ। ফুসফুসের উৎপত্তি হয়, দু-জোড়া পাও গজিয়ে ওঠে। লেজ যায় খসে। তারপর আর জল নয়। একেবারে ডাঙায় চলে এসে সেখানেই বসবাস শুরু করে। সোনা ব্যাঙ পুকুর, ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ে বাস করে। এদের পায়ের আঙুল চামড়ার পর্দা দিয়ে জোড়া। তাই সাঁতার কাটতে এদের কোন অসুবিধে হয় না। কুনো ব্যাঙদের মত এদের গায়ে কোন আঁচিল নেই। কুনোদের মত অত কদাকারও নয় এদের চেহারা। একরকম ব্যাঙ আছে যাদের গেছো ব্যাঙ বলা হয়। গেছোদের পায়ে গোলমত মাংসপিণ্ড থাকে। তা দিয়ে এরা গাছের ডালে আটকে থাকে।

সরীসৃপ

উভচর প্রাণীদের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। এবার সরীসৃপ শ্রেণীর (Reptilia) প্রাণীদের সঙ্গে পরিচয় করতে হবে। অতিকায় সরীসৃপের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। সাপ, টিকটিকি, কুমির, কচ্ছপ, বহুরূপী প্রভৃতি প্রাণীরা এই সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্গত। এরা বুকে হেঁটে চলাফেরা করে। কারো গায়ে থাকে আঁশ, কারো দেহ খোলায় ঢাকা। সরীসৃপের আঁশ আর মাছের

আঁশের মধ্যে তফাত আছে। এই দু-জাতের প্রাণীদের আঁশের উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। সরীসৃপরা জলের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। অবশ্য অনেকে আবার জলের আশ্রয়ও নিয়েছে। ফুসফুস দিয়ে এরা শ্বাসকার্য করে। তবে যে সব সরীসৃপ জলে বাস করে তারা জলে থাকার সময় মাঝে মাঝে



টিরেনোসর



ডিপ্‌লোডকাস

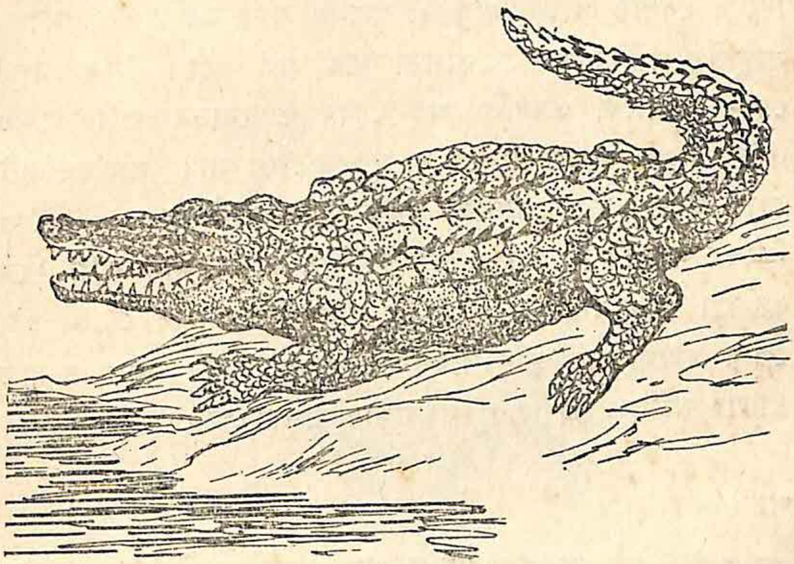
মুখ এবং নাক জলের উপর তুলে বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয়। ডাঙাতেই এরা ডিম পাড়ে। টিকটিকি, গিরগিটি আমাদের অতি পরিচিত। ঘরের দেওয়ালে টিকটিকিকে পোকামাকড় ধরতে প্রায়ই দেখা যায়। এদের মত টিকটিক শব্দ আর কেউ করে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় একরকম টিকটিকি আছে যাদের আওয়াজে

কানে তালা ধরে যাবার মত অবস্থা হয়। বাগানে, গাছে, ঝোপে ঝাড়ে গিরগিটির দেখা পাওয়া যায়। বিরাট এদের লেজ। দেহের চেয়ে লেজটিই বড়। বহুরূপীও গিরগিটি জাতের প্রাণী। এরা কয়েক সেকেণ্ড পর-পর দেহের রঙ বদলায়। এদের লেজের পিছনের অংশ দিয়ে এরা গাছে আটকে থাকতে পারে। এদের সামনের পা আর পিছনের পায়ের প্রথম দুটি আঙুল বাকি তিনটি আঙুলের বিপরীত মুখে থাকে বলে গাছের ডালে আটকে থাকতে কোন অসুবিধে হয় না। টিকটিকি, গিরগিটির এক জাত-ভাই আছে যাদের রয়েছে বেশ রঙের বাহার। কিন্তু এরা ভীষণ বিষাক্ত। প্রায় বিশ ইঞ্চির মত লম্বা এদের দেহ। এদের নাম হচ্ছে হেলো-ডারমা। আর এক জাতভাই আছে যারা উড়তেও পারে। তাদের বলা হয় ড্রাকো। এদের এক শিঙওয়ালা জাতভাইও আছে। দেখতে অনেকটা ব্যাঙের মত। সারা গায়ে এদের কাঁটা। মাথার উপর যে কাঁটা থাকে তা অনেকটা শিঙের মত দেখতে।

নানা জাতের সাপও সরীসৃপ। গোখরো, কেউটে, চিতি, শাঁখা-মুটি, বোড়া, ময়াল প্রভৃতি প্রায় দু-হাজার রকমের সাপ আছে। গোখরো সাপের ফণা থাকে। এই ফণায় দেখা যায় চক্র, যেটা অনেকটা গরুর পায়ের খুরের মত দেখতে। তাই বোধহয় এদের গোখরো বা গোখুরা বলা হয়ে থাকে। এরা বিষধর। অবশ্য অনেক সাপই বিষধর নয়। সাপের অনেকের ফণাও নেই। সাপেরা নানা পরিবেশে বাস করে। সমুদ্র, নদী, পুকুর, পাহাড়, জঙ্গল প্রভৃতি নানা স্থানে এদের দেখা পাওয়া যায়। সাপেরা খুব ঠাণ্ডা দেশে, বিশেষ করে মেরু অঞ্চলে (Polar region) থাকে না।

কচ্ছপরাও সরীসৃপ জাতের প্রাণী। বাক্সের মত খোলক এদের দেহের আবরণ। সাধারণত ইচ্ছেমত এরা এদের দেহ অর্থাৎ মুখ, পা ইত্যাদি গুটিয়ে নিতে পারে ওই খোলকের মধ্যে। পুকুর,

নদী, সমুদ্র, ডাঙা প্রভৃতি নানা পরিবেশে এরা থাকে। যেখানেই থাক, ডিম দিতে আসতে হয় কিন্তু ডাঙাতেই। এরা কেউ ছোট—কেউ আবার ওজনে এক মণ, কি তারও বেশি হতে পারে।



কুমির

সরীসৃপদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে কুমির। প্রায় ৪০ ফুটের মত লম্বা কুমিরও দেখা যায়। কুমির ছোটও আছে। মেছো কুমির, মানুষখেকো কুমির, অ্যালিগেটর প্রভৃতি নানা রকমের কুমিরের কথা জানা যায়। হিংস্রতায় কুমিরদের মত ভয়ঙ্কর প্রাণীর জুড়ি মেলা ভার। এদের দাঁতাল মুখের পাল্লায় পড়লে আর রক্ষে নেই। কুমির জল বা ডাঙা, দু-জায়গাতেই থাকে। তবে জলটাই যেন বেশি পছন্দ। রোদ পোহাতে, ডিম দিতে বা কখনো-সখনো খাবারের সন্ধানে এদের ডাঙায় আসতে দেখা যায়।

স্ফেনোডন (Sphenodon) বলে একরকম সরীসৃপ আছে নিউজীল্যাণ্ডে। নিউজীল্যাণ্ডে এদের বলা হয় টুয়াটারা, এ ছাড়া

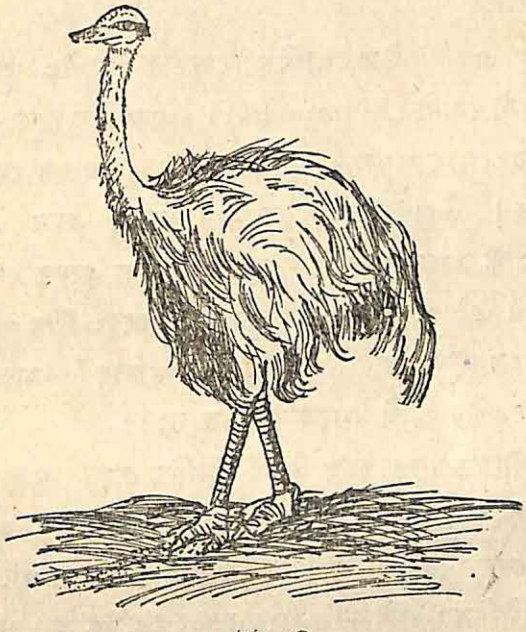
এই জাতের সরীসৃপদের জাত-ভাই আজ আর কেউ বেঁচে নেই। গিরগিটির মত অনেকটা দেখতে হলে কি হবে, অনেক গরমিল রয়েছে কিন্তু তাদের সঙ্গে। তবে আগেকার দিনের সরীসৃপদের সঙ্গে এদের অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। এরা নিশাচর, দিনের বেলায় থাকে গর্তে। অনেক সময় এরা এক জাতের সামুদ্রিক পাখির সঙ্গে বোঝাপড়া করে বাস করে। কিন্তু অপর কোন প্রাণীকে, এমনকি অন্য কোন স্ফেনোডন পরিবারকেও এদের নিজস্ব আশ্রয়ে থাকতে বা ঢুকতে দেবে না। সাধারণ দুটি চোখ ছাড়া এদের মাথায় থাকে আর-একটি চোখ। শিবের ত্রিনেত্র আর কি! তবে এ চোখটি দিয়ে এদের কোন্ কাজ সিদ্ধ হয় তা জানা যায়নি। মনে হয় পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এটা পেয়ে এখনো তার স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে এরা। প্রায় ছ-সাত হাজার সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

পাখি আর পাখি

এবার পক্ষীকুলে প্রবেশ করছি আমরা। পক্ষীশ্রেণী (Aves) এক অপূর্ব সৃষ্টি। প্রায় তের হাজার রকম পাখি আছে বলে জানা গেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত পাখির সঙ্গেই না আমাদের পরিচয়। আমাদের ঘুম ভাঙে পাখির ডাকে। আর ওরা যখন ডাকের সাড়া তুলে ঘরে ফেরে, তখন বুঝি, আলো নিভে যাচ্ছে, আসছে সন্ধ্যা। অনেকের বাড়িতে পাখি পোষাও হয়। এরা এমন এক প্রাণী যাদের দেখলেই মনে হয়, একটু আদর করি, বাড়িতে পুষি। অবশ্য কাক পোষার কথা হয়ত তোমরা ভাবতে পার না। কত রঙ-বেরঙের পাখির দলই না আছে! এদের মধ্যে বেশির ভাগই নীল নীলিমায়, কখনো বা মাটির কাছে মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায়। গাছের ডালে, গৃহশীর্ষে, বনে, বাগানে, ডাঙায় স্বচ্ছন্দে বিহার করে এরা। কয়েকটি পাখি আবার উড়তে পারে

না। এরা দৌড়তে বা চলতে পারে ভাল। উটপাখি বা অস্ট্রিচ, এমু, কিউই প্রভৃতি এই জাতের পাখি।

উটপাখিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি। পাখির দেহ পালকে ঢাকা। পাখি ছাড়া আর কোন প্রাণীর পালক নেই। এদের সামনের পা বা হাত ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। যে পাখি উড়তে



উটপাখি

পারে তাদের ডানা তাদের উড়তে সাহায্য করে। উটপাখিদের ডানা ছোট তাই তারা উড়তে পারে না। যে পাখি জলে সাঁতার দেয় তাদের পায়ের আঙুলগুলো চামড়া দিয়ে জোড়া। হাঁসের পা দেখলেই এ-কথাটা বোঝা যায়। অনেক পাখির মধ্যে আবার যাযাবর-বৃত্তি দেখা যায়। এরা এক দেশ থেকে অন্য এক দেশে অতি সহজেই উড়ে যেতে পারে। বালিহাঁসের মধ্যেও এই যাযাবর-বৃত্তি আছে।

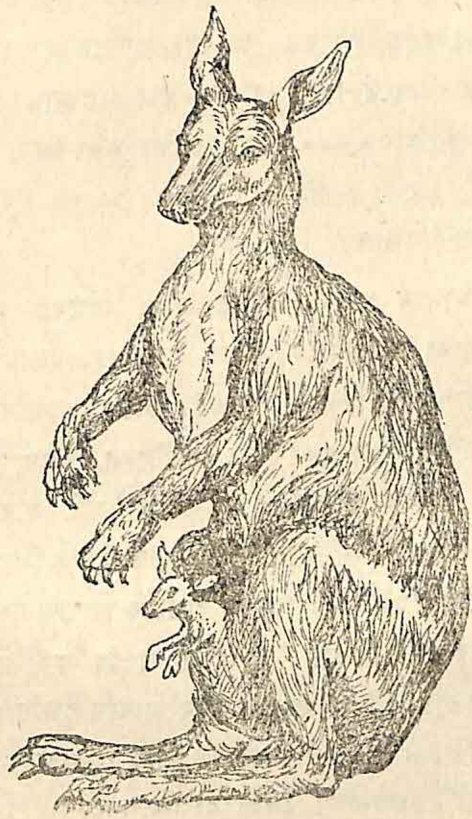
পাখিরা সব উষ্ণ-শোণিত শ্রেণীর প্রাণী। এদের পালকে ঢাকা দেহের তাপ সব সময় সমানই থাকে। পাখির মুখে থাকে চঞ্চু। টিয়া, চন্দনা, হাঁস, মুরগি, কোকিল, পায়রা, কাক প্রভৃতি পক্ষী-শ্রেণীর প্রাণী। এই শ্রেণীতে আছে ময়ূর, যা আমাদের জাতীয় পক্ষীর সম্মান পেয়েছে।

স্তন্যপায়ী প্রাণী

এবার আর একটি উষ্ণ-শোণিত শ্রেণীর প্রাণীর কথা বলছি। এরা স্তন্যপায়ী শ্রেণী (Mammalia)। এরা মাতৃদুগ্ধে বর্ধিত হয়। দেহে এদের লোম থাকে। পাখিদের মত এদের দেহেও তাপ সমান থাকে। এরা ডিম পাড়ে না। তবে, এমন এক ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে যারা ডিম পাড়ে। কিন্তু এদের দেহও লোমে ঢাকা থাকে। এই হংসচঞ্চু ছুঁচো স্তন্যপায়ী হয়েও ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। বাচ্চারা মাতৃদুগ্ধ পান করে। অতএব এদের একটি মধ্যশ্রেণীর প্রাণী বললে ভুল হয় না।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আর একটি বিচিত্র প্রাণী হচ্ছে ক্যাঙারু। এদের পিছনের দুটি পা বেশ বড় সামনের পায়ের তুলনায়। লেজটাও বেশ বড়। স্ত্রী-ক্যাঙারুদের দেহে থাকে একটা থলির মত জিনিস। সেই থলির মধ্যে থাকে দুগ্ধগ্রন্থি। এদের বাচ্চা প্রায় অপরিণত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। সেই অপরিণত বাচ্চারা ওই দুগ্ধগ্রন্থিতে আটকে থাকে। থলির মধ্যে তারা বেশ কয়েক মাস কাটিয়ে দেয়। মজা হচ্ছে, দুধ পায় এরা ওই গ্রন্থি থেকে আপনা আপনিই। নিজেদের দুধ টেনে নিয়ে খেতে হয় না। তারপর এক সময় বাচ্চাদের মুখ বোঁটা থেকে খসে যায়। তখন মাতৃদেহ থেকে এরা মুক্ত হয়ে নিজেরাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে শুরু করে। এই বিচিত্র প্রাণীদের দেখতে পাওয়া যাবে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে। ক্যাঙারুরা ছোট বড় দু-রকমই হয়। রঙও হয় তাদের নানারকম।

এ ছাড়া কুকুর, বেড়াল, বাঘ, সিংহ, গরু, ভেড়া, উট, হাতি, কাঠবেড়াল, ইঁদুর, ছুঁচো প্রভৃতি সবাই স্তন্যপায়ী প্রাণী। মানুষও এই শ্রেণীতে পড়ে। এই শ্রেণীর প্রাণী নানা পরিবেশে বাস করে।



ক্যাঙারু

বাদুড়, চামচিকে উড়তে পারে। তিমি, সীল, জলহস্তী প্রভৃতি জলে বাস করে। বাঁদর গাছে থাকতে পারে। কেউ-কেউ আবার মাটিতে গর্ত করে সেখানে থাকে, যেমন—ইঁদুর, খরগোস ইত্যাদি। আর মানুষের কথা কী বলব, এদের কথা তো সকলেরই জানা। মানুষের সঙ্গে নিশ্চয় তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। তুমিও প্রাণীরাজ্যে স্তন্যপায়ীদের একজন।

স্তন্যপায়ীরাও নানা বৈচিত্র্য নিয়ে প্রাণীরাজ্য জুড়ে আছে। নানা আকৃতি, নানা স্বভাব এদের। কেউ ছোট, কেউ বড়। কোন স্তন্যপায়ী এত বড় যে তা আকারে প্রাণীজগতে বৃহত্তম। তিমি হচ্ছে সেই বৃহত্তম প্রাণী। সবথেকে বড় তিমি একশো ফুটের মত লম্বা হতে পারে। আমরা হাতির মত চেহারা বলি, কিন্তু এরা তিমির কাছে শিশু বললে ভুল হয় না। যাই হোক, প্রায় ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ স্তন্যপায়ীদের কথা জানা যায়।

প্রাণীরাজ্যে শ্রেণীবিভাগ

প্রাণীরাজ্যের নানান রকম প্রাণীর কথা, তাদের দল-উপদলের কথা, তোমারই বা প্রাণীরাজ্যে স্থান কোথায়, মোটামুটি সে-সব জানলে। এই প্রাণীরাজ্যকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাণীরাজ্যের একটি ধারা এককোষী প্রাণীদের, আর অন্যটি হচ্ছে বহুকোষী। এককোষীদের একটি মাত্র পর্ব, যার নাম হচ্ছে প্রোটোজোয়া। অ্যামিবা আর তার জাতভাইদের নিয়ে এই পর্ব। বহুকোষীদের মোটামুটি ন-টি পর্ব। অতএব সবশুদ্ধ দশটি ভাগে বা পর্বে এই প্রাণীরাজ্যটি বিভক্ত। বিভিন্ন পর্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। পর-পর এই পর্বগুলোর নাম আবার বলছি। প্রথমে— প্রোটোজোয়া (Protozoa)। তারপর হচ্ছে পরিফেরা (Porifera) বা ছিদ্রাল প্রাণী, একনালী দেহী বা সিলেন্টেরাটা (Coelenterata), প্ল্যাটিহেল্মিনথিস (Platyhelminthes), নিমাথেল্মিনথিস (Nemathelminthes)। এরপর অঙ্গুরীমাল প্রাণী বা অ্যানিলিডা (Annelida), অ্যারথ্রোপোডা (Arthropoda) বা সন্ধি-পদ প্রাণী, শম্বুক বা মোলাস্কা (Mollusca), এবং কণ্টকত্বক বা একাইনোডারমাটা (Echinodermata)। এ সবই অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের পর্ব। সবশেষের পর্বটি হল কর্ডাটা (Chordata)। এইভাবে বৈজ্ঞানিকগণ প্রাণীজগতকে কতগুলি ভাগে ভাগ করেছেন, যাকে

বলা হয় শ্রেণীবিভাগ (Classification)। আগেই দেখেছ, কতকগুলো প্রাণীকে আমরা মাছ বলি। যেমন, তারা মাছ, চিংড়ি মাছ, তিমি মাছ। কিন্তু এদের কেউই মাছ নয়। কেন নয় তাও আগে বলা হয়েছে। আবার বাদুড়, চামচিকে উড়তে পারে বলেই কি পাখি? নিশ্চয় নয়। এরা সব স্তন্যপায়ী। স্তন্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্যগুলো এদের মধ্যে সুস্পষ্ট। প্রত্যেক প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করলেই আমরা তাদের চিনতে ভুল করব না। সাধারণত দেহ-গঠনের বৈশিষ্ট্য দেখেই প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

প্রজাতি এবং গণ

কিভাবে এক একটি পর্ব তৈরি হয়েছে তা এবার দেখা যাক। বাইরে থেকে একই রকম দেখতে যে-সব প্রাণী তাদের একটি প্রজাতিভুক্ত করা হয়েছে। এদের একটিকে দেখলে ও জানলে এদের দলের সবাইকে জানা যাবে। কারণ সবারই রয়েছে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য। মনে রাখতে হবে, একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী প্রাণীরা একই প্রজাতিভুক্ত। যেমন, মানুষ, কুকুর, গরু এক একটি প্রজাতি (Species)। যে-সব প্রজাতির মাঝে আবার মোটামুটি একটি মিল আছে (অবশ্য কিছু কিছু অমিলও আছে) সে-সব প্রজাতিদের একটি গণের (Genus) মধ্যে ফেলা হয়েছে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মিল আছে বলেই এরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে; যেমন, কুকুর ও শেয়াল আলাদা আলাদা প্রজাতি। কিন্তু এদের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকায় এদের গণ একই। তেমনি বাঘ ও সিংহ একই গণের মধ্যে হলেও ভিন্ন প্রজাতি। এমনিভাবে গণ তৈরি করেছে গোত্র (Family)। গোত্র থেকে বর্গ (Order)। আবার একই ধরনের বর্গ তৈরি করেছে শ্রেণী (Class)। কতকগুলো একই বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট শ্রেণী নিয়েই পর্ব (Phylum)। একটি

কুকুরকে যদি বলি কুকুর একটি প্রাণী, তাহলে কুকুরের সব পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি বলি কুকুর কর্ডাটা পর্বের স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণী, তাহলে কুকুরের কিছুটা পরিচয় পেলাম। যেমন, একটি ছেলেকে যদি বলি ছাত্র, তা হলে তার সব পরিচয় দেওয়া হল না। ছাত্র সে ঠিকই। কিন্তু সে কলেজের ছাত্র, না স্কুলের ছাত্র ? যদি স্কুলের হয় তবে কোন্ শ্রেণীর ? দশম শ্রেণীর হলে সে বিজ্ঞানের ছাত্র, না অন্য কোন বিভাগের ? যদি সে বিজ্ঞানের ছাত্র হয় তবে কোন্ সেকশনের ? এ সেকশন, না বি সেকশন ? এত সব খবর পেলে তবেই ছেলেটির একটি সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে। এক-একটি প্রাণীরও এমনিভাবে পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। তাহলেই বোঝা যাবে প্রাণীরাজ্যে তার স্থান কোথায়।

প্রাণীদের বৈজ্ঞানিক নাম

প্রত্যেক প্রাণীর একটি করে বৈজ্ঞানিক নাম আছে। এই নামের দুটি করে অংশ। নামের প্রথম অংশটি হচ্ছে গণ (Genus)-এর নাম ; আর পরেরটি হচ্ছে প্রজাতির (Species)-এর নাম। এমনিভাবে নামকরণকে বলা হয় দ্বিনাম-করণ পদ্ধতি। সুইডেনের বৈজ্ঞানিক লিনিয়াস (Casolus Linnaeus) এই পদ্ধতির জনক। মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo Sapiens)। নামের প্রথম অংশটি তাহলে হচ্ছে গণ, আর পরেরটি প্রজাতি। পৃথিবীর যেখানে যত মানুষ আছে সবারই ওই এক বৈজ্ঞানিক নাম। ভারতের লোকদের একরকম দেখতে। ইয়োরোপের লোক দেখতে আর একরকম। আবার জাপানের এবং আফ্রিকার মানুষ কতই না আলাদা দেখতে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক নাম সকলেরই এক। কারণ মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো সব দেশের মানুষের একই রকমের। তেমনি বাঘ বা সিংহের নামও দুটি নাম দিয়ে। বাঘ হচ্ছে প্যান্থেরা টাইগ্রিস (Panthera tigris), সিংহ

প্যান্‌থেরা লিও (Panthera leo)। কুনো ব্যাঙের নাম বিউফো মেলানোস্‌টিকটাস (Bufo melanostictus)।

প্রাণীরাজ্যে মানুষ আর কুকুরের কোথায় কার স্থান তা দেখা যাক। এ থেকে বোঝা যাবে যে এরা উভয়েই স্তন্যপায়ী হয়েও তাদের মধ্যে তফাত কোনখান থেকে শুরু হয়েছে। কুকুরের বংশ-তালিকা এ-রকম :—

Kingdom বা রাজ্য—প্রাণীরাজ্য (Animalia)
Phylum বা পর্ব—কর্ডাটা (Chordata)
Class বা শ্রেণী—স্তন্যপায়ী (Mammalia)
Order বা বর্গ—কারনিভোরা (Carnivora)
Family বা গোত্র—ক্যানিডি (Canidae)
Genus বা গণ—ক্যানিস (Canis)
Spcies বা প্রজাতি—ফ্যামিলিয়ারিস (Familiaris)

শেষের দুটি অর্থাৎ গণ ও প্রজাতির নাম দিয়েই কুকুরের নাম। তেমনি মানুষেরও। রাজ্য, পর্ব আর শ্রেণী সবই আগের মত। অর্থাৎ মানুষ প্রাণীরাজ্যে কর্ডাটা পর্বের স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু বর্গ, গোত্র ইত্যাদি সব আলাদা। প্রাণীরাজ্যে মানুষের পরিচয় এরূপ :—

Order বা বর্গ—প্রাইমেট (Primate)
Family বা গোত্র—হোমিনিডিয়া (Hominidea)
Genus বা গণ—হোমো (Homo)
Species বা প্রজাতি—স্যাপিয়েন্স (Sapiens)

বৈচিত্র্যময় এই প্রাণীজগতের নানা প্রাণীদের কথা, তাদের দল উপদলের কথা, প্রাণীরাজ্যে মানুষের স্থান কোথায়, তা মোটামুটি জানা গেল। মাটি, জল, আকাশের তলায় যে দিকেই তাকাই—দেখতে পাওয়া যাবে অসংখ্য প্রাণী। বিচিত্র তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি—নানা রঙে, নানা বর্ণে, নানা রূপে তারা এই পৃথিবীর আসর জমিয়ে আছে।

প্রাণী-দেহের মালমশলা

প্রাণীজগতের অসংখ্য প্রাণীর বিষয়ে কিছু-কিছু জানা গেল। একটি অতি-ক্ষুদ্র প্রাণী যা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয় সেই ছোট প্রাণী থেকে বৃহত্তম প্রাণী তিমি—এদের পরিচয়ও কিছু-কিছু পাওয়া গেল। এখন জানতে হবে কি-কি মালমশলা দিয়ে তৈরি হয়েছে নানা প্রাণীর দেহ।

ঘরবাড়ি তৈরি করতে গেলে মালমশলা লাগে। ইটের পর ইট সাজিয়ে সিমেণ্ট, চুন দিয়ে গাঁথনি গেঁথে তৈরি হয় বিরাট বিরাট অট্টালিকা। কাঠ, লোহাও কম লাগে না ঘর বাড়ি তৈরি করতে। ঘরবাড়ি তো নানা-রকমেরই হয়ে থাকে। রাজভবন দেখ একরকম, মিউজিয়াম আর-একরকম। কালীঘাটের কালীমন্দিরের রূপ অন্য রকমের। স্কুল, কলেজের বাড়ি, পরেশনাথের মন্দির সবই রকম-রকম। আবার তোমার বাড়ি আর তোমার বন্ধুর বাড়ির সঙ্গেও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। সবগুলোই বাড়ি, কিন্তু তাদের মধ্যে কত না রকমফের। কিন্তু মিল একটা তাদের মধ্যে আছে। সে মিল হচ্ছে তাদের মালমশলার মিল। সব অট্টালিকা, ছোট বড় বাড়ি, সবই ইট দিয়েই তৈরি হয়েছে। আর ইট তৈরি হয়েছে মাটি আর জল দিয়ে, তারপর তা আগুনে পুড়িয়ে। তেমনি প্রাণীদের দেহেরও আছে নানান রকমফের। আকৃতি, মাপ প্রভৃতি দেখলে মনে হবে যেন আসমান-জমিন ফারাক, কিন্তু সবারই দেহ তৈরি হয়েছে কোষ বা সেল (Cell) দিয়ে। আর এই সেলের ভিতর থাকে অর্ধ-স্বচ্ছ এবং আঠাল জেলির মত প্রাণ-পদার্থ, যার নাম প্রোটো-প্লাজম। জীব দেহের মূল ভিত্তি বলা যায় একে। প্রোটোপ্লাজম ছাড়া জীবের কোন অস্তিত্ব থাকে না।

প্রাণীদেহ কী দিয়ে তৈরি

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তোমার, আমার, গরু, বাঘ, তিমি সকলেরই দেহ তৈরি হয়েছে সেল বা কোষ দিয়ে। কোষকে জীবদেহ গঠনের একক বলা হয়। শুধু দেহ গঠনের এককই নয়, এরা জীবের নানা প্রয়োজনীয় কার্যের জন্যেও দায়ী। তাই কোষকে শুধু দেহ তৈরির একক (Unit of structure of all living things) না বলে একে সমস্ত কর্ম-কাণ্ডেরও একক বলব (Unit of function of all living things)। সেলের আকার নানারকম, কাজও তাদের নানা রকম। কোষগুলো দেখতে সাধারণত খুবই ছোট। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এদের দেখতে হয়। কিন্তু কোন-কোন কোষ আকারে বড়ও হয়। একটি উটপাখির ডিম এক কোষে তৈরি। কিন্তু তার আকার প্রায় চার ইঞ্চির মত লম্বা। আবার একটি রক্ত-কণিকা হচ্ছে খুবই ছোট। রক্ত-কণিকাও কোষ বা সেল।

প্রোটোপ্লাজমেই প্রাণের প্রথম প্রকাশ, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া প্রথম প্রাণীদেহ একটি কোষেই তৈরি হয়েছে। তারপর বহুকোষী প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। এই বহুকোষীদের দেহের আকার নির্ভর করে কার কতগুলো সেল দিয়ে দেহ তৈরি তার উপর। অ্যামিবার দেহ খুবই ছোট। এদের দেহ একটি কোষে তৈরি। অনেকে আবার একে অ-কোষী বলেছেন। এ জগতে ছোট বড় যত প্রাণী আছে তাদের সবারই দেহ অসংখ্য সেলের সমষ্টি। একটি পূর্ণ মানুষের দেহ কোটি কোটি সেল দিয়ে তৈরি হয়। একের পরে পনেরোটা শূন্য দিলে যত বড় সংখ্যা পাওয়া যায় ততগুলি কোষ আছে মানুষের দেহে।

একটি প্রাণীকোষ কেমন, কী আছে এতে? উদ্ভিদকোষ কেমন, কী কী আছে তাতে তা আগেই জেনেছ। মোটামুটি প্রায় একই জিনিস প্রাণীর কোষেও আছে। তবে যে সব জায়গায় পার্থক্য আছে তা জেনে রাখা ভাল। প্রথমেই দেখা যায় যে, প্রাণীর দেহ-

কোষে প্রাচীর (Cell wall) নেই। আছে শুধু একটি পাতলা আবরণী যাকে বলে প্লাজমা মেমব্রেন বা প্লাজমালেমা (Plasmalemma)। এই পাতলা আবরণীর ভিতরেই থাকে প্রোটোপ্ল্যাজম। প্রোটোপ্ল্যাজমের ভিতর আছে অপেক্ষাকৃত ঘন ও গোলাকার বা ডিমের মত একটি অংশ, নাম নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস বাদে যা রইল তার নাম সাইটোপ্ল্যাজম। নিউক্লিয়াস আর সাইটোপ্ল্যাজমের সমষ্টিই হল প্রোটোপ্ল্যাজম। নিউক্লিয়াসের একধারে সাইটোপ্ল্যাজমের ভিতরে সেন্ট্রোসোম (Centrosome) বলে একটা ছোট গোল জিনিস থাকে। সেন্ট্রোসোমের মধ্যে একটি বা দুটি ছোট গোল পদার্থ থাকে। তাকে বলে সেন্ট্রিওল (Centriole)। কোষ বিভাজনের সময় এর কাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ। কোষ বিভাজনের প্রাথমিক অবস্থায় সেন্ট্রোসোমের চারদিকে তারকা-রশ্মির মত প্রোটোপ্ল্যাজমে তৈরি কতগুলো খুব ছোট-ছোট বস্তু দেখা যায়। এদের বলে অ্যাস্টার। প্রাণীকোষে উদ্ভিদকোষের মত বড় বড় গহ্বর (Vacuole) থাকে না। যদি গহ্বর থাকেও তবে তা আকারে খুব ছোট ও সংখ্যায় কম। প্রাণীকোষের মোটামুটি এইগুলোই বিশেষত্ব। তাছাড়া প্রাণীকোষের অন্য সব প্রায় উদ্ভিদ-কোষের মতই বলা যায়।

সেল বা কোষই হল দেহের মূল বস্তু

প্রত্যেক জীবের আরম্ভ একটি কোষ থেকে। একটি কোষ ভাগ হয়ে হয় দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট। এমনি করে ভাগ হতে হতে বহু কোষের সৃষ্টি হয়। নানারকম কোষের সৃষ্টির ফলে প্রাণীদেহে নানান অঙ্গের সৃষ্টি হয়। একই রকম কোষ থেকে তৈরি একই আকার আর একই কাজ করে এমন অনেকগুলি কোষ একত্রে সৃষ্টি করে কলা বা টিস্যু (Tissue)। একই রকম টিস্যু আবার তৈরি করে এক-একটি যন্ত্র (Organs)। তেমনি আবার

কতগুলো যন্ত্র মিলে একটি তন্ত্র (System) গড়ে ওঠে। এক একটি তন্ত্রের এক-একটি কাজ। এমনি নানা তন্ত্রের নানা রকম কাজ দিয়ে প্রাণীর স্বাভাবিক জীবন চলতে থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে, কোষই হল সবের মূল।

উঁচু স্তরের প্রাণীদের দেহে নানা রকমের টিস্যু বা কলা দেখা যায়। প্রথমেই আচ্ছাদক বা আবরণী কলার (Epithelial tissue) কথা ধরা যাক। এই আচ্ছাদক কলা প্রাণীদেহের বাইরে বা ভিতরে থাকে। এরা পরস্পর ঘনসন্নিবিষ্ট। দেহের চামড়ার উপরে, খাদ্য-নালীর ভিতরে এবং অন্যান্য জায়গায় এদের অবস্থান। এ-জাতের কোষের আকৃতি হয় নানা রকমের। কখনো এরা একটি স্তরে, কখনো বহু স্তরে সাজানো থাকে। এদের কাজও নানা রকমের। এরা কেউ বাইরের আঘাত থেকে প্রাণীদেহকে রক্ষা করে। কেউ গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির অনুভূতি স্নায়ুতন্ত্রে পাঠিয়ে দেয়। চোখ, কান, নাক প্রভৃতিতে এইজাতীয় টিস্যু দেখতে পাওয়া যায়। আবার কেউ দেহ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে। লালাগ্রন্থি, লিভার প্রভৃতিতে তাই এদের দেখতে পাওয়া যায়।

যোজক কলা (Connective tissue) বলে এক রকমের কলা আছে, যারা দেহের ভার বহন করে। তাছাড়া এক অঙ্গকে অন্য অঙ্গের সঙ্গে জুড়ে রাখে এই টিস্যু। আবার একই অঙ্গের ভিন্ন-ভিন্ন অংশকেও যুক্ত করে এরা। এই যোজক কলার কোষগুলো সংখ্যায় খুবই কম। দেহের চামড়ার তলায় এক ধরনের যোজক কলা থাকে যারা অবিচ্ছিন্নভাবে স্তর গঠন করে। বুকের উপর, ঘাড় প্রভৃতিতে এই জাতের টিস্যু থাকে বর্তমান। রক্তও একরকম তরল যোজক কলা। রক্ত দেহের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়। একফোঁটা রক্ত অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে তাতে দেখা যাবে, অনেক ছোট ছোট রক্ত-কণিকা ভেসে বেড়াচ্ছে হলদেটে রঙের রক্তরসে। এই রক্তরসকে বলা হয় প্লাজমা। আর

কণিকাগুলো হচ্ছে লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা আর থ্রম্বোসাইট বলে আর একরকম কোষ।

প্রাণীদেহের হাড়গোড়

এক ধরনের কঠিন যোজক কলাই হাড়গোড় তৈরি করে। ঠাকুর গড়তে হলে যেমন কাঠামো লাগে, বাড়িঘর তৈরি করতে যেমন কাঠামোর প্রয়োজন হয়, তেমনি এই হাড়গোড়গুলোও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের কাঠামো। দেহের যত চাপ ও ভার এই কাঠামোর উপর পড়ে। এই যোজক কলার নাম অস্থি (Bone)। ক্যালসিয়াম ফসফেট নামক রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি এ সব। তরুণাস্থি (Cartilage) হল আর এক রকম যোজক কলা। এগুলো শক্ত হলেও হাড়ের মত কঠিন নয়, এদের সহজেই বাঁকানো যায়। মানুষের বাইরের কানে এই রকম যোজক কলা দেখা যায়। অস্থি-সংযোগস্থল, শ্বাস-নালী প্রভৃতি স্থানেও এদের দেখা যাবে।

আরও এক রকম যোজক কলা আছে যাদের সাহায্যে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়। এদের সাহায্যেই আবার দেহকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। এদের বলা হয় পেশী কলা বা মাস্‌ল্ টিস্যু (Muscle tissue)। কতগুলো পেশী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁকায়, কেউ সোজা করে। পেশী কলার মধ্যে কতগুলো পেশী নিজের ইচ্ছেমত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। সাধারণত এরা হাড়ের সঙ্গে জুড়ে থাকে বলে হাড়গোড়গুলোকে নাড়াতে চাড়াতে পারে। আবার কতগুলো পেশী আছে যারা ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশে এদের দেখা যায়। চোখ, হৃদয় প্রভৃতির পেশী নিজেরাই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন আমাদের অগোচরে চলে। পেশীদের চেহারা অনেক রকম। কেউ স্ট্রাইপ্‌ট্

বা চিহ্নিত, কেউ আনস্ট্রাইপ্‌ট্‌ বা অচিহ্নিত (Striped and unstriped muscle)।

স্নায়ু কলা বা নার্ভ টিস্যু (Nerve tissue) বলে আর এক রকম টিস্যু আছে যারা বাইরের আঘাত উত্তেজনায় সাড়া দেয়, তারপর এই উত্তেজনাকে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিচালিত করে দেয়। গরমের সময় গরম, শীতের সময় শীত আমরা অনুভব করি স্নায়ু কলার সাহায্যে। দেহের মধ্যে কোথায় কি হয় না হয় তার সঙ্কেত বহন করে এরা। দেখা, শোনা প্রভৃতি এদেরই সাহায্যে কার্যকরী হয়। স্নায়ু কলা, স্নায়ু কোষ ও স্নায়ু তন্তু বা স্নায়ু রজ্জু দিয়ে তৈরি। স্নায়ু কোষগুলো অনেকটা মাকড়সার জালের মত দেখতে। স্নায়ু রজ্জু একত্রে স্নায়ু বা নার্ভ তৈরি করে। স্নায়ু বা নার্ভ দু-ধরনের হয়। একদল চোখ, কান প্রভৃতি অঙ্গ থেকে উদ্দীপনার খবর নিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। আর একদল মস্তিষ্ক থেকে বাইরের দিকে খবর নিয়ে যায়। তার মানে হল, এক ধরনের নার্ভ সংবেদক (Sensory nerve), বা অন্তর্মুখী অর্থাৎ বাইরে থেকে সংবাদ নিয়ে কেন্দ্রের দিকে যায়। আর এক ধরনের হল মোটর নার্ভ (Motor nerve)। এরা বহির্মুখী অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে খবর বা আজ্ঞা নিয়ে বাইরে পাঠায়।

যদিও পেশী কলা চলা ফেরা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু এদের পরিচালিত করে স্নায়ু বা নার্ভ।

এ ছাড়া আছে জনন কলা বা রিপ্রোডাকটিভ (Reproductive tissue) টিস্যু। জননকোষ একত্রে তৈরি করে জনন কলা। এদের কাজ প্রাণীদের বংশবিস্তার। অবশ্য একটি মাত্র কোষ অনেক ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়েও প্রাণীর বংশবিস্তারে সাহায্য করে। কিন্তু উঁচু স্তরের প্রাণীদের বেলায় এই জনন কলাই বংশবিস্তারের কাজ করে থাকে।

৫

প্রাণীদেহের কাণ্ডকারখানা

মানুষের দেহ যেন একটি যন্ত্র। এই দেহকে একটি কারখানাই বলা চলে। কারখানাতে রয়েছে নানা বিভাগ। কোথাও এক রকমের যন্ত্র চলেছে, কোথাও বা অন্য রকমের। নানা বিভাগের কাজ নানা রকম। কিন্তু সব বিভাগের মিলিত কাজেই তো কারখানা চলে। অনেক সময় কোন বিভাগের কাজ ভালভাবে না চললে, কোন যন্ত্র অচল হলে, কারখানায় নানা অসুবিধে দেখা যায়। প্রাণীদেহের কারখানায়ও কত রকম কাণ্ড যে চলছে তা শুনলে অবাক হতে হয়। কোন কারখানার মত দেহ-কারখানায়ও কোন কিছুর ব্যাঘাত হলে, কোন যন্ত্র ভালভাবে কাজ না করলে, নানা গণ্ডগোল হতে পারে। এবারে দেখা যাক সাধারণভাবে কী কী কাজ হয় দেহযন্ত্রে বা দেহ-কারখানায়।

কোন্ অঙ্গের কী কাজ

আগেই বলেছি, এককোষী প্রাণীদের দেহে পুরো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না থাকলেও এদের একটি কোষই সব কাজ করছে। ওই একটি কোষেই চলাফেরা, আহার গ্রহণ, দেহ থেকে আবর্জনা ত্যাগ, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি সব কাজই হয়ে থাকে। উঁচুশ্রেণীর প্রাণীদের এসব কাজের জন্যে নানা যন্ত্র, নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। বহুকোষী প্রাণীদের দেহের ভিতরকার অসংখ্য সেল তাদের নিজেদের স্বাধীন সত্তা বিলিয়ে দিয়ে একটা প্রাণীর মঙ্গলের জন্যে, তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে যায়। যেখানে যেমন দরকার সেইমত তারা নিজেদের তৈরি করে নিয়েই কাজ করে যায়। তাদের কাজ আলাদা বলে আকারেও রয়েছে রকমফের। নড়া চড়া, চলা ফেরা জীবেরই ধর্ম। অতি ক্ষুদ্র প্রাণী যে অ্যামিবা, তারও নড়া চড়া চলা ফেরার ব্যবস্থা আছে। খাবার জিনিস পেলে তাকেও ক্ষণপদ বার করে এগিয়ে খাবার

ধরতে হয়। আবার বিপদের সন্ধান পেলে সে সব গুটিয়ে নিয়ে পেছিয়ে আসতে হয়। কিন্তু উচ্চস্তরের প্রাণীদের ব্যবস্থা আলাদা। যে সব প্রাণী জলে বাস করে তাদের চলা ফেরার জন্যে রয়েছে নানা অঙ্গ। কারো আছে পাখনা, কারো বা লেজ। সহজে সাঁতার কাটার জন্যে দেহও তাদের তৈরি হয়েছে তেমনি ভাবে। পাখিদের উড়তে হয়, তাই তাদের ডানা সে কাজে সাহায্য করে। জোরে জোরে চলার মত উপযুক্ত পা রয়েছে ঘোড়া, হরিণ প্রভৃতির। মানুষ দু-পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দৌড়োতে পারে। বলতে গেলে হাড় আর মাংস এইসব চলাফেরার কাজ করে দেয়। মাংসের সঙ্কোচন আর প্রসারণের ফলে হাড়গোড় তাদের অবস্থান আর ভঙ্গির পরিবর্তন করে। চলাফেরা, বসা, দাঁড়ানো, আঙুল নাড়ানো প্রভৃতি সবই হাড় মাংসের কাজ। হাড় আর পেশী ছাড়া গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। যেখানে অবশ্য হাড় নেই সেখানে পেশী দিয়ে প্রয়োজন-মত কাজ চলে। মেরুদণ্ডী প্রাণী ছাড়াও অপর প্রাণীদেরও নড়াচড়া, চলাফেরা করতে হয়। তাদেরও এ কাজের সব রকম ব্যবস্থা আছে। প্রজাপতি ডানার সাহায্যে উড়তে পারে পাখির মত, যদিও পাখির ডানা আর প্রজাপতি ও অন্য পতঙ্গদের ডানার মধ্যে প্রভেদ আছে। কিন্তু কাজ প্রায় একই। হাইড্রা চলে অনেকটা হামাগুড়ি দিয়ে (Looping movement), কখনো বা ডিগবাজি দিয়ে (Somer-saulting)। চিংড়ি মাছ দরকার হলে পাঁচ জোড়া পা দিয়ে হাঁটে। উপরি হিসেবে এদের আছে ছ-জোড়া উপাঙ্গ (Pleopod) যার সাহায্যে এরা সাঁতার কাটতে পারে। জোঁকের চলাও হামাগুড়ি দিয়ে। শামুক চলে মাংসপেশীর সঙ্কোচন এবং প্রসারণ করে। এমনি কতরকম প্রক্রিয়া রয়েছে চলা-ফেরা নড়া-চড়া করার। নানা ধরনের প্রাণীর নানা ধরনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এ-কাজে সহায়তা করে।

খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য পরিপাক, দেহের পুষ্টি—এই কাজগুলো অতি প্রয়োজন প্রাণীদের জীবন ধারণ করবার জন্যে। খাদ্য গ্রহণ, তাকে

হজম করা আর পরিশেষে তাকে দেহের প্রধান বস্তু অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজমে পরিণত করা একটা খুবই দরকারের কাজ। খাবার নিয়ে কেউ গবেষণাগারে তা থেকে প্রোটোপ্লাজম তৈরি করেছেন বলে আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। অথচ একটি প্রাণী দেহে বা প্রাণী কোষে এ কাজটি কত অনায়াসেই না হচ্ছে!

পরিপাক কাজের জন্যেও রয়েছে নানারকম ব্যবস্থা। অ্যামিবা তাদের কোষ দিয়েই ওই কাজ করে। একটি নল দিয়ে গঠিত যে সব প্রাণীর দেহ তাদের দেহের মধ্যে একটি মাত্র গহ্বর থাকে। মুখ দিয়ে খাবার গিয়ে সেখানেই পরিপাকের কাজ হয়। তারপর অজীর্ণ খাদ্যদ্রব্য মুখের ভিতর দিয়েই আবার বাইরে পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য কিছু কিছু কোষও পরিপাক কার্যে সাহায্য করে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের, বিশেষ করে মেরুদণ্ডী প্রাণী ও মানুষের পরিপাক-যন্ত্র অবশ্য সাদামাটা নয়। একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর পৌষ্টিক নালীর প্রথম অংশ হল মুখ, আর শেষ হচ্ছে মলদ্বারের ছিদ্র। মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করবার পর থেকে মলদ্বার থেকে মলরূপে ত্যাগ করা পর্যন্ত যে-সব জায়গা বা যন্ত্র দিয়ে খাবার যায় তারা সবাই মিলে তৈরি করেছে পরিপাক যন্ত্র বা পৌষ্টিক তন্ত্র। মুখের পরে যে সব অঙ্গ এ কাজে সাহায্য করে তা হচ্ছে মুখবিবর (Buccal cavity), গলবিল (Pharynx), গ্রাসনালী (Oesophagus), পাকস্থলী (Stomach), ক্ষুদ্র অন্ত্র (Small intestine), বৃহৎ অন্ত্র (Large intestine), আর শেষে মলভাণ্ড (Rectum) ও মলদ্বার। সব প্রাণীরই যে একেবারে একই রকম পৌষ্টিক নালী থাকবে তা নয়। কিছু-কিছু প্রভেদও আছে। এই নালীর কোথাও সরু, কোথাও মোটা, কোথাও সোজা, কোথাও আঁকা-বাঁকা, পাক খাওয়া গোছের। আর আছে পরিপাক গ্রন্থি (Digestive glands), লালা গ্রন্থি, যকৃৎ বা লিভার, অগ্ন্যাশয় বা প্যাংক্রিয়াস।

মুখে খাবার নেবার পর দাঁত তা ভালভাবে পিষে দেয়। তারপর

তা এক-এক করে সব ক-টি যন্ত্রের ভিতর দিয়ে চলতে থাকে। বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কাজ চলে। ঘটে নানারকম রাসায়নিক পরিবর্তন। খাদ্যের সারাংশ দেহগঠন ও শক্তিদানের কাজে লেগে যায়। আবর্জনার অংশ যায় বেরিয়ে।

প্রাণীদেহের আর একটি কাজ হচ্ছে দেহ থেকে আবর্জনা বা দূষিত পদার্থ ত্যাগ। অ্যামিবার দেহের মধ্যে নানা বিপাকীয় কার্য চলে। আর তার ফলে উৎপন্ন হয় কিছু-কিছু পদার্থ যা দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। তাই তা বের করে দিতে হয় দেহ থেকে। কনট্রাক্টাইল ভ্যাকুওল এই কাজটি সম্পূর্ণ করে বলে জানা যায়। উচ্চস্তরের বহুকোষী প্রাণীদের দেহ থেকেও এমনি ধরনের নানা অপ্রয়োজনীয় জিনিস বেরিয়ে যায়। কারণ এ-সব দেহের উপকার না করে বরং অপকারই করে। দেহের কয়েকটি অঙ্গ এই কাজে সাহায্য করে। অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলির মধ্যে আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া আর জল। যে জল খাদ্য হিসেবে আমরা গ্রহণ করি তার সবটাই কাজে লাগে না। তাই বাড়তি জলটাও বেরিয়ে যায় দেহ থেকে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে যায় শ্বাস প্রশ্বাসের সময়। নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ ইউরিয়া আর অতিরিক্ত জল বার করে দেওয়া হয় রেচন-তন্ত্র বা একস্ক্রিটরি অর্গ্যানের (Excretory organs) সাহায্যে। অবশ্য কিছুটা জল ঘাম হয়েও বেরিয়ে যায়। বহু প্রাণীর দেহের শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমেও জলের কিছুটা বেরিয়ে যায় দেহ থেকে। প্রাণীদেহের রেচন-যন্ত্র এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন না করলে গণ্ডগোল বাধতে পারে। এ যন্ত্রগুলিও যে সব প্রাণীরই একই রকম হবে তা অবশ্য নয়। চিংড়ির রেচন-যন্ত্র এক রকম, আবার কেঁচোর আর এক রকম। ব্যাঙ প্রভৃতির আবার অন্য ধরনের। মানুষের রেচন যন্ত্র আবার অন্যদের থেকে আলাদা। মলমূত্র ত্যাগ আসলে দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিস বের করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রাণীদেহে শ্বাসকার্য

প্রাণীদেহে শ্বাসকার্য একটি প্রধান কাজ। জীবন ধারণের জন্যে শ্বাসকার্য অপরিহার্য বলা চলে। শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হলে প্রাণীদেহের প্রাণপ্রবাহও বন্ধ হয়ে যাবে। শ্বাসকার্য বলতে মোটামুটি বোঝা যায় যে, বাইরে থেকে অক্সিজেন টেনে দেহের মধ্যে নেওয়া, তারপর সেখানে নানা ধরনের প্রক্রিয়ার পর দূষিত গ্যাস অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দেওয়া। স্থলে বাস করে যে-সব প্রাণী তারা অক্সিজেন টেনে নেয় বায়ু থেকে। জলচর প্রাণীরা তাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় জল থেকেই। যে সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন জলে গুলে থাকে জলচর প্রাণীদের সেটুকুই সম্বল। প্রাণীদেহে অক্সিজেন প্রবেশ করে কোষের প্রোটোপ্লাজমের সঙ্গে এক দহনকার্য ঘটায়। ফলে শক্তির সঞ্চার হয়, আর তৈরি হয় অপ্রয়োজনীয় গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইড। কার্বন ডাই-অক্সাইড যায় বাইরে বেরিয়ে। যে শক্তির সৃষ্টি হয়েছে দেহমধ্যে তা দিয়েই প্রাণীরা সবরকম কাজকর্ম করতে সক্ষম হয়।

বেঁচে থাকতে হলে শ্বাসকার্য যখন অবশ্য কর্তব্য কাজ তখন সকল প্রাণীকেই শ্বাসকার্য চালাতে হবেই। তাই প্রাণীদেহে রয়েছে শ্বাসকার্য চালাবার মত যন্ত্রপাতি। অবশ্য সবরকম প্রাণীর শ্বাসযন্ত্র একই রকম যে নয় তা না বললেও তোমরা বুঝতে পার। যে প্রাণী যেমন আকারের তার শ্বাসযন্ত্রও তেমনিভাবেই তৈরি করে দিয়েছে প্রকৃতি। অতি ক্ষুদ্র প্রাণী অ্যামিবার কথাই ধর না। এতটুকু দেহ হলে কী হবে, ওদেরও শ্বাসকার্য চালাতে হয় নিশ্চয়ই। জলের ভিতরে যে সামান্য পরিমাণে অক্সিজেন গুলে থাকে তাই তারা শোষণ করে নেয় তাদের দেহের ভিতরে। কাজ হয়ে গেলে দেহে তৈরি কার্বন ডাই-অক্সাইড তাদের দেহের আবরণের ভিতর দিয়েই বাইরে বেরিয়ে যায় অনায়াসে। হাইড্রার শ্বাসকার্যও বেশ সাদা-সিদে ধরনের। এদের দেহের কোষস্তরগুলি এ কাজটা করে থাকে।

কেঁচোর শ্বাসকার্য চলে তাদের দেহের চামড়ার মাধ্যমেই। নিম্নস্তরের প্রাণীদের বেলা এমনি ধরনের ব্যবস্থা থাকলেও উচ্চ-শ্রেণীর প্রাণীদের বেলা ব্যবস্থা কিন্তু একেবারেই আলাদা। চিংড়ির দেহে থাকে গিল (Gill) বা ফুলকো। ফুলকোর সাহায্যেই এদের শ্বাসকার্য চলে। যে-সব মাছের ফুলকো আছে তাদের ক্ষেত্রেও ফুলকোই ও কাজটি করে থাকে। ব্যাঙাচিও শ্বাসকার্য চালায় ফুলকোর সাহায্যে। কিন্তু যখন সে একটি পুরোপুরি ব্যাঙে পরিণত হয় তখন এ কাজটি চলে ফুসফুসের সাহায্যে। অবশ্য ব্যাঙের গায়ের চামড়াও এ কাজে সাহায্য করে থাকে। মানুষ বা অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের শ্বাস-ক্রিয়া চলে ফুসফুসের সাহায্যে। মানুষের দেহের নাক, গলার ভিতরকার গহ্বর, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী, তারপর তা থেকে তুটি শাখা বা ব্রংকাস এবং সবশেষে তুটি ফুসফুস —এ নিয়েই মনুষ্যদেহের শ্বাসতন্ত্র গঠিত।

প্রাণীদেহে রক্ত-সঞ্চালন

রক্ত-সঞ্চালন বা রক্ত-সংবহন দেহের আর একটি কাজ। অবশ্য সব প্রাণীরই দেহে যে এই কাজ চলে তা নয়। অ্যামিবা, হাইড্রা, স্পঞ্জ প্রভৃতি প্রাণীর রক্ত-সংবহন তন্ত্র নেই। আবার কেঁচো, চিংড়ি, শামুক প্রভৃতির রক্ত-সংবহন তন্ত্র থাকে। সে-সব বিবরণ না দিয়ে এখানে শুধু মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের রক্তপ্রবাহের কথা কিছু বলছি। কিসের জন্যে রক্ত আর কিজন্যে দেহের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন? কী এর প্রয়োজন? রক্ত দেহের সব জায়গাতেই প্রবাহিত হয়। এই কাজে সহায়তা করে কয়েকটি বিশেষ যন্ত্র, যেমন হৃদ্‌যন্ত্র, শিরা আর ধমনী। হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্কোচন আর প্রসারণের ফলে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়। ধমনী দিয়ে সাধারণত রক্ত হৃদয় থেকে বেরিয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, আর শিরা দিয়ে ফিরে আসে সেইসব অঙ্গ থেকে আবার হৃদ্‌যন্ত্রে। রক্তপ্রবাহের ফলেই

খাদ্যের সারাংশ এবং অক্সিজেন দেহের এক অংশ থেকে আর এক অংশে যেতে পারে। পরিপাক যন্ত্রে প্রবাহকালে সেখান থেকে রক্ত খাদ্যসার গ্রহণ করে। ফুসফুসে প্রবাহকালে অক্সিজেন গ্রহণ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে রক্ত। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, রক্ত খাদ্যের সারাংশ আর অক্সিজেন নিয়ে যে কোষের সংস্পর্শে আসে তাকেই তা দিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়। সেখান থেকে বিপাকীয় কার্যের ফলে যে-সব দূষিত পদার্থ তৈরি হয় তা গ্রহণ করে রক্ত এবং রেচন-যন্ত্রের মাধ্যমে নাইট্রোজেন-ঘটিত বিপাকীয় পদার্থ দেহ থেকে বর্জনে সাহায্য করে। এছাড়া কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস—যাকে বলা হয় হর্মোন—তাও বহন করে রক্ত।

আগেই বলেছি যে, রক্ত হচ্ছে তরল যোজক কলা। রক্ত দেখতে লাল। তাই বলে রক্ত যে শুধু লাল জলের মত জিনিস তা নয়। রক্তকণিকা আর রক্তরস বা প্লাজমা নিয়েই রক্ত। রক্তরস তরল এবং খুব ফিকে হলদে রঙের। রঙ প্রায় নেই বললেই ঠিক বলা হয়। তবে রক্ত লাল দেখায় কেন? কারণ রক্তরসে থাকে অনেক লাল রক্ত-কণিকা। এরা আসলে কোষ। এতে হিমোগ্লোবিন বলে লৌহ-ঘটিত প্রোটিন পদার্থ থাকে। এই হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সঙ্গে মিলে তৈরি করে অক্সি-হিমোগ্লোবিন বলে একটি পদার্থ। যার রঙ হচ্ছে লাল। এরই জন্যে লাল দেখায় কণিকাগুলোকে। তাই রক্তের রঙ লাল। কোন-কোন প্রাণীর রক্তের এই কণিকাগুলোতে নিউক্লিয়াস থাকে। ব্যাঙের এবং মাছের রক্তের লাল কণিকায় নিউক্লিয়াস দেখা যায়। কিন্তু সাধারণত স্তন্যপায়ীদের লাল কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। রক্ত-কণিকার আকারও নানা রকমের। কারোর ডিমের মত, কারোর গোল, কারোর বা চাকতির মত। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় যে বাতাস ফুসফুসে আসে তা থেকে এরা অক্সিজেন শোষণ করে সর্বাঙ্গে সরবরাহ করে। আর

কার্বন ডাই-অক্সাইড বয়ে এনে ফুসফুসে ছেড়ে দেয়। এই কার্বন ডাই-অক্সাইডই আবার বেরিয়ে যায় নিশ্বাস ফেলার সময়।

সাদা কণিকাও কোষ। এদের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়াস। এদের দেহ অ্যামিবার মত সব সময় পরিবর্তনশীল। এদের কাজ অনেকটা সৈন্যের মত। বাইরে থেকে কোন অদৃশ্য শত্রু, যেমন, কোন ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু, রক্তে ঢুকলে আর রক্ষে নেই। এরা তখন তাদের আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। সব সময়েই যে এরা জিতবে এমন কোন কথা অবশ্য নেই। না জিতলেই আমাদের মুস্কিলে পড়তে হয়। তখন নানা রোগের পাল্লায় পড়া ছাড়া উপায় থাকে না আমাদের। এ ছাড়া এ-জাতীয় কণিকা খাদ্য সরবরাহের ভূমিকাও নেয়। তাহলে একাধারে এদের সৈন্য, দেহরক্ষী আর খাদ্য সরবরাহের ভূমিকা নিতে দেখা যায়। থ্রম্বোসাইট বলে আর এক রকম কণিকাও রক্তে থাকে। এরা অনেকটা ছোট ছোট লাটাইয়ের মত দেখতে। এদের মধ্যেও নিউক্লিয়াস থাকে। কোন জায়গা কেটে গেলে রক্ত যাতে জমাট বেঁধে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা এদের কাজ। এরা না হলে রক্ত পড়া থামবেই না।

নানা কাজের জন্যে নানা অঙ্গ

আরও নানা কাণ্ডকারখানা আছে দেহযন্ত্রের মধ্যে। দেখা, শোনা, স্পর্শবোধ, গন্ধ, আস্বাদ, অনুভব প্রভৃতি কত কাজ করে বিভিন্ন অঙ্গ। দেখার জন্যে আছে চোখ। পতঙ্গ, চিংড়ি প্রভৃতির চোখ আমাদের থেকে আলাদা। এদের বলা হয় পুঞ্জাক্ষি। অনেকগুলো চোখ মিলেই তৈরি হয়েছে এদের চোখ। এই এক-একটি চোখকে বলে ওমাটিডিয়াম। কয়েকটি অংশ নিয়ে এটা তৈরি। প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের প্রতিফলন একসঙ্গে ঘটে, অর্থাৎ সব ওমাটিডিয়ার প্রতিবিম্ব একত্রে মিলে একটি সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। তবেই না কোন বস্তু এরা দেখতে পায়। এ ধরনের

প্রতিবিম্ব দিনের বেলায় তৈরি হয় বলেই আলোতে এরা ভাল দেখতে পারে। এই ধরনের প্রতিবিম্বের নাম অ্যাপোজিসন প্রতিবিম্ব (Apposition image)। কিন্তু রাত্রে বা অন্ধকারে এরা ভাল না দেখে ঝাপসা দেখে কোন বস্তু। কারণ একটি ওমাটিডিয়ামের প্রতিবিম্ব অন্য একটির উপর পড়ে তা আবছা বা ঝাপসা করে দেয়। এমনি প্রতিবিম্বকে বলে সুপার ইম্পোজিশন প্রতিবিম্ব (Superimposition)।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চোখ অর্থাৎ মানুষ বা এই ধরনের অন্য জীবের চোখ আলাদা ধরনের। এ চোখকে বলা হয় সরল চোখ বা সরলাক্ষি। আমাদের চোখ যেন ক্যামেরা। ক্যামেরার যেমন সামনে লেন্স আর পিছনে পর্দা বা ফিল্‌ম্ থাকে, আমাদের চোখও অনেকটা সে রকমের। ক্যামেরার ফিল্‌মে একবারই ছবি ওঠে। কিন্তু আমাদের চোখে বারবার প্রতিবিম্ব পড়ে, ক্যামেরার মত ফিল্‌ম্ বদল করতে হয় না। চোখের পর্দায় একবার ছবি উঠে পরমুহূর্তেই তা মুছে যাচ্ছে; তারপর আবার নতুন ছবি। ক্যামেরা একটা চৌকো বাক্সর মত, কিন্তু চোখ প্রায় গোলাকার। চোখের সামনে যা কিছু আসে তা থেকে আলোকরশ্মি চোখের লেন্সের ভিতর দিয়ে রেটিনা বা পর্দার উপর পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি উল্টো প্রতিচ্ছবি গড়ে উঠে। এর অনুভূতি অপ্‌টিক নার্ভ বা চক্ষুস্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছোয়। এর ফলেই আমরা দেখি। অপ্‌টিক নার্ভ চক্ষুগোলকের যেখান দিয়ে প্রবেশ করে সে জায়গায় কোন প্রতিবিম্ব তৈরি হয় না। প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এর ঠিক দু-পাশে। চোখ যদি খোলা থাকে—তুমি শুধু দেখবে আর দেখবে। অবশ্য দেখার কাজটা দেহযন্ত্রের একটি বিশেষ এবং অতি প্রয়োজনীয় কাজ।

এবার শোনা। এখানে শুধু স্তন্যপায়ীদের কানের কথা বলব। কানের তিনটি অংশ। বাইরের অংশ, মানে কানমলা দেওয়া হয়

যেটা টেনে সেটাকে কান বলা হয়। কিন্তু ওটা একটা অংশ মাত্র। আর তা বাইরের অংশই। কুকুর, বেড়াল, গরু প্রভৃতি প্রাণীরা তাদের কান ইচ্ছেমত নাড়াতে পারে। কিন্তু মানুষ পারে না। কারণ মানুষের কানের সঙ্গে কোন মাংসপেশী নেই যা কান নাড়াতে সাহায্য করতে পারে। এই বাইরের অংশটা শব্দকে ভিতরে ঢোকাবার কাজ করে থাকে। এটা যেন শব্দ ধরবার একটা ফানেল। কোন-কোন প্রাণী দূরের শব্দ অনেক সময় কান খাড়া করে শোনে। এমনও দেখা যায় যে, কানের পাশে হাত দিয়ে কোন দূরের শব্দ শুনবার চেষ্টা করি আমরা।

এরপর কানের মাঝের অংশ। এখানেই থাকে কানের পর্দা যার উপর শব্দ এসে ধাক্কা দেয়। পর্দা কেঁপে ওঠে। সেই কম্পনের ঢেউ ছোট ছোট তিনটি হাড়ের ভিতর দিয়ে চলে যায় কানের ভিতরের অংশে। মাঝের কান হচ্ছে হাড়ে বদ্ধ ছোট একটা জায়গা। গলার ভিতর থেকে মাঝের কান অবধি একটা সরু নল থাকে। একে বলে ইউস্টাচিয়ান নল (Eustachean tube)। বাইরের বাতাসের চাপ পড়ে পর্দার উপর, আর মুখ দিয়ে আর একটা চাপ পড়ে মাঝের কানে। ফলে ছুটো চাপের ভারসাম্য রক্ষা হয়। তা না হলে এক-তরফা এই চাপ পড়লে পর্দা ফেটে যেত। খুব জোর শব্দ হলে অনেক সময় কান চাপা দেওয়া হয়। সেটা এই ভয়ে। ভিতরের কানকে বলা হয় ল্যাবাইরিন্থ (Labyrinth)। এটা পেঁচানো, নলাকার। নলের মধ্যে জলীয় পদার্থ থাকে। এই পদার্থ শব্দ-তরঙ্গের কম্পন মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয় কানের এই সব নলের গায়ে যে নার্ভ থাকে তার মাধ্যমে। আমরা তাই শব্দ শুনি।

স্বাদ গন্ধ অনুভবের কাজও দেহের। জিভ দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি মিষ্টি না তেতো, ঝাল, নোনতা, না টক। যে-সব জীবের জিভ নেই তাদের আস্বাদ গ্রহণের অন্য ব্যবস্থা আছে। মুখের ভিতরকার অংশ

দিয়েই তারা আস্বাদ গ্রহণ করে। অনেক প্রাণী, বিশেষ করে জলের প্রাণীরা তাদের সর্বাঙ্গ দিয়েই আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে।

নাকে আমরা গন্ধ পাই। একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ পেলেই বলি, বাঃ, কী সুন্দর! খারাপ গন্ধ পেলে নাক সিঁটকোই। কিন্তু কি-ভাবে ব্যাপারটা ঘটে শোন। নাকের ভিতর থাকে কতকগুলো ঘ্রাণ-কোষ। তারাই গন্ধ অনুভূতির জন্যে দায়ী। কুকুরের ঘ্রাণ-শক্তি আমাদের থেকে প্রখর। কুকুরের এ বিশেষ গুণটির জন্যে তাদের আমরা অনেক কাজে লাগিয়েছি। পিঁপড়ে, মৌমাছি প্রভৃতি ঘ্রাণের সাহায্যেই রাস্তা চেনে, খাবার চেনে, শত্রু চেনে, মিত্র চেনে। এদের মাথার সামনের দিকে শুঁড় বা শুঁয়ো আছে, যা দিয়ে এরা সেই কাজটি করে থাকে। ঘ্রাণ আর আস্বাদ—এ দুয়ের মাঝে একটা সম্পর্ক আছে। সুগন্ধযুক্ত খাদ্য, চা, কফি বা অন্য-গন্ধওয়ালা কোন খাবার যদি নাক বুজে খাওয়া যায় তবে ভালভাবে তার আস্বাদ পাওয়া যায় না।

প্রাণী-দেহের উপর চামড়া থাকে। আমাদের দেহও চামড়া দিয়ে মোড়া। চামড়া দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনের দ্বিতীয় যন্ত্র। তাছাড়া চামড়ার সাহায্যেই আমাদের গরম, ঠাণ্ডা, আঘাত, স্পর্শ, আনন্দ বা কষ্ট প্রভৃতি অনুভূতি লাভ ঘটে। কাঁটা ফুটলে ব্যথা পাই, গরম ছেঁকা লাগলে কষ্ট পাই। আঘাত লাগলে 'বাবা রে, মা রে' করি। কাজগুলি বিভিন্ন রকমের স্পর্শ-চেতন চামড়া দিয়েই হয়। চামড়ার কতকগুলো কোষই এসব কাণ্ডের জন্যে দায়ী। তার মানে হচ্ছে যে, কোষগুলো বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়, আর নার্ভ তা পেঁছে দেয় মগজে। তবেই না আমাদের ও-জাতীয় অনুভূতি জাগে। চামড়া বাইরের আবরণ। সবকিছুর সংস্রবেই তাকে আসতে হয়। চামড়া তাই দেহের আবরণরূপী রক্ষী। মানুষের দেহে অন্য ইন্দ্রিয় নষ্ট হলেও রক্ষা আছে, কিন্তু এই চামড়ার তিন ভাগের এক ভাগও যদি পুড়ে বা অন্য কিছুতে নষ্ট হয়ে যায় তবে তার রক্ষা পাওয়ার আশা থাকে না।

জীবজন্তুর বংশবিস্তার

বংশবিস্তার বা বংশবৃদ্ধি প্রাণীদের ধর্ম। অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ হচ্ছে বংশবিস্তার। একটি প্রাণী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যায়, কিন্তু সে রেখে যায় তার উত্তরাধিকারী, তারই অনুরূপ আর সব প্রাণী। জীব চিরদিনের জন্যে মিলিয়ে যেতে চায় না পৃথিবীর বুক থেকে। অমর হতে চায় সে। সে অমরত্ব আসে তার বংশবিস্তার-পদ্ধতির ভিতর দিয়ে। তারই শরীরের অংশ থেকে সৃষ্ট তার প্রতিরূপের মাঝেই সে যেন বেঁচে থাকে। নিম্ন শ্রেণী থেকে শুরু করে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে পর্যন্ত এই বংশবিস্তার পদ্ধতি একটি অবশ্য-কর্তব্য প্রক্রিয়া। কেউ নিজের দেহকে দু-ভাগ করে তার থেকে আরও নতুন জীবের সৃষ্টি করে। অ্যামিবা এমনিভাবেই বংশবিস্তার করে থাকে। কোন-কোন প্রাণীর দেহ-কোষ থেকে তৈরি হয় কুঁড়ি বা বাড (Bud)। আর ওই কুঁড়ি থেকে নতুন প্রাণীর হয় উৎপত্তি। হাইড্রাদের এমনিভাবে বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। অবশ্য অন্য প্রণালীতেও বংশবিস্তার হয় এদের। স্ত্রী এবং পুরুষ-দেহ থেকে আলাদা জাতের জনন-কোষের মিলনেও সৃষ্টি হয় নতুন প্রাণী। যেভাবেই হোক বংশবিস্তার বা বংশবৃদ্ধি দেহের এক মহান কাজ। এটা না হলে সৃষ্টির ধারা বা প্রাণ-প্রবাহ অব্যাহত থাকত না।

প্রাণীদেহের নার্ভতন্ত্র

প্রাণীদেহের এত যে কাজ কারবার—এ সবের মধ্যে যোগাযোগ, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের কাজ করছে নার্ভ বা স্নায়ুতন্ত্র। স্নায়ু-তন্ত্রই পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে জীবন অতিবাহিত করার জন্যে সাহায্য করে প্রাণীদের। আমরা এখানে শুধু মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নার্ভতন্ত্রের কাজের কথা কিছু-কিছু সাধারণভাবে আলোচনা করব।

নার্ভতন্ত্র বা স্নায়ুতন্ত্রে তিনটি ভাগ। প্রথম কেন্দ্রীয় স্নায়ু-তন্ত্র (Central nervous system), মস্তিষ্ক (Brain) ও সুষুম্না কাণ্ড (Spinal cord) নিয়ে তৈরি। পরেরটি হচ্ছে বাইরের বা প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system), মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে গন্ধ নেবার কেন্দ্র, চোখ, মুখমণ্ডল, শ্রবণকেন্দ্র, জিহ্বা, ফুসফুস, পাকস্থলী প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার সুষুম্না থেকেও অন্য ধরনের নার্ভ বেরিয়ে জিহ্বা, কাঁধ, বাহুর পেশী, পেট, পা প্রভৃতি অঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এই দু-জাতের নার্ভ তৈরি করেছে প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্র। আর আছে স্বয়ং-পরিচালিত নার্ভতন্ত্র। সুষুম্নাকাণ্ডের দু-পাশে প্রায় লম্বালম্বি ভাবে অবস্থান এদের।

বাইরের কোন উত্তেজনা স্পর্শেন্দ্রিয়গুলি (Sense organs) যেমন, চোখ, কান ইত্যাদি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে পাঠিয়ে দেয় প্রান্তস্থ নার্ভতন্ত্র মারফত। আবার কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র বা মস্তিষ্ক ও সুষুম্না-কাণ্ড প্রান্তস্থ নার্ভতন্ত্র মারফত খবর পাঠায়, কি করতে হবে না হবে। ভয় পেলে পালিয়ে যাওয়া, কোন খাবার দেখে বা গন্ধ পেয়ে, কোন ফুল দেখে বা গন্ধ পেয়ে কি করি বা না করি তাও নার্ভতন্ত্রের কাজ। বাইরের নার্ভতন্ত্র দিয়ে মস্তিষ্কে খবর গেল। মস্তিষ্ক তখন আদেশ করল, এটা কর, ওটা কোর না। অনেক সময় না দেখে, না জেনে পায়ে কাঁটা ফুটে গেলে বা আগুনে পা দিয়ে ছেঁকা লাগলে পা সরিয়ে নিই। এর নাম রিফ্লেক্স ক্রিয়া বা প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া। এটাও নার্ভতন্ত্রের কাজ। পায়ের প্রান্তস্থ নার্ভ খবর পাঠাল সুষুম্না কাণ্ডে। আর তার আদেশেই কাজ হল, পা সরিয়ে নেওয়া হল। মস্তিষ্কে খবর না দিয়েও কাজ হল সুষুম্নার নির্দেশে। যেমন ধর, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে ভারতের নানা কাজকর্ম হচ্ছে। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সব খবরাখবর না দিয়েও প্রদেশ সরকার কতকগুলো কাজ-কর্ম করতে পারে এবং তা করে থাকেও। এ যেন অনেকটা তেমনি। হেড অফিস

আর শাখা অফিস। শাখা অফিস এখানে সুষুম্না, আর হেড অফিস মস্তিষ্ক। অভ্যাসের ধারা পরিচালিত একরকম রিফ্লেক্স ক্রিয়া হয়ে থাকে। একে বলে কনডিশানড্ রিফ্লেক্স অবস্থা বা অভ্যাস-নির্দেশক প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া। এ-কাজটি কিন্তু মস্তিষ্কের সাহায্যেই ঘটে। অভ্যাসের বশে অনেক কিছু করা হয়, আবার অন্য রকম অভ্যাস করে নিলে পুরনো অভ্যাস বদলে দেওয়া যায়। ধর তোমার একটা পোষা কুকুর আছে। নাম ধর তার বাঘা। তাকে খাবার দেবার সময় লক্ষ্য করলে যে, খাবার দেখে তার জিভ দিয়ে জল পড়ছে। এখন তুমি তাকে খাবার দেবার আগে 'বাঘা বাঘা' বলে দু-বার ডেকে খাবার দিতে শুরু করলে। বেশ কয়েকদিন পর লক্ষ্য করলে দেখবে যে, 'বাঘা বাঘা' বলে দু-বার ডাক শুনেই তার মুখ দিয়ে জল পড়ছে খাবার না দেখেও। পরে আবার ঠিক করলে খাবার আগে খাবার পাত্র ঠুকে ঠুকে খাবারের জন্যে তাকে ডাকা হবে। কিছুদিন ওইরকম করার পর খাবার পাত্র ঠোকার শব্দ পেলেই তার জিভে জল আসবে, কিন্তু যে ধরনের পাত্র ঠুকে ডাকা হচ্ছে তা না করে অন্য রকম শব্দ করে ডাকলে তার জিভে জল পড়বে না। আবার এসব বন্ধ করে দাও কদিন, তখন আর ওই 'বাঘা, বাঘা' ডাকে বা পাত্র ঠোকায় সে চঞ্চল হবে না। জিভ দিয়ে জলও পড়বে না। এবার স্বয়ং-পরিচালিত নার্ভ-তন্ত্রের কাজটা দেখা যাক। বাইরের উত্তেজনা নয়, ভিতরের উত্তেজনায় দেহের পেশী-সমূহের সঙ্কোচন প্রসারণের ব্যাপারে এর কাজ। হৃদয়ের স্পন্দন, পরিপাক নালীর ওঠা নামা প্রভৃতি এদেরই সাহায্যে হয়। এক কথায় বলা যায়, জানতে বা অজানতে আমরা যা কিছুই করি না কেন তা করি নার্ভ-তন্ত্রের নির্দেশেই, তারই পরিচালনায়।

বংশরক্ষার কথা আগেই বলা হয়েছে। বংশানুক্রমও একটি মহা কাজ। অমুকের ছেলে মায়ের মত, না বাবার মত? অমুক

কুকুরের বাচ্চা ভাল, আর একটার তা নয়। কার ছেলের চোখ কটা, কার ছেলের চোখ কাজল কালো। কেন কুকুরের বাচ্চা কুকুরই, গরুর বাছুর গরুই ? এ সবের হদিশ প্রাণীদেহের কাণ্ড-কারখানা দেখলে বোঝা যাবে। সেলের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোসোম। এই ক্রোমোসোমের কাণ্ডই ঘটায় এত সব ঘটনা। এসব ঘটনা কেন ঘটে সে সম্বন্ধে 'গাছপালার কথা' অংশে মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে।

৬

মানুষ আর প্রাণীদের মধ্যে সম্পর্ক

প্রাণীরা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে

প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আছে এ কথা তো আগেই বলেছি। প্রাণী-রাজ্যের মানুষও এক সরিক। কিন্তু এবার যে সম্পর্কের কথা বলছি তা অন্য ধরনের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক কখনো মধুর আবার কখনো তিক্ত। প্রাণীরা কেউ মানুষের শত্রু—কেউ বা মিত্র। গরুর কথাই ধরা যাক। গরু আমাদের উপকারী বন্ধু। গরুর দুধের উপকারিতা যে কী, কত প্রয়োজন দুধের তা তো তোমাদের অনেকেরই জানা। তাছাড়া এরা লাঙল টেনে, গাড়ি টেনে কত উপকার করে আসছে আমাদের। এদের শিঙ থেকে কত জিনিস তৈরি হয়। বহু প্রাণী জীবন দিয়ে আমাদের খাদ্য সংস্থান করে দেয়। হাঁস মুরগি ডিম দিয়েও আমাদের খাদ্যের জোগান দেয়। এ সব প্রাণীর মাংসও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের খাদ্যের অনেক কিছুই এদের দানে পুষ্ট। তাই এদের বন্ধু বলব না তো কী? মাছও আমাদের বেশিরভাগ লোকের খাদ্য-তালিকায় প্রধান স্থান অধিকার করে আছে।

জামা কাপড় ইত্যাদিও আমরা নানা প্রাণীর কাছ থেকেই পাই। নানা অনুষ্ঠানে, নিমন্ত্রণ বাড়িতে সিল্ক, তসর ইত্যাদির পোশাক গায়ে দিয়ে সেজেগুজে যাই, তাও যে এদেরই দান। শীতে কাঁপতে কাঁপতে উলের জামা চাদর গায়ে দিই। সেও প্রাণীদের কাছ থেকেই পাওয়া। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাণীরা আমাদের কত উপকার করছে—কত বন্ধুর মত কাজ করছে। শুধু তাই নয়। প্রাণীদের অনেকের জীবন দানের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে প্রাণী-বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান শাখা হয়েছে পুষ্ট। পরীক্ষাগারে কত

ব্যাঙ, কত গিনিপিগ, খরগোস ইত্যাদি হত্যা করা হয় তা বিজ্ঞানের ছাত্রদের অজানা নয়! গবেষণা করার কাজে যাঁরা রত, বিশেষ করে প্রাণী বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান ও ডাক্তারি শাস্ত্রে, তাঁরা বোঝেন এদের কত প্রয়োজন। নানা ওষুধের গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় প্রাণীদের উপর তা প্রয়োগ করে। তাই বলছিলাম, বহু ক্ষেত্রে মানুষ আজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই প্রাণী-জগতের কাছে ঋণী।

প্রাণীরা শত্রুতায়ও কম যায় না

মিত্রতার কথা তো হল, কিন্তু শত্রুতাতেও অনেক প্রাণী কম যায় না। অনেক প্রাণী আছে যারা রোগ ছড়িয়ে বা রোগ সৃষ্টি করে মানুষের বহু ক্ষতি করছে। অনেক পতঙ্গ চাষ আবাদের ক্ষতি করে, আমাদের নানা অপকার করে। বহু প্রাণী, যেমন বাঘ, সিংহ, কুমির, সাপ ইত্যাদি মানুষের কাছে ভয়ঙ্কর বিভীষিকা। আবার অনেক প্রাণী আছে যারা পরজীবী। এরা মানুষের শরীরে বাস করে এবং সুবিধেমত মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি করে। অনেক সময় এসব রোগ মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

মৌমাছির কথা

এখন আমরা তেমনি কয়েকটি উপকারী ও অপকারী প্রাণীর কথা বলব। কে শত্রু আর কে মিত্র তা চিনে রাখা ভাল। প্রথমেই ধর মৌমাছির কথা। মৌমাছি সন্ধিপদ পর্বের পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী। মৌমাছির কাছ থেকে আমরা মধু আর মোম পাই। অবশ্য এরা অনেক সময় হুল ফুটিয়ে আমাদের যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু তাই বলে তাদের উপকারের কথা ভুলি কী করে? শুধু তাই নয়, এদের সামাজিক জীবন ও শ্রমবিভাগ আমাদের শেখবার মত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালন করা হয় পৃথিবীর নানা দেশে।

আমাদের দেশেও মৌমাছি পালন কম হয় না। এক ধরনের মৌমাছি আছে যারা চাক বাঁধে। কিন্তু আর এক রকম মৌমাছি আবার চাক বাঁধে না। এদের মধ্যে শুধু স্ত্রী আর পুরুষ-মৌমাছি দেখা যায়। কিন্তু যারা চাক বাঁধে তাদের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী আর শ্রমিক মৌমাছি দেখা যায়। ফুলের পরাগ এদের খাদ্য। এদের জীবন চারটি অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। প্রথমে ডিম, তার পর লার্ভা বা শূক কীট। এরপর পিউপা বা মূক কীট, সর্বশেষে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি।

মৌচাক মৌমাছির যেন ঘর বাড়ি। অনেক ছোট ছোট ঘর বা কুঠরি দিয়ে মৌচাক তৈরি। বেশির ভাগ কুঠরিই খুব ছোট। তবে কতকগুলো মাঝারি, আবার কয়েকটা বড় এবং লম্বাটে ধরনের কুঠরিও আছে মৌচাকে। ছোটগুলোতে শ্রমিক, মাঝারি গুলোতে পুরুষ এবং বড়গুলোতে স্ত্রী বা রানীরা থাকে। এছাড়াও নানা রকম কাজের জন্যে মৌচাকে ঘর দেখা যায়। একটি মৌচাকে একটি মাত্র রানী, কয়েকটি পুরুষ আর অনেক শ্রমিক থাকে। এরা বেশ দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। রানীরা দেখতে বেশ বড় আর এদের অ্যাব্‌ডোমেন (Abdomen) বা পেট লম্বাটে। তবে, শেষভাগটা সরু। মৌচাকে অন্য স্ত্রী-মৌমাছি জন্মালে রানী তাদের হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলে। রানীরা একটি মৌচাকে এক বছরের বেশি থাকে না বলে জানা যায়। পুরুষরা রানীদের থেকে ছোট, কিন্তু এদের চোখদুটো বেশ বড়। এরা মৌচাকে কোন কাজই করে না। রানীদের হাজার হাজার ডিম পাড়াই কাজ। শ্রমিকরাই মৌচাকের সবরকম কাজ করে। মৌচাক তৈরি, মধু সংগ্রহ, রানীদের দেখাশোনা প্রভৃতি কাজ করতে হয় এদের। শ্রমিকরা রানীদের তুলনায় ছোট। এদের পেটের শেষ দিকে থাকে হুল। ওই হুল ফুটিয়ে শত্রুদের এরা আক্রমণ করে। এরা মৌচাকে রক্ষকের কাজও করে। বলতে

গেলে স্ত্রীদের অপরিণত অবস্থাই হচ্ছে শ্রমিক। এদের দেহ পরাগ সঞ্চয়ের জন্যে শুঁয়ায় ভরা। এই পরাগ রাখবার জন্যে পিছনের পায়ে থাকে পরাগ-থলি। সেই পরাগ এরা রেখে দেয় মৌচাকের খাবার রাখার ঘরে। ফুল থেকে ফুলের রস আনবার জন্যে এদের মুখে থাকে উপাঙ্গ। এ দিয়ে ফুলের রস শোষণ করে পৌষ্টিক নালীতে ক্রপ (crop) বলে যে অঙ্গ থাকে তাতে জমা করে রাখে। এখানে সেই রস মধুতে রূপান্তরিত হয়। মৌচাকে ফিরে এসে তারা তা ক্রপ থেকে বমি করে জমিয়ে রাখে মৌচাকের খাবার ঘরে। মোমও শ্রমিকদের দেহ থেকেই তৈরি হয়। ঐ মোম শ্রমিকদের পেটের তলদেশের ভিতর কতকগুলো কোষ থেকে নির্গত হয়। প্রয়োজন-মত অন্য শ্রমিকরা লালা মিশিয়ে তা নরম করে। তারপর পিছনের পায়ের সাহায্যে মোমগুলো নিয়ে মৌচাক গড়ে। এই মৌচাকের গর্তগুলোর সাধারণত ছটি দেওয়াল থাকে। এ ঘরগুলোর কোনটায় থাকে মধু, কোনটায় বাচ্চায় লালিত পালিত হয়, কোনটায় মৌমাছির রুটি (Bee bread) থাকে জমা। রানী মৌমাছি একসঙ্গে অনেকগুলো ডিম পাড়ে। শ্রমিকরা তখন ডিমগুলোকে চাকের এক একটি কুঠরিতে রেখে দেয়। দিন তিনেক পরে ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে বাচ্চা। এদের তখন বলা হয় শূক কীট বা লার্ভা। শ্রমিক মৌমাছিরা তাদের পৌষ্টিক নালীর এক অংশ থেকে নির্গত জেলির মত পদার্থ (যার নাম রাজকীয় জেলি) খাইয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখে। এ সব শূক কীট থেকেই সৃষ্টি হয় রানী মৌমাছি। কিন্তু যে-সব শূক কীটকে মধু ও পরাগ মেশানো খাবার বা মৌমাছির রুটি খাওয়ানো হয় তা থেকে সৃষ্টি হয় শ্রমিক ও পুরুষ মৌমাছি। এ সব শূক কীট আকারে লম্বা, আর দেখতে হয় সাদাটে রঙের। এদের কোন নাক, চোখ ইত্যাদি থাকে না। যে ঘরগুলিতে লার্ভা থাকে শ্রমিকরা সে সব ঘরের মুখ বন্ধ করে দেয় মোম দিয়ে। শূক কীটরা নিজেদের দেহের চারদিকে একটা

পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে তার মধ্যে মূক কীট বা পিউপায় রূপান্তরিত হয়। এ আবরণটির নাম গুটি। এক থেকে দু-সপ্তাহের মধ্যে পিউপা একটি পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিতে পরিণত হয়। তারপর তা দেহের আবরণ ও বাইরের মোমের ঢাকনা কেটে বেরিয়ে আসে। অনেক সময় এও দেখা যায় যে, কিছু শ্রমিক এবং পুরুষ মৌমাছি একটি রানীকে নিয়ে আলাদা চাক বাঁধে। পুরোনো চাকে বেশি মৌমাছি হলেও কতক শ্রমিক মৌমাছি নতুন চাক বেঁধে সেখানে রানীকে নিয়ে আলাদা ঘর সংসার পাতে। রানী মৌমাছি চার পাঁচ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। কিন্তু শ্রমিকদের জীবনকাল কয়েক মাসের বেশি নয়। অবশ্য শ্রমিকরাই মৌচাকের প্রাণ। রানীরা শুধু নামেই রানী—ডিম পাড়াই তাদের একমাত্র কাজ। এরই জন্যে শ্রমিকরা এদের এত যত্ন আত্তি করে থাকে। শ্রমিকরা লার্ভার লালন পালনও যে করে সে-কথা তো আগেই বলেছি।

রেশম-কীট

মৌমাছির জীবন কথা, তাদের উপকারের কথা জানলে। এবারে শোন আর একটি উপকারী পতঙ্গের কথা। রেশম-মথও (Silk-moth) আমাদের উপকারী। এদের জন্যেই আমরা রেশমি স্থতো পাই যা থেকে তৈরি হয় সুন্দর সুন্দর জামা কাপড়। এই পতঙ্গদের মধ্যে কেউ বছরে একবার ডিম দেয়, কেউ দেয় অনেকবার। এই পতঙ্গরা প্রজাপতির মত ডানাগুলো পিঠের উপর খাড়া রেখে বিশ্রাম করে না। বিশ্রামের সময় এদের ডানা দুদিকে ছড়ানো থাকে। এরা সাধারণত নিশাচর। প্রজাপতির মত দিনের বেলায় এদের দেখতে পাওয়া ভার। এদের দেহও রঙিন, যদিও প্রজাপতির মত অত সুন্দর আর জ্বলজ্বলে নয়। যাই হোক এদের মুখ থেকে নিঃসৃত লালা থেকেই রেশম, গরদ, মুগা প্রভৃতি পাওয়া যায়। আমাদের দেশে রেশম-কীটের চাষ সরকারি

তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। এদের একটি ভাল গুটি থেকে প্রায় চারশো গজ রেশম পাওয়া যায় বলে জানা গেছে।

এদেরও ডিম, শূক কীট, মূক কীট ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থার ভিতর দিয়েই জীবন-চক্র পূর্ণ হয়। স্ত্রী-মথ তুত পাতার উপর একসঙ্গে পাঁচ-ছশো ডিম পাড়ে। ডিমগুলো দেখতে খুবই ছোট, রঙ হলদে। তুঁত পাতাই হল এদের খাদ্য। অনেক সময় কুল, পলাশ, পেয়ারা ইত্যাদি পাতার উপরও এরা ডিম দেয়। প্রায় সাত-আট দিনের ভেতর ডিম ফুটে শূক কীট বেরিয়ে আসে। শূক কীটের দেহের অংশ তিনটি—মাথা, বুক আর পেট। পূর্ণাঙ্গ শূক কীটের মাথাটা বাদামি রঙের আর দেহ ধূসর। ডিম থেকে বার হবার পর থেকেই এরা পাতা খেতে শুরু করে। এদের মুখে থাকে একজোড়া চোয়াল (Mandible)। বুক তিন খণ্ডে বিভক্ত, আর প্রত্যেক খণ্ডে থাকে নখওয়ালা একজোড়া করে পা। পেট দশটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম দুটো খণ্ডে কোন উপপদ নেই। তার পরের চারটিতে হুক-ওয়ালা চার জোড়া উপপদ থাকে। দশম খণ্ডেও উপপদ থাকে। এরা প্রায় একমাস ধরে প্রচুর পাতা খেয়ে প্রায় দু-ইঞ্চির মত লম্বা হয়ে যায়। এর মধ্যে চার বার এরা খোলস বদল করে। শেষ খোলস ছাড়বার পর এদের দেখতে হয় বেশ মোটাসোটা; রঙও বদলে সাদা হয়ে যায় তখন। তারপর ধীরে ধীরে খাওয়া কমে আসে, আর চাঞ্চল্যও কমে যায়। এ সময় এদের মুখ থেকে এক-রকম রস বার হয়। সেই রস দেহের চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা আবরণের মত তৈরি করে। বাতাসের সংস্পর্শে এসে ঐ রস শক্ত হয়ে রেশম সুতোর সৃষ্টি করে। এইভাবে দেহের চারদিকে যে আবরণ তৈরি হয় তার নাম হচ্ছে রেশমের গুটি বা কোকুন। স্ত্রী-মথের গুটি পুরুষদের গুটির থেকে বড়।

গুটির ভিতর আবদ্ধ শূক কীট ধীরে ধীরে পিউপা বা মূক কীটে পরিণত হয়। কিছুদিন পর মূক কীট কোকুনের মধ্যেই নানা

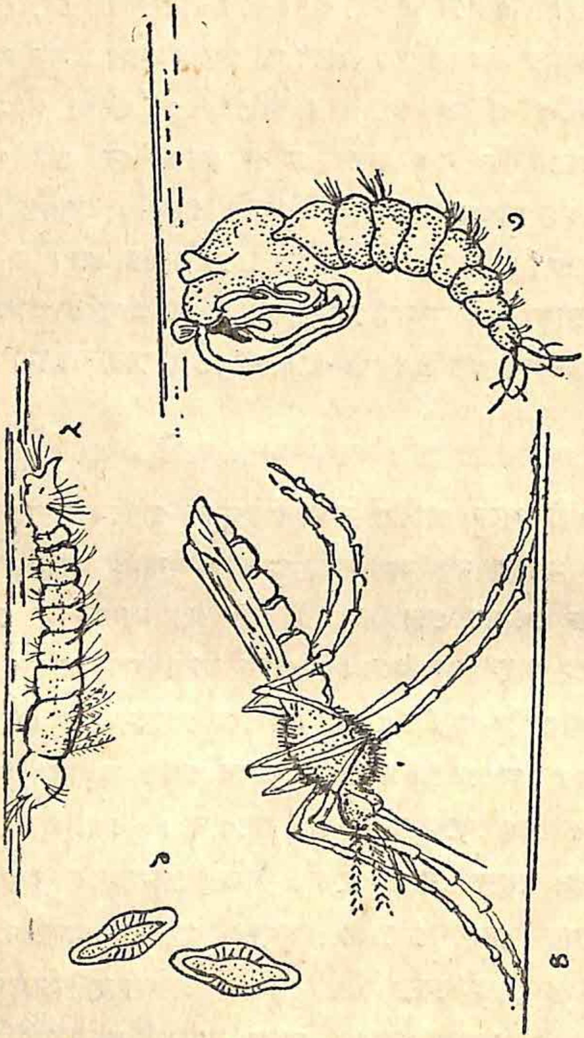
পরিবর্তনের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ মথে রূপান্তরিত হয়। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ হতে এদের সময় লাগে প্রায় পঁয়তাল্লিশ দিন। এরপর গুটি কেটে বেরিয়ে আসে মথ। স্ত্রী রেশম-কীট ডিম দেবার পর মারা যায়। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, যে গুটি কেটে মথগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে তা থেকে ভাল রেশম হয় না। তাই মথ গুটির বাইরে আসবার আগেই গুটিগুলো গরম জলে ভিজিয়ে ভিতরের জীবটিকে মেরে ফেলা হয়। যে গুটি পাওয়া গেল তা থেকেই পাওয়া যায় ভাল রেশমি সুতো। অবশ্য এদের বংশবৃদ্ধির জন্যে কিছুসংখ্যক মথ জীবন্ত রেখে দেওয়া হয়।

এ সব ছাড়া গরু, কুকুর, ঘোড়া, হাতি, উট প্রভৃতি প্রাণীরা যে আমাদের কতভাবে কত উপকার করে তা তোমাদের অজানা নয়।

যে-সব প্রাণী আমাদের ক্ষতি করে—মশা, মাছি

এবার কয়েকটি শত্রু প্রাণীর কথা বলছি। প্রথমে মশার কথাই ধরা যাক। মশার মত অপকারী প্রাণী খুব কমই আছে। এরা আমাদের রক্ত শোষণ তো করেই, উপরন্তু নানারকম রোগও আমাদের দেহে সংক্রামিত করে। এদের দ্বারাই ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ফাইলেরিয়া বা গোদ প্রভৃতি রোগ এক দেহ থেকে আর এক দেহে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য স্ত্রী-মশারাই এসব রোগ ছড়ায়। পুরুষ-মশা মানুষের দেহ থেকে রক্তশোষণ করে না। এরা শাক, পাতা বা ফলের রস খেয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু স্ত্রী-মশাই রক্তশোষণ করে মানুষের দেহ থেকে। মশার মধ্যে অ্যানোফিলিস (Anopheles), কিউলেক্স (Culex) এবং এডিস বা স্টিগোমিয়া (Stegomyia) মশাই নানা রোগ ব্যাধি ছড়ানোর কাজে বিশেষ ওস্তাদ। অ্যানোফিলিসের দ্বারাই ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়। কিউলেক্স ফাইলেরিয়া বীজাণু বহন করে, আর এডিস ডেঙ্গু জ্বর ও শীত জ্বরের জন্যে দায়ী।

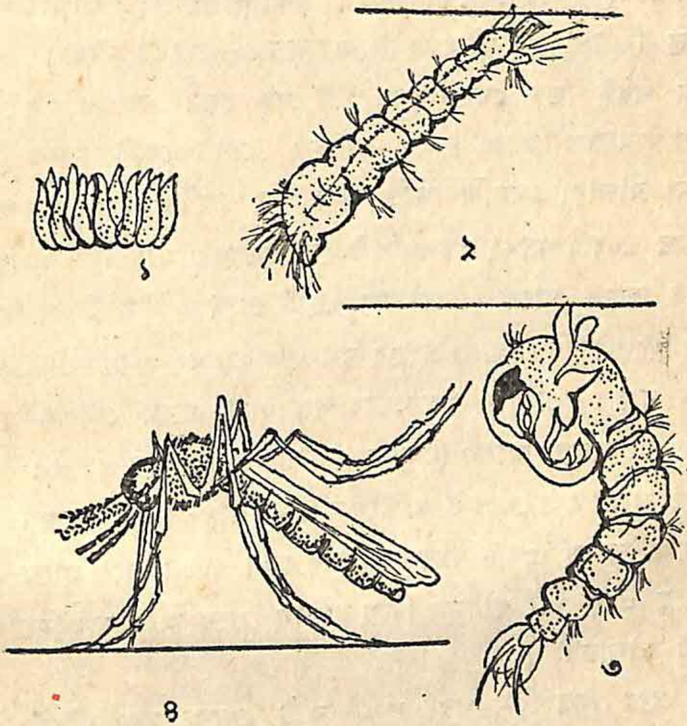
মশা সাধারণত নিশাচর। তবে ঝোপ, ঝাড়, স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার জায়গাতেও দিনের বেলায় এদের দেখা যায়। মশা আলো সহ্য করতে পারে না। অ্যানোফিলিস আর কিউলেক্স মশা আমাদের



অ্যানোফিলিস মশার জীবন-বৃত্ত
১। ডিম, ২। শূককীট, ৩। মূককীট, ৪। পূর্ণাঙ্গ।

দেশে খুব দেখা যায়। এদের বসার ধরন দেখলেই কে কোন জাতের তা চিনে নেওয়া সহজ হয়। অ্যানোফিলিস যখন কিছুর উপর বসে তখন তার দেহটি একটি সরল রেখায় থাকে, আর তার

দেহ ও বসার জায়গার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম কোণের সৃষ্টি হয়। এদের লার্ভা জলের সঙ্গে সমান্তরাল বা সোজাসুজিভাবে ভাসতে থাকে। কিন্তু কিউলেক্সের লার্ভা মাথা নিচের দিকে রেখে জলের মধ্যে ঝুলতে থাকে। এদের বসার ধরনও অন্যরকম। বসার সময় এদের



কিউলেক্স মশার জীবন যন্ত্র

১। ডিম, ২। শূক কীট (লার্ভা) ৩। মুক কীট (পিউপা) ৪। পূর্ণাঙ্গ।

মাথা আর পেট এক রেখায় অবস্থিত থাকে না। উদরের শেষ ভাগ বসার জায়গার দিকে বেঁকে থাকে।

মশারও জীবনে চারটি অবস্থা—ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ মশা। ডিম পাড়ার সময় হলে এরা জলের কাছে যায়। তারপর বদ্ধ বা স্রোতহীন জলে ডিম পাড়ে। অ্যানোফিলিসরা সাধারণত

নদী, পুকুর প্রভৃতির পরিষ্কার জলে ডিম দেয়। কিন্তু কিউলেক্সরা ডোবা, নালা প্রভৃতির অপরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে। নর্দমা বা কোন ছোট পাত্রের অপরিষ্কার জলেও এদের ডিম দিতে দেখা যায়। মশার ডিম বেশ ছোটই। অ্যানোফিলিস একসঙ্গে অনেক ডিম দেয়। ডিমগুলো দেখতে নৌকোর মত। এরা ছাড়া-ছাড়া অবস্থায় থাকে। কিন্তু কিউলেক্সের ডিম ছাড়া-ছাড়া নয়—থোকা বাঁধা। দু-তিন দিন পরই ডিম থেকে শূক কীট বের হয়। জন্মের পর থেকেই এরা খাবারের জন্যে ঘুরতে থাকে। ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ, নানা বীজাণু, এমনকি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীও এরা খেয়ে থাকে। এদের দেহটি মাথা, ধড় আর উদরে বিভক্ত। মাথাটা তুলনায় বড় আর তাতে থাকে একজোড়া ছোট চোখ। উদরটি এদের ন-টি খণ্ড দিয়ে তৈরি। প্রতি খণ্ডের দু-দিকে বড় বড় শুঁয়া (Bristles) দেখা যায়। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার পর এরা প্রথম খোলস ছাড়ে। তারপর অবশ্য আরও তিনবার খোলস ছাড়তে হয় এদের। প্রথম দিকে লার্ভা জল থেকেই অক্সিজেন নেয় শ্বাসকার্যের জন্যে। পরে উদরের কাছে একটি শ্বাস-যন্ত্র তৈরি হয়। এরা মাঝে মাঝে জলের উপরে এসে এই শ্বাসনল দিয়ে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে শ্বাস-কার্য চালায়।

প্রায় আটদিন পর শূক কীট থেকে মূক কীটের সৃষ্টি হয়। 'কোমা' চিহ্নটির মত এদের চেহারা হয় সে সময়। এদের মাথা বেশ বড়, কিন্তু দেহের পিছন দিকটা সরু। এদের মুখ থাকে না বলে খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ থাকে। উদরের শেষ দিকে এদের থাকে একজোড়া পাখনার মত। এটা দিয়ে সাঁতার দিতে পারে এরা। মাথার উপর দিকে থাকে একজোড়া শ্বাস-নল। অ্যানো-ফিলিসের মূক কীটের রঙ সবুজ, আর শ্বাস নলটিও ছোট। কিন্তু কিউলেক্সের শ্বাস-নল তুলনায় বড় ; তাছাড়া মূক কীটগুলো দেখতেও সাদা। দিন দুই পর মূককীটের খোলস কেটে পূর্ণাঙ্গ মশা বা

ইমাগো (Imago) বের হয়ে আসে। প্রথমে এরা ওড়ে না। খোলসের উপর বসে থাকে। কারণ ডানাগুলো থাকে এ সময় ভিজো। ডানা শুকিয়ে গেলেই এরা উড়তে পারে। অ্যানোফিলিস আর কিউলেক্স মশার পূর্ণাঙ্গ অবস্থা মোটামুটি একরকমের হলেও কিছু কিছু তফাতও অবশ্য আছে।

এডিসের জীবন-চক্রও মোটামুটি অ্যানোফিলিস এবং কিউলেক্সের মতই।

মাছি

মশার মত মাছিও আমাদের নানাভাবে ক্ষতি করে থাকে। কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগের জন্যে এরাই দায়ী।

মাছির দেহে রয়েছে তিনটি অংশ—মাথা, বুক আর পেট। আঁস্তাকুড়, পচা গোবর প্রভৃতির উপর মাছি ডিম পাড়তে ভালবাসে। এদের ডিমগুলো খুবই ছোট আকারের, রঙ এগুলোর সাদা। মশার মত মাছির জীবনেও রয়েছে তিনটি অবস্থা। প্রথমে ডিম, তারপর শূক কীট (লার্ভা) এবং সবশেষে মূক কীট (পিউপা)। ডিম থেকে লার্ভা বেরোবার পর-এগুলো দু-বার খোলস ছাড়ে। তারপর দেহের চারদিকে একটি আবরণ তৈরি করে থাকে। কয়েকদিন পর আবরণ ফেটে পূর্ণাঙ্গ মাছি বেরিয়ে আসে।

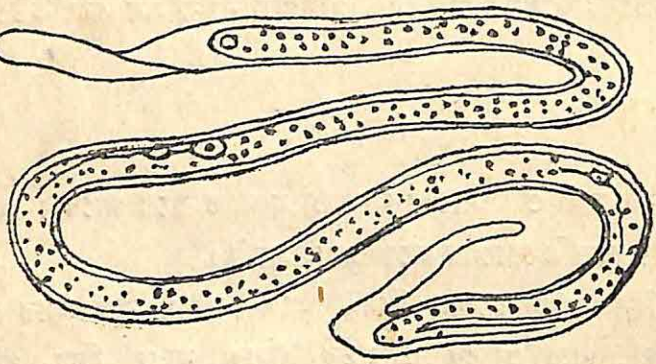
কয়েকটি অদ্ভুত জাতের প্রাণী

এবার কয়েকটি বিশেষ জাতের প্রাণার কথা বলব যাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা মধুর নয়।

অনেক সময় এমন অনেক লোক দেখতে পাবে যাদের পা ফোলা। খবর নিলে জানতে পারবে যে তারা ফাইলেরিয়া রোগে ভুগছে। সোজা কথায় আমরা বলি গোদ হয়েছে। ভারতের নানা জায়গায় বিশেষ করে উড়িষ্যায় বেশ কিছু-সংখ্যক লোক ফাইলেরিয়ায়

ভুগছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই রোগ অল্পবিস্তর দেখা যায়।

এই রোগ সৃষ্টিকারী প্রাণীরা হচ্ছে গোলকৃমি জাতের এক রকম প্রাণী। এই প্রাণীর দেহটি নলের মত। ছোট কেঁচোর মতই দেখতে অনেকটা। কিন্তু কেঁচোর মত কাটা দাগ থাকে না এদের



মাইক্রোফাইলেরিয়া ব্যাঙক্রফ্‌টি

দেহে। এদের মাঝে স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে। স্ত্রীরা পুরুষদের চেয়ে লম্বায় প্রায় দেড় গুণ বড়। এদের নাম হল ফাইলেরিয়া ব্যাঙক্রফটি। এরা মানুষের দেহের মধ্যে বাস করে। এদের লার্ভার অবস্থানও মানুষের দেহে। নানা দেশের নানা মানুষ এই লার্ভার সন্ধান পেয়েছেন জীবদেহের নানা জায়গা থেকে। বিজ্ঞানীদের অভিমত এই যে, রাত্রিবেলায় মশা যখন মানুষের রক্ত শোষণ করে তখন এই লার্ভা মানুষের দেহ থেকে মশার দেহে চলে যায়। মশার দেহে এই লার্ভার কিছু রূপান্তরও ঘটে।

লার্ভাগুলো আকারে খুবই ছোট। খালি চোখে দেখাই যায় না। এদের সারা দেহ একটি আবরণ দিয়ে ঢাকা। এগুলো কেবলমাত্র রাত্রিবেলায়ই মানুষের শিরায় দেখা যায়। অনেকে ধারণা করে থাকেন যে, মশার দেহে যাবার জন্যেই এরা রাত্রে মানুষের শিরায় আসে। কারণ মশা নিশাচর। তবে বিজ্ঞান-

সম্মত কথা হল এই যে, ঘুমোবার সময় আমাদের শিরাগুলো ফুলে ওঠে বলে শিরার ভিতরটা বড় হয়ে যায়। তাই লার্ভাগুলো সহজেই দেহশিরার রক্তের মাধ্যমে মশার দেহে এসে থাকে।

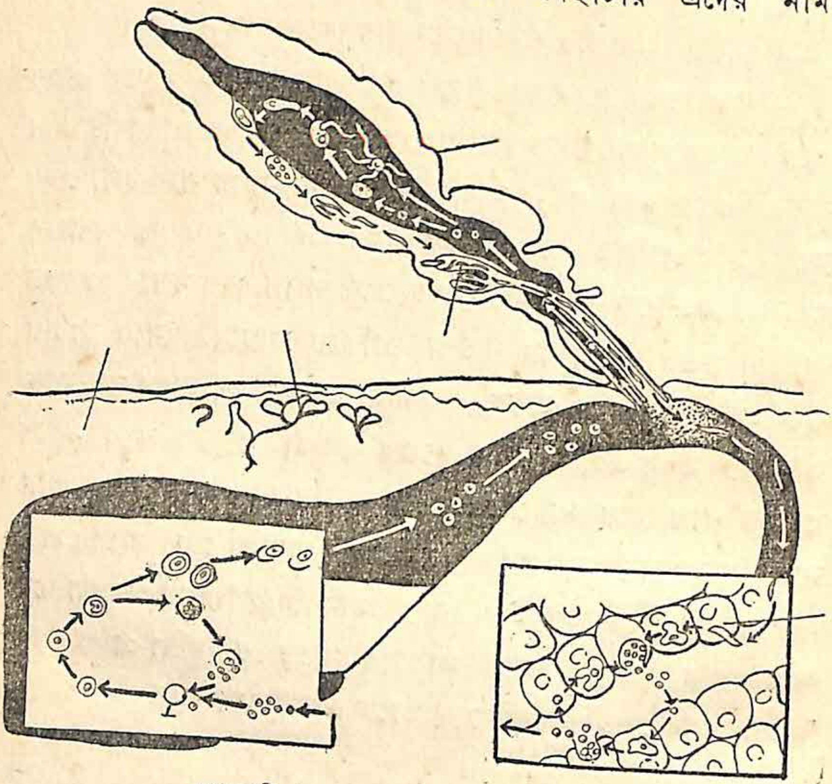
মশা রক্তশোষণের সময় রক্তের সঙ্গে কিছুসংখ্যক লার্ভা গ্রহণ করে। মশার পাকস্থলীতে আসবার পর তাদের দেহের আবরণটি খসে যায়। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই লার্ভাগুলো মশার পাকস্থলী ভেদ করে বুকের পেশীতে এসে হাজির হয়। এখানেই এদের রূপান্তর ঘটে। দিন-দশেক বাদে এরা বুকের পেশী ত্যাগ করে মশার শুঁড়ের (Proboscis) গোড়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে মানুষের দেহে যাবার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এমনি ধরনের মশা যখন মানুষকে কামড়ায় তখন এরা মানুষের রক্তের উষ্ণতা অনুভব করে মশার শুঁড়ের পাশ দিয়ে মানুষের চামড়ায় হাজির হয়। তারপর মশার দ্বারা ছিন্ন স্থান দিয়েই হোক বা নিজেরাই চামড়া ভেদ করে হোক মানুষের দেহে প্রবেশ করে এরা। মানবদেহে লিম্ফনালী বলে যে অঙ্গ থাকে সেখানে গিয়ে আকারে বাড়ে ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তারপর যার দেহে স্থান নিয়েছে তাকে রোগাক্রান্ত করে।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু

এবার আর-একটি অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর কথা বলছি যা একদিন মানুষের কাছে ছিল এক বিভীষিকার মত। জুতো জামা গায়ে দিয়ে বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছ, হঠাৎ কম্প দিয়ে জ্বর এল। লেপ কম্বল চাপা দিয়েও শীত আর মানে না। কী ব্যাপার? না, ম্যালেরিয়া হয়েছে। এহেন ম্যালেরিয়ার কবলে বাংলা দেশে, বিশেষ করে পল্লীবাংলায় কত লোকের যে কী দুর্দশা হয়েছে তা বলবার নয়। বর্তমানে অবশ্য ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কমে গেছে।

ম্যালেরিয়া-সৃষ্টিকারী জীবাণুটি হচ্ছে প্রোটোজোয়া পর্বের একটি প্রাণী। এর নাম হচ্ছে প্ল্যাস্‌মোডিয়াম ভাইভাক্স (Plasmo-

dium vivax)। এরা পরজীবী। কোন মেরুদণ্ডী প্রাণী বা মানুষের রক্তে বাস করে এরা। সে অবস্থাটায় এদের নাম



ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুর জীবন-চক্র

ট্রোফোজয়েট অবস্থা (Trophozoite stage)। এসময়ে এরা দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে। অন্য কোন অমেরুদণ্ডী প্রাণী বা অ্যানোফিলিস মশার দেহে এদের জীবনের আর একটা অবস্থা কাটে। এ অবস্থার নাম স্পোরোজটে অবস্থা। এ অবস্থায় এদের দেখতে হয় কাস্তের মত বা ফালি চাঁদের মত। এই অপরূপ রূপ নিয়ে মশার সর্ব দেহে ছড়িয়ে পড়ে এগুলো। এদের বেশ কিছুসংখ্যক তখন মশার লালাগ্রন্থিতে এসে হাজির হয়।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, স্ত্রী-মশা যখন রক্ত শোষণ করে তখন তার স্বভাবজনিত প্রথা অনুযায়ী মাঝে মাঝে

থুতু বা লালা ঢেলে দেয়। যে সব স্ত্রী-মশার লালা গ্রন্থিতে স্পোরোজয়েট আছে এমন মশা যদি কামড়ায় তবে তার থুতু বা লালার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত স্পোরোজয়েট সেই দেহে অর্থাৎ যাকে কামড়াবে তার শিরায় প্রবেশ করে। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে আর তাদের রক্তে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার কারণ হল এই যে, তারা রক্তবাহিত হয়ে চলে যায় যকৃতে বা লিভারে। তার পর চলে বংশবৃদ্ধির পালা। এখানে তারা দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে অসংখ্য প্রাণীর সৃষ্টি করে। যকৃতের কোষ যখন জীবাণুদের আর জায়গা দিতে পারে না তখন তা ফেটে যায়। তখন সেখান থেকে এগুলো বেরিয়ে এসে রক্তে ঢুকে পড়ে। এ সময় তাদের চাঁদের ফালির মত রূপ আর থাকে না, রূপ হয়ে যায় গোল মত। এই অবস্থায় তারা রক্তের লোহিত কণিকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার সাইটোপ্লাজম খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে। আর আকারেও তখন বেশ বড় হয়ে যায় এগুলো। এ সময় এদের অ্যামিবার মত ক্ষণ-পদ তৈরি হয়। তারপর আবার বংশ-বিস্তারের পালা শুরু হয়। দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় এরা সংখ্যায় ক্রমশ বাড়তে থাকে। লিভার কোষের মত লোহিত কণিকাগুলোও একসময় ফেটে যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে এদের কেউ-কেউ আবার নতুন লোহিত কণিকা আক্রমণ করে এবং আগের উপায়ে বংশ বিস্তার করতে থাকে। আবার কেউ কেউ স্ত্রী আর পুরুষ প্রাণীতে পরিণত হয়। আকারে একটু বড় হয়ে এরা রক্তের তরল অংশে বাস করতে থাকে।

এ সময় যদি কোন স্ত্রী-মশা এমনি কোন রোগীর রক্ত শোষণ করে তবে তার রক্তের সঙ্গে এই স্ত্রী আর পুরুষ পরজীবীরা মশার পাকস্থলীতে হাজির হয়। এরা ছাড়া এই প্রাণীর অনেক স্পোরোজয়েটও মশার দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু তারা মশার খাদ্যের সঙ্গে হজম হয়ে যায়। তার মানে, তখনই তাদের বিনাশ প্রাপ্তি ঘটে। পুরুষ জীবাণুদের দেহ থেকে

লম্বা সরু শুঁড়ের মত কতকগুলো অঙ্গের সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্ত্রী-কীটাণুরা দেখতে হয় গোল মত। এই দুয়ের মিলনে যা সৃষ্টি হয় তাকে বলে জাইগোট (Zygote)। জাইগোট মশার পাকস্থলী ভেদ করে তার দেহ-গহ্বরে প্রবেশ করে। এখন এদের দেহ দেখতে হয় অনেকটা ছোট মাকুর (spindle) মত। এর ভিতরের নিউক্লিয়াসটি বহু বিভাজন পদ্ধতিতে অনেক ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সাইটোপ্লাজমও ভাগ হয় সেইমত। তার পর কাস্তের মত কতকগুলো স্পোরোজয়েট তৈরি হয়। এই স্পোরোজয়েট ভরা বস্তুটির নাম হল উসিস্ট, এবং এই উসিস্ট কেটেই বেরিয়ে আসে স্পোরোজয়েট। স্পোরোজয়েটগুলো তারপর মশার লালা-গ্রন্থিতে প্রবেশ করে। অবশ্য তারা মশার অন্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে থাকে। যাই হোক, এখন যদি এই মশা কোন মানুষকে কামড়ায় তখন তার দেহে স্পোরোজয়েট সংক্রামিত হয় এবং নতুন প্রাণীর দেহে তাদের নতুন জীবন-চক্র শুরু হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, স্ত্রী-অ্যানোফিলিস মশাই ম্যালেরিয়া রোগকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর ম্যালেরিয়া রোগ-সৃষ্টিকারী এইসব জীবাণুর জীবনযাত্রা পূর্ণ করতে সময় লাগে দু-সপ্তাহের মত।

সাধারণত তিন রকমের ম্যালেরিয়া-সৃষ্টিকারী প্লাসমোডিয়াম আছে যারা হল এই রোগের কারণ। প্লাসমোডিয়ার ভাইভাক্সের কথা জানলে। তাছাড়া আছে প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি (P. malariae) এবং প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম P. falciparum)। ভাইভাক্স-এর জন্যে সে জ্বর হয় তা হয় প্রতি আটচল্লিশ ঘণ্টা অন্তর অন্তর; কিন্তু ম্যালেরিদের দ্বারা প্রতি চতুর্থ দিনে জ্বরের উৎপত্তি, আর ফ্যালসিপেরামের জন্যে যে জ্বর হয় তার নাম ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। এর কোন দিনের ঠিক নেই, এলোমেলো রকমের। এটাই সবথেকে ক্ষতিকারক। সময়-মত ডাক্তারের সাহায্য না নিলে বা ওষুধপত্র না খেলে বিপদ ঘটতে পারে।

ম্যালেরিয়া জীবাণুদের সবারই জীবন-চক্র মোটামুটি এক রকমের, শুধু এদের জ্বরের লক্ষণগুলোই (symptoms) তফাত। ম্যালেরিয়া মানুষের পরম শত্রু। শুধু বাংলা নয়, ভারতের মধ্যে আসাম, বিহার প্রভৃতি জায়গাতেও রয়েছে এর প্রকোপ। শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর নানা দেশে, বিশেষ করে আফ্রিকা, ইটালি, দক্ষিণ আমেরিকা, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশেও ম্যালেরিয়া হয়। বৈজ্ঞানিক রস্ (Sir Ronald Ross) প্রথমে এই রোগের জীবন-চক্র আবিষ্কার করেন।

আমাশয় রোগের জীবাণু

এছাড়া অনেক রকম প্রোটোজোয়া আছে যা মানুষের নানা অসুখের সৃষ্টি করে। আমাশয় রোগের কথা তোমরা জান। জল বা খাদ্যের মাধ্যমে আমাশয় রোগ সংক্রামিত হয়। এই রোগের পরজীবী প্রোটোজোয়ার নাম হচ্ছে এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকা (Entamoeba histolytica)। এরা অ্যামিবাদেরই জাত-ভাই। নানারকম মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং মানুষের অন্ত্রে (Intestine) এদের বাস। পৃথিবীর জল, স্থল, অন্তরীক্ষ কোথাও এরা বাসের জায়গা খুঁজে পেল না, কিন্তু মনের মত জায়গা পেল প্রাণীদেহের অন্ত্রে। তাই এদের অন্ত্রীয় অ্যামিবাও (Intestinal amoeba) বলে। যদিও অন্ত্রে এদের বাস, কিন্তু শরীরের নানা জায়গায়ও এরা আসতে পারে, আর তা এসেও থাকে। সেজন্যে যকৃত, হৃদয়, পেশী, মগজ ইত্যাদিতে এদের দেখা যায়।

এ-জাতীয় প্রাণীর প্রধান আহার হচ্ছে রক্তের লোহিত কণা। কাজেই রক্তের লোহিত কণাগুলো ধ্বংস করে আমাদের বিশেষ ক্ষতি করে থাকে এরা। আগেই বলেছি যে, এই লোহিত কণিকাই শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বহন করে থাকে। কাজেই লোহিত কণিকাগুলো খেয়ে এই

জীবটি আমাদের কী ক্ষতিটাই না করে! জল বা মাছি দ্বারা এরা আমাদের খাদ্যের সঙ্গে মিশে যায়। সে খাদ্য খেয়েই আমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি।

এ জাতের কোন-কোন জীবাণুর জন্যে আমাদের দাঁতের কষ্টেও ভুগতে হয়। আফ্রিকার ঘুম রোগ একটি ভীষণ রোগ। সেই রোগটিও প্রোটোজোয়ার কীর্তি। সেৎসি মাছি বলে (Tsetse fly) একরকম মাছি এই রোগ ছড়ায় মানুষের মাঝে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ছোট থেকে বড় নানা রকমের প্রাণী মানুষের কী শত্রুতাই না করছে! কেউ রোগ ছড়িয়ে, কেউ রোগের কারণ হয়ে, কেউ কেউ আবার মানুষকে কামড়ে, আঁচড়ে, হত্যা করে—পরম শত্রুর ভূমিকা নেয়। এসবের জন্যেই প্রয়োজন তাদের জীবন-কথা জানা। তা যদি না সম্ভব হয় তবে কী করে জানব আমরা কখন, কোথায় আর কিভাবে এরা আমাদের ক্ষতি করবে।

প্রাণীদের সঙ্গে তাহলে শত্রু মিত্র দুই-ই সম্পর্ক আছে মানুষের। চরম শত্রুও যেমন আছে তেমনি পরম মিত্র প্রাণীরও তো অভাব নেই। মানুষের নানা কাজে এরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকার করে থাকে।

৭
প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্পর্ক

জীব আর জড়, এই দুই নিয়েই জগত। আর জীবেরই দুটি ধারা প্রাণী আর উদ্ভিদ। প্রাণীও সজীব। উদ্ভিদও তাই, তবে, তাদের মধ্যে তফাতও অনেক। সবুজের অভাব রয়েছে প্রাণীদেহে, আবার বেশির ভাগ উদ্ভিদই সবুজ-সজীব। ক্লোরোফিলই উদ্ভিদদের বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিদরা প্রায় সকলেই নিজেরাই নিজেদের খাবার তৈরি করে নিতে পারে। প্রাণীরা পারে না। প্রাণীরা তরল ও কঠিন, দু-রকম খাদ্যই গ্রহণ করে আর উদ্ভিদরা করে শুধু তরল খাদ্য গ্রহণ। যতদিন উদ্ভিদরা বাঁচে ততদিনই তাদের কিছু-না-কিছু বৃদ্ধি হয়। কিন্তু প্রাণীদের বৃদ্ধি সাধারণত মৃত্যুর অনেক আগেই থেমে যায়।

একে ছাড়া অন্যের চলে না

এমনি ধরনের অনেক তফাত দেখা যায় জীবজগতের এই দুটি মূল বিভাগের মধ্যে। কিন্তু মজার হচ্ছে যে, এরা একে অপরের উপর অনেক ব্যাপারেই নির্ভরশীল। তোমাদের জানা আছে যে, ফোটো-সিনথেসিসের সময় বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে জলীয় বাষ্প সংযোগে উদ্ভিদ তার দেহের সবুজ কণা সূর্যের কিরণের সাহায্যে প্রস্তুত করে। আর অক্সিজেন বেরিয়ে যায় তাদের দেহ থেকে। তাছাড়া আমরা জানি, শ্বাসকার্যের জন্যে প্রাণীরা বায়ু থেকে টেনে নেয় অক্সিজেন আর ত্যাগ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড। এভাবেই প্রকৃতিতে ভারসাম্য রক্ষা হয়। তা যদি না হত তবে প্রাণীদের ছেড়ে-দেওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে গিয়ে প্রাণীদের প্রাণ ধারণ করাই অসম্ভব হত। উদ্ভিদরাও কার্বন ডাই-অক্সাইড না পেলে খাবার তৈরি করতে পারত না। ফলে দু-দলেরই অসুবিধে

হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। প্রাণী আর উদ্ভিদের মধ্যে এ বিষয়ে একটা অদ্ভুত বোঝাপড়া আছে।

প্রাণীরা উদ্ভিদদের মত খাবার তৈরি করতে পারে না। তাই তারা খাবারের জন্যে উদ্ভিদদের উপরেই নির্ভরশীল। যে-সব প্রাণী উদ্ভিদভোজী নয় তারা এমন প্রাণীর উপর খাদ্যের জন্যে নির্ভরশীল যারা খাদ্যগ্রহণ করে উদ্ভিদ থেকেই। অবশ্য এমন অনেক প্রাণীও আছে যারা দু-রকম ভাবেই তাদের খাদ্যসংগ্রহ করে থাকে। মানুষ এ-জাতেরই একটি প্রাণী। আবার এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যারা নানা জাতের পতঙ্গের উপর নির্ভর করে তাদের খাবারের জন্যে।

অন্যদিকে প্রাণীদের হাড়গোড়, মলমূত্র প্রভৃতি জমির ভাল সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই সারের জন্যে জমি হয় উর্বর। উর্বর হলে সেই জমিতে গাছপালা ভাল হয়। তাছাড়া পচা গলা প্রাণীদের দেহ মাটিতে মিশেও ভাল সারের কাজ করে। সেই মাটি থেকেই আবার উদ্ভিদরা খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে। কাজেই আমরা বলতে পারি, উদ্ভিদরাও খাবারের জন্যে প্রাণীদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পায়।

প্রজাপতি, মৌমাছি প্রভৃতি পতঙ্গরা ফুল থেকে ফুলে মধু অন্বেষণের জন্যে ঘুরে বেড়ায়। ফুলে ফুলে মধু আহরণের সময় তাদের দেহে লেগে যায় পরাগ-রেণু। এরা যখন এই পরাগ গায়ে মেখে অন্য ফুলে গিয়ে বসে তখন সেই রেণু স্থানান্তরিত হয় এক ফুল থেকে অন্য ফুলে। একে বলে পরাগ-সংযোগ। এই পরাগ সংযোগের ফলে নবজীবনের সৃষ্টি হয়। ফুলের বর্ণ, গন্ধ ও মধু ডেকে আনে পতঙ্গদের নিজেদের স্বার্থের জন্যেই। আর তার পরিবর্তে প্রাণীরা পায় নিজেদের প্রয়োজনীয় খাবার।

অনেক গাছে এক জাতের পিঁপড়েকে বাস করতে দেখা যায়। যেমন, দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম বাবলা জাতের গাছে থাকে এক ধরনের পিঁপড়ে। আম, লিচু প্রভৃতি গাছেও এমনি ধরনের পিঁপড়ের

দেখা মেলে। এই পিঁপড়েরা সেই গাছের কাছে কোন প্রাণীকে আসতে দেয় না। এলে এদের আক্রমণে বিব্রত হয়ে পালানো ছাড়া পথ থাকে না এসব প্রাণীর। এহেন পাহারাকার্যের বদলে পিঁপড়েরা গাছের কাছে পায় খাবার, পায় থাকবার একটা জায়গা। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার এ এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। এমনিভাবে আত্মরক্ষার নাম সহকৃতি (Myrmecophily)।

হাইড্রার কথা তোমাদের আগেই বলেছি। হাইড্রার ভিতরের শেষ স্তরে এক প্রকার সবুজ এককোষী শেওলা জাতের উদ্ভিদদের বাস করতে দেখা যায়। তার কারণ হল, এরা হাইড্রার দেহ থেকে নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি সংগ্রহ করে তাদের নিজের কাজের জন্যে। আর, ওই শেওলা-জাতের উদ্ভিদদের নিকট থেকে হাইড্রা পায় অক্সিজেন আর শর্করা জাতের খাদ্য। এমনিভাবে এরা একে অপরকে সাহায্য করে। এরকমভাবে একে অন্যের সাহায্য দ্বারা জীবনধারণকে বলে সিমবায়োসিস্ (Symbioses) বা মিথোজীবিতা।

এছাড়া দেখা যায় যে নানা প্রাণীর সাহায্যে গাছের ফল, বীজ বহু দূর দূর দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দূরান্তরে গাছের বংশবিস্তার সম্ভব হয়। মানুষও এ-কাজে গাছকে নানাভাবে সাহায্য করে। পাখি, ইঁদুর, কাঠবেড়াল, পতঙ্গ প্রভৃতি বংশবিস্তারের কাজে সাহায্য করে উদ্ভিদদের। অশ্বথ, বট ইত্যাদি গাছের ফল পাখি, বাদুড় প্রভৃতি প্রাণীরা খেয়ে থাকে। অনেক সময় ওই ফলের বীজ মলের সঙ্গে মাটিতে পড়ে আবার নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। এইজন্যেই ফল ফুলের গন্ধ, তার সুন্দর বর্ণ নানা প্রাণীকে আকর্ষণ করে। প্রাণীরা পায় মিষ্টি সরস শাঁসালো ফল। এমনি বহু ঘটনা প্রমাণ করে যে, এদের একের স্বার্থ আর একজনের স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাই বলছিলাম উদ্ভিদ আর প্রাণী জীবজগতের দুটি রূপ, দুটি ধারা। একেকে বাদ দিয়ে অপরকে কল্পনা করা শক্ত। একের

অভাবে অন্যের অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। প্রাণী আর উদ্ভিদদের পরস্পর-নির্ভরতাই যেন প্রাণ প্রবাহকে টিকিয়ে রেখেছে।

পরস্পরের উপর নির্ভরতা ছাড়া আরও একটা সম্পর্ক অবশ্য আছে এদের মধ্যে। তবে, সেটা খুব মধুর নয়। এই উদ্ভিদদের মধ্যে অতি ছোট কয়েকটি উদ্ভিদ আছে যারা মানুষের বহু বিভ্রাট ঘটিয়ে থাকে। ব্যাক্টেরিয়া বহু প্রাণী ও মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি করে। ব্যাক্টেরিয়া মানুষের দেহে যে-সব রোগের সৃষ্টি করে সেসব রোগের নাম শুনলেই আঁতকে উঠতে হয়। ডিপথিরিয়া, কলেরা, যক্ষা, টাইফয়েড রোগ এদেরই সৃষ্টি। শুধু তাই নয়, খাবার নষ্ট করতেও এদের জুড়ি মেলা ভার। অনেক সময় সেই খাবার খেলে অসুখে পড়তে হয়। ব্যাক্টেরিয়া হচ্ছে উদ্ভিদ, তা তোমরা জান। তাদের সঙ্গে প্রাণীদের সম্পর্কটা ভাল নয় মোটেই। আবার পতঙ্গভুক উদ্ভিদ, যেমন কলস-গাছ (Pitcher plant), পাতা ঝাঁঝি (Utricularia), সূর্য-শিশির (Drosera) প্রভৃতি পতঙ্গদের শত্রু। শেওলা অনেক সময় প্রাণীদের অসুবিধে সৃষ্টি করে। শেওলা যখন মরে যায় তা জলকে দূষিত করে তোলে। ফলে সে জল মানুষ ও মাছের কাছে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়।

ছত্রাক জাতের উদ্ভিদরাও অনেক সময় আমাদের ক্ষতি করে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদদের সঙ্গে প্রাণীদের, বিশেষ করে মানুষের সম্পর্কটা সব সময় মধুর নয়। তাহলেও এরা আমাদের ও অন্য প্রাণীদের উপকারও কম করে না। ব্যাক্টেরিয়া মানুষের নানা ক্ষতি করে। কিন্তু কখনো-কখনো উপকার যে করে না তা অবশ্য নয়। মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করতে এদের দানও কম নয়। চীজ, মাখন প্রভৃতি তৈরি করতে এদের একান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় তামাক তৈরির ব্যাপারেও দরকার হয়। এমনি আরও উপকারে আসে ব্যাক্টেরিয়া।

নানারকম খাদ্যদ্রব্য, তেল, শাকসব্জি, মশলা প্রভৃতি উদ্ভিদের দান। তেল, সাবান, রঙ, ভার্নিশ ইত্যাদি বানাতে লাগে। বাড়ি ঘর তৈরি করতে লাগে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ; সেতু, নৌকো, নানা আসবাবপত্র, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি সবই উদ্ভিদের দান। পাঁউরুটি, অ্যাল্‌কোহল প্রভৃতি তৈরি করবার জন্যে দরকার হয় ছত্রাক জাতের উদ্ভিদদের। ব্যাঙের ছাতাও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুইনাইন, মরফিন, নাক্স ভোমিকা প্রভৃতি ওষুধ উদ্ভিদ থেকেই তৈরি। আর বর্তমান যুগের পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন প্রভৃতির প্রয়োজন যে কী তা বুঝিয়ে বলতে হবে না। এ-সব ছত্রাক জাতের উদ্ভিদ থেকেই তৈরি। তারপর বিছানা পত্র, জামা-কাপড় আমাদের নিত্য প্রয়োজন। এই নিত্য প্রয়োজনের জিনিসগুলোও উদ্ভিদের দান। কয়লা না হলে আমাদের বোধহয় এক দিনও চলে না। কয়লা, আলকাতরা, পেট্রোল প্রভৃতি যে উদ্ভিদ থেকেই তৈরি হয়েছে তা তোমাদের জানা আছে।

সৌন্দর্য-চর্চাতেও উদ্ভিদ আমাদের সাহায্য করছে। ফুল লতা-পাতা দিয়ে ঘর সাজানো, মানুষের অঙ্গশোভা বর্ধন প্রভৃতি কাজ হয় উদ্ভিদদের দানে। বহু গন্ধদ্রব্য আমরা ব্যবহার করি যা ফুল থেকে তৈরি হয়। এমনি হাজারো রকম উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যা থেকে বোঝা যাবে যে উদ্ভিদরা কত প্রয়োজনে আসে মানুষের, কত উপকার করে প্রাণীদের। প্রাণীদের খাদ্য জোগাড় করে, মানুষের বস্ত্র, ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেই মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে এদের একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অবিচ্ছেদ্য এ সম্পর্ক। অপকার আছে, উপকার আছে, আছে শত্রুতা, আছে মিত্রতা। তবে, জীবজগতের এ দুটি সরিক দীর্ঘদিন একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস করার জন্যে উভয়ের মধ্যে যে একটা বোঝাপড়ার সৃষ্টি হয়েছে তা অস্বীকার করার জো নেই।

বিজ্ঞানসাধকের অতন্দ্র সাধনা, তাঁদের
সত্যসন্ধিৎসা যেমন অনবচ্ছিন্ন, মহাবিশ্বের
দিকে দিকে তাঁদের নিত্য নতুন
অভিযান তেমনি রোমাঞ্চকর, তেমনি
চমকপ্রদ। কুঞ্জবিহারী পাল-সম্পাদিত
এই গ্রন্থে বিজ্ঞানের
সেই সব অভিযানের বিস্ময়াবহ
কাহিনী, আবিষ্কারের কৌতূহলে-ভরা
কথা তুলে ধরা হয়েছে
অতি সহজে সরলভাবে। বিষয়ের
বর্ণনায়, ভাষার সুকুমার
উপস্থাপনে এবং ব্যাপ্তিশীল
রস-রীতির পরিচয়ে এ-গ্রন্থ এক
উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকার্য। কিশোর পাঠকদের
কাছে এ এক আদরণীয় সম্পদ।